বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনে ক্ল্যারিজেস হোটেলের প্রেস কনফারেন্সে বিশ্ব মিডিয়ার মুখোমুখি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- "বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত,আমি শোষিতের পক্ষে"
- "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ"
- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম "

– বঙ্গবন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা

স্বরোচিষ সরকার
তারিক মনজুর
রাফাত আলম মিশু
মোঃ মাইনুল ইসলাম
বিষ্ণু কুমার অধিকারী
মোঃ জয়নাল আবেদীন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০২০
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২২

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষার্থীকে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের কথা মনে রেখে এবং ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ প্রণীত হচ্ছে।

বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় সংস্কৃতি ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যাতে শিক্ষার্থী ধারণ করতে পারে, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমমর্যাদার বোধ যাতে তার মধ্যে জাগ্রত হয়, এবং যাতে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে, সেদিকে খেয়াল রেখে পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয় এবং উপস্থাপন-কৌশল নির্ধারণ করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করে। সেই ধারাবাহিকতায় উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভিশন ২০৪১ সামনে রেখে পাঠ্যপুস্তকটি সময়োপযোগী করে পরিমার্জন করা হয়েছে।

পরিমার্জিত শিক্ষানীতির আলোকে ২০২১ সাল থেকে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য **বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি** বইটি নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল স্তরের জন্যও প্রবর্তন করা হয়েছে। পূর্বে ব্যাকরণ এবং নির্মিতি দুটি আলাদা বই ছিল। এবার একটি বইয়ের মধ্যে প্রথম অংশে ব্যাকরণ এবং শেষ অংশে নির্মিতি সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম অংশে বাংলা ব্যাকরণের হালতক ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচয় করানোর চেষ্টা আছে। আর শেষের নির্মিতি অংশ এমনভাবে রচিত হয়েছে, যাতে সমকালীন প্রমিত বাংলা ভাষায় সৃজনশীলতার চর্চা ও দৈনন্দিন যোগাযোগের কাজ শিক্ষার্থী যথাযথভাবে করতে শেখে। ব্যাকরণ অংশে বাংলা ভাষার উপাদান ও গঠনের যে সরল বর্ণনা আছে এবং নির্মিতি অংশে যেভাবে রচনার কৌশল ও রচনার নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করি।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে ২০১২ সালে প্রণীত বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম। পাঠ্যপুস্তকটির রচনা, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ ১	:	ভাষা ও বাংলা ভাষা	১
পরিচ্ছেদ ২	:	বাংলা ব্যাকরণ	৩
পরিচ্ছেদ ৩	:	বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন	৫
পরিচ্ছেদ ৪	:	বাগ্‌যন্ত্র	৯
পরিচ্ছেদ ৫	:	ধ্বনি ও বর্ণ	১২
পরিচ্ছেদ ৬	:	স্বরধ্বনি	১৫
পরিচ্ছেদ ৭	:	ব্যঞ্জনধ্বনি	১৮
পরিচ্ছেদ ৮	:	বর্ণের উচ্চারণ	২৩
পরিচ্ছেদ ৯	:	শব্দ ও পদের গঠন	২৬
পরিচ্ছেদ ১০	:	উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন	২৯
পরিচ্ছেদ ১১	:	প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন	৩২
পরিচ্ছেদ ১২	:	সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন	৩৭
পরিচ্ছেদ ১৩	:	সন্ধি	৪১
পরিচ্ছেদ ১৪	:	শব্দদ্বিত্ব	৪৪
পরিচ্ছেদ ১৫	:	নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ	৪৬
পরিচ্ছেদ ১৬	:	সংখ্যাবাচক শব্দ	৪৮
পরিচ্ছেদ ১৭	:	শব্দের শ্রেণিবিভাগ	৫১
পরিচ্ছেদ ১৮	:	বিশেষ্য	৫৩
পরিচ্ছেদ ১৯	:	সর্বনাম	৫৫
পরিচ্ছেদ ২০	:	বিশেষণ	৫৭
পরিচ্ছেদ ২১	:	ক্রিয়া	৫৯
পরিচ্ছেদ ২২	:	ক্রিয়াবিশেষণ	৬২
পরিচ্ছেদ ২৩	:	অনুসর্গ	৬৪
পরিচ্ছেদ ২৪	:	যোজক	৬৬
পরিচ্ছেদ ২৫	:	আবেগ	৬৮
পরিচ্ছেদ ২৬	:	নির্দেশক	৭০
পরিচ্ছেদ ২৭	:	বচন	৭২
পরিচ্ছেদ ২৮	:	বিভক্তি	৭৪
পরিচ্ছেদ ২৯	:	ক্রিয়াবিভক্তি	৭৬
পরিচ্ছেদ ৩০	:	ক্রিয়ার কাল	৭৯
পরিচ্ছেদ ৩১	:	বাক্যের অংশ ও শ্রেণিবিভাগ	৮৩
পরিচ্ছেদ ৩২	:	বাক্যের বর্গ	৮৬
পরিচ্ছেদ ৩৩	:	উদ্দেশ্য ও বিধেয়	৮৮
পরিচ্ছেদ ৩৪	:	সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য	৯০
পরিচ্ছেদ ৩৫	:	কারক	৯৫
পরিচ্ছেদ ৩৬	:	বাচ্য	৯৮
পরিচ্ছেদ ৩৭	:	উক্তি	১০১
পরিচ্ছেদ ৩৮	:	যতিচিহ্ন	১০৩
পরিচ্ছেদ ৩৯	:	বাগর্থ	১০৬
পরিচ্ছেদ ৪০	:	বাগ্‌ধারা	১০৯
পরিচ্ছেদ ৪১	:	প্রতিশব্দ	১১৪
পরিচ্ছেদ ৪২	:	বিপরীত শব্দ	১১৮
পরিচ্ছেদ ৪৩	:	শব্দজোড়	১২১

পরিচ্ছেদ ৪৪ :	অনুচ্ছেদ	১২৬
	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	১২৬
	বিশ্ববিদ্যালয়	১২৭
	বৈশাখী মেলা	১২৭
	বইমেলা	১২৮
	জাদুঘর	১২৮
	সুন্দরবন	১২৯
	রেলগাড়ি	১২৯
	স্বাধীনতা দিবস	১২৯
	জাতীয় পতাকা	১৩০
	জাতীয় সংগীত	১৩০
	কম্পিউটার	১৩১
	মোবাইল ফোন	১৩১
	পদ্মা নদী	১৩২
	জন্মদিনের সন্ধ্যা	১৩২
পরিচ্ছেদ ৪৫ :	সারাংশ ও সারমর্ম	১৩৩
	সারাংশ	১৩৩
	সারমর্ম	১৩৭
পরিচ্ছেদ ৪৬ :	ভাব-সম্প্রসারণ	১৪২
পরিচ্ছেদ ৪৭ :	চিঠিপত্র	১৫২
	ব্যক্তিগত পত্র	১৫২
	আমন্ত্রণপত্র	১৫৭
	সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য চিঠি	১৫৯
	মানপত্র	১৬২
	আবেদনপত্র	১৬৪
	ব্যাবসায়িক পত্র	১৬৮
পরিচ্ছেদ ৪৮ :	সংবাদ প্রতিবেদন	১৭০
পরিচ্ছেদ ৪৯ :	প্রবন্ধ	১৭৪
	বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প	১৭৪
	বাংলাদেশের উৎসব	১৭৭
	জগদীশচন্দ্র বসু	১৮১
	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	১৮২
	লঞ্চ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	১৮৪
	একটি ঝড়ের রাত	১৮৬
	কৃষি উদ্যোক্তা	১৮৮
	ভাষা আন্দোলন	১৯০
	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	১৯৩
	সময়ানুবর্তিতা	১৯৭
	ক্রিকেটে বাংলাদেশ	১৯৯
	বাংলাদেশের ফুটবল	২০১
	কৃষিকাজে বিজ্ঞান	২০৪
	মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার	২০৬
	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ	২০৯
	বিশ্বকোষ	২১১
	অদম্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ	২১৪

পরিচ্ছেদ ১

ভাষা ও বাংলা ভাষা

ভাষা

গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিভ, তালু, দাঁত, নাক প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ দিয়ে মানুষ নানা রকম ধ্বনি তৈরি করে। এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয় শব্দ। শব্দের গুচ্ছ দিয়ে বাক্য গঠিত হয়। বাক্য দিয়ে মানুষ মনের ভাব আদান-প্রদান করে। মনের ভাব প্রকাশক এসব বাক্যের সমষ্টিকে বলে ভাষা।

ভাষা একদিকে মুখে বলার এবং অন্যদিকে কানে শোনার বিষয়। সভ্যতার অগ্রগতিতে মুখের ভাষা ক্রমে লেখার ও ছাপার, সেইসঙ্গে চোখ দিয়ে পড়ার বিষয়েও পরিণত হয়েছে। এছাড়া দৃষ্টি-শক্তিহীনদের জন্য ভাষাকে উঁচুনিচু করে তৈরি করার ও হাত দিয়ে অনুভব করার ব্রেইল পদ্ধতি, আবার বাক্-শক্তিহীনদের বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ইশারা ভাষা মানুষ তৈরি করেছে।

জনগোষ্ঠী ভেদে ভাষার বৈশিষ্ট্য আলাদা হয়, ভাষাও আলাদা হয়ে ওঠে। এভাবে পৃথিবীতে কয়েক হাজার ভাষার জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে চীনা, ইংরেজি, হিন্দি, হিস্পানি, আরবি, বাংলা, পর্তুগিজ, রুশ, জাপানি, জার্মান, কোরিয়ান, ফরাসি, তামিল, তুর্কি, উর্দু, ফারসি প্রভৃতি ।

বাংলা ভাষা

বাঙালি জনগোষ্ঠী যে ভাষা দিয়ে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষ। এর মধ্যে বাংলাদেশে ষোলো কোটি এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দশ কোটি মানুষের বাস। এছাড়া ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাসহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রায় তিন কোটি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরো প্রায় এক কোটি বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে। মাতৃভাষী মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা পৃথিবীর ৬ষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা।

পৃথিবীর ভাষাগুলোকে ইন্দো-ইউরোপীয়, চীনা-তিব্বতীয়, আফ্রিকীয়, সেমীয়-হেমীয়, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রো-এশীয় প্রভৃতি ভাষা-পরিবারে ভাগ করা হয়ে থাকে। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, হিস্পানি, রুশ, পর্তুগিজ, ফারসি, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সিংহলি প্রভৃতি ভাষার মতো বাংলা ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের সদস্য। বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় অহমিয়া ও ওড়িয়া। ধ্রুপদি ভাষা সংস্কৃত এবং পালির সঙ্গে বাংলা ভাষার রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের আদি ভাষা বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছে। এই বিবর্তনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ স্তর বাংলা ভাষাকে অতিক্রম করতে হয়েছে, সেগুলো হলোঃ ইন্দো-ইউরোপীয় → ইন্দো-ইরানীয় → ভারতীয় আর্য → প্রাকৃত → বাংলা। আনুমানিক এক হাজার বছর আগে পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। বাংলা ভাষার লিখিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন ‘চর্যাপদ’।

বাংলা ভাষার রয়েছে কালগত ও স্থানগত স্বাতন্ত্র্য। এক হাজার বছর আগেকার ভাষা, পাঁচশো বছর আগেকার ভাষা, এমনকি উনিশ শতকে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে বর্তমান কালের ভাষা আলাদা। আবার ভৌগোলিক এলাকাভেদে বাংলা ভাষার নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ভাষার এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে বলা হয় উপভাষা।

বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি রয়েছে। এই লিপির নাম বাংলা লিপি। বাংলা লিপিতে মূল বর্ণের সংখ্যা ৫০টি – স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে উপমহাদেশে ব্রাহ্মী লিপির জন্ম হয়। ব্রাহ্মী লিপির পূর্ব-ভারতীয় শাখা দশম শতক নাগাদ কুটিল লিপি নামে পরিচিতি লাভ করে। বাংলা লিপি এই কুটিল লিপির বিবর্তিত রূপ। অহমিয়া, বোড়ো, মণিপুরি প্রভৃতি ভাষাও বাংলা লিপিতে লেখা হয়। সংস্কৃত এবং মৈথিলি ভাষা এক সময়ে এই লিপিতে লেখা হতো।

বাংলাদেশের জীবনযাত্রার প্রায় সবক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক। এছাড়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বর্ণের সঙ্গে কোন ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সম্পর্ক আছে?
ক. চোখ খ. কান গ. নাক ঘ. জিভ

২. ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করে –
ক. শ্রবণ-শক্তিহীনরা খ. দৃষ্টি-শক্তিহীনরা গ. মানসিক-শক্তিহীনরা ঘ. শারীরিক-শক্তিহীনরা

৩. বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় –
ক. ১৫ কোটি লোক খ. ২০ কোটি লোক গ. ২৫ কোটি লোক ঘ. ৩০ কোটি লোক

৪. মাতৃভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর কততম ভাষা?
ক. ৪র্থ খ. ৫ম গ. ৬ষ্ঠ ঘ. ৭ম

৫. নিচের কোনটি ভাষা-পরিবারের নাম নয়?
ক. ইন্দো-ইউরোপীয় খ. আফ্রিকীয় গ. দ্রাবিড়ীয় ঘ. ইন্দো-ইরানীয়

৬. ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত-
ক. সংস্কৃত ও পালি খ. অহমিয়া ও ওড়িয়া গ. নেপালি ও সিংহলি ঘ. হিন্দি ও উর্দু

৭. নিচের কোনটি থেকে বাংলা ভাষার জন্ম?
ক. কেন্তুম খ. সংস্কৃত গ. পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ঘ. দ্রাবিড়ীয়

৮. বাংলা ভাষার প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায় –
ক. মহাভারতে খ. চর্যাপদে গ. বৈষ্ণব পদাবলিতে ঘ. মঙ্গলকাব্যে

৯. বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি কোনটি?
ক. ব্রাহ্মী খ. মণিপুরি গ. বাংলা ঘ. কুটিল

১০. ভারতের কোন প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা?
ক. কেরালা খ. ওড়িশা গ. ত্রিপুরা ঘ. হরিয়ানা

পরিচ্ছেদ ২
বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণে ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার মধ্যকার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা ব্যাকরণের কাজ। ব্যাকরণগ্রন্থে এসব বৈশিষ্ট্যকে সূত্রের আকারে সাজানো হয়ে থাকে।

যে বিদ্যাশাখায় বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয় তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে পর্তুগিজ ভাষায়। এর লেখক ছিলেন মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ। তাঁর বাংলা-পর্তুগিজ অভিধানের ভূমিকা অংশ হিসেবে তিনি এটি রচনা করেন। এরপর ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রণীত ইংরেজি ভাষায় রচিত পূর্ণাঙ্গ একটি বাংলা ব্যাকরণ। বইটির নাম 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। ১৮০১ সালে উইলিয়াম কেরি এবং ১৮২৬ সালে রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষায় আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।

ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

ভাষা হলো বাক্যের সমষ্টি। বাক্য গঠিত হয় শব্দ দিয়ে। আবার শব্দ তৈরি হয় ধ্বনি দিয়ে। এদিক থেকে ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান হলো ধ্বনি। এই ধ্বনি, শব্দ, বাক্য – প্রত্যেকটি অংশই ব্যাকরণের আলোচ্য। এছাড়া শব্দের ও বাক্যের বহু ধরনের অর্থ হয়। সেসব অর্থ নিয়েও ব্যাকরণে আলোচনা করা হয়। ব্যাকরণের এসব আলোচ্য বিষয় বিভক্ত হয় অন্তত চারটি ভাগে, যথা – ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব।

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় ধ্বনি। লিখিত ভাষায় ধ্বনিকে যেহেতু বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়, তাই বর্ণমালা সংক্রান্ত আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত। ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বাগ্‌যন্ত্র, বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণ-প্রক্রিয়া, ধ্বনির বিন্যাস, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিদল প্রভৃতি।

রূপতত্ত্ব

রূপতত্ত্বে শব্দ ও তার উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি স্থান পায়। বিশেষ গুরুত্ব পায় শব্দগঠন প্রক্রিয়া।

বাক্যতত্ত্ব

বাক্যতত্ত্বে বাক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাক্যের নির্মাণ এবং এর গঠন বাক্যতত্ত্বের মূল আলোচ্য। বাক্যের মধ্যে পদ ও বর্গ কীভাবে বিন্যস্ত থাকে, বাক্যতত্ত্বে তা বর্ণনা করা হয়। এছাড়া এক ধরনের বাক্যকে অন্য ধরনের বাক্যে রূপান্তর, বাক্যের বাচ্য, উক্তি ইত্যাদি বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। কারক বিশ্লেষণ, বাক্যের যোগ্যতা, বাক্যের উপাদান লোপ, যতিচিহ্ন প্রভৃতিও বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়ে থাকে।

অর্থতত্ত্ব

ব্যাকরণের যে অংশে শব্দ, বর্গ ও বাক্যের অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেই অংশের নাম অর্থতত্ত্ব। একে বাগর্থতত্ত্বও বলা হয়। বিপরীত শব্দ, প্রতিশব্দ, শব্দজোড়, বাগ্‌ধারা প্রভৃতি বিষয় অর্থতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া শব্দ, বর্গ ও বাক্যের ব্যঞ্জনা নিয়েও ব্যাকরণের এই অংশে আলোচনা থাকে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. ভাষার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে –
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. ব্যাকরণ গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. রূপতত্ত্ব

২. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
ক. ১৫৫৩ খ. ১৭৪৩ গ. ১৭৭৮ ঘ. ১৯৪৮

৩. ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা কে?
ক. উইলিয়াম কেরি খ. রামমোহন রায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড

৪. 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর রচয়িতা কে?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. উইলিয়াম কেরি ঘ. রামমোহন রায়

৫. ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান –
ক. ধ্বনি খ. অক্ষর গ. শব্দ ঘ. বাক্য

৬. 'বাগ্‌যন্ত্র' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব

৭. শব্দের অর্থ ও অর্থবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করে –
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব

৮. নিচের কোনটি রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়?
ক. শব্দগঠন খ. প্রতিশব্দ গ. অক্ষর ঘ. কারক

৯. বাচ্য ও উক্তি ব্যাকরণের কোন শাখায় আলোচিত হয়?
ক. অর্থতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব গ. ধ্বনিতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব

১০. শব্দগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয় –
ক. ধ্বনিতত্ত্বে খ. রূপতত্ত্বে গ.অর্থতত্ত্বে ঘ. বাক্যতত্ত্বে

পরিচ্ছেদ ৩
বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন

অধিকাংশ ভাষায় অন্তত দুটি রীতি থাকে: ১. কথ্য ভাষা রীতি ও ২. লেখ্য ভাষা রীতি। বাংলা ভাষায় এসব রীতির একাধিক বিভাজন রয়েছে। যেমন কথ্য ভাষা রীতির মধ্যে রয়েছে আদর্শ কথ্য রীতি ও আঞ্চলিক কথ্য রীতি। আবার লেখ্য ভাষা রীতির মধ্যে রয়েছে প্রমিত রীতি, সাধু রীতি ও কাব্য রীতি। একে একে এসব রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. কথ্য ভাষা রীতি

কথ্য ভাষা রীতি ভাষার মূল রূপ। কথ্য ভাষা রীতির উপরে ভিত্তি করে লেখ্য ভাষা রীতির রূপ তৈরি হয়। স্থান ও কালভেদে ভাষার যে পরিবর্তন ঘটে তা মূলত কথ্য ভাষা রীতির পরিবর্তন। তাই কথ্য ভাষা রীতির পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন ভাষা ও উপভাষার জন্ম হয়।

আঞ্চলিক কথ্য রীতি

কথ্য রীতির আঞ্চলিক ভেদ সহজে বোঝা যায়। এই আঞ্চলিক ভেদ সাধারণত অঞ্চলের নামে পরিচিতি পায়। যেমন নোয়াখালীর ভাষা, চাঁপাই নবাবগঞ্জের ভাষা, কিংবা সুন্দরবন অঞ্চলের ভাষা। ভাষার এই আঞ্চলিকতা উপভাষা নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। বাঙ্গালি (বাংলাদেশের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল), পূর্বি (বাংলাদেশের পূর্ব অঞ্চল, ত্রিপুরা এবং আসামের বরাক অঞ্চল), বরেন্দ্রি (বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল), কামরূপি (বিহারের পূর্ব অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অঞ্চল এবং বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চল), রাঢ়ি (পশ্চিমবঙ্গ), ঝাড়খণ্ডি (পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চল ও ঝাড়খণ্ডের পূর্ব অঞ্চল) প্রভৃতি কয়েকটি উপভাষার নাম।

আদর্শ কথ্য রীতি

আদর্শ কথ্য রীতি হলো বাঙালি জনগোষ্ঠীর সর্বজনীন কথ্য ভাষা। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বেতার-টেলিভিশনে প্রচারিত আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে, সংবাদ উপস্থাপনায়, সভা-সেমিনারের আলোচনায় ও কবিতা আবৃত্তিতে এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। এই রীতিই বাংলা প্রমিত লেখ্য রীতির ভিত্তি। তবে বক্তার সামাজিক অবস্থান, জীবিকা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভেদে আদর্শ কথ্য রীতিতে কমবেশি তফাত থাকে।

২. লেখ্য ভাষা রীতি

লিখিত বাংলা ভাষার আদি নিদর্শনের নাম 'চর্যাপদ'। প্রায় এক হাজার বছর আগে লেখ্য বাংলা ভাষার কাব্য রীতিতে এটি রচিত। ব্যবহারিক প্রয়োজনে ক্রমে লেখ্য গদ্য রীতির জন্ম হয়। উনিশ শতকের সূচনায় এই গদ্য রীতি সাধু রীতির জন্ম দেয়। বিশ শতকের সূচনায় সাধু রীতির পাশাপাশি চলিত রীতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

২০২৫

একুশ শতকের সূচনায় চলিত রীতির একটি আদর্শ রূপ প্রমিত রীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই প্রমিত রীতিই লেখ্য বাংলা ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য লিখিত রূপ।

কাব্য রীতি

বাংলা কাব্য রীতি দুই ভাগে বিভক্ত: পদ্য কাব্য রীতি ও গদ্য কাব্য রীতি। পদ্য কাব্য রীতিতে ছন্দ এবং মিল থাকে। ফলে তা ভাষার সাধারণ বাক্যগঠন থেকে আলাদা হয়। পদ্য কাব্য রীতি বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরনো রীতি। বাংলা সাহিত্যের বহু অমর কাব্য এই রীতিতে রচিত। পদ্য কাব্য রীতির পাশাপাশি বাংলা ভাষায় গদ্য কাব্য রীতিও রয়েছে। গঠন বিবেচনায় গদ্য কাব্য রীতির বাক্যও সাধারণ বাক্যের চেয়ে আলাদা হয়ে থাকে।

সাধু রীতি

দাপ্তরিক কাজ, সাহিত্য রচনা, যোগাযোগ ও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে লেখ্য বাংলা ভাষায় সাধু রীতির জন্ম হয়। উনিশ শতকের শুরুর দিকে সাধু রীতির বিকাশ ঘটে। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে এই রীতি বাংলা লেখ্য ভাষার আদর্শ রীতি হিসেবে চালু থাকে।

সাধু রীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

(ক) সাধু রীতিতে ক্রিয়ারূপ দীর্ঘতর, যেমন – 'করা' ক্রিয়ার রূপ: করিতেছে, করিয়াছে, করিল, করিলে, করিলাম, করিত, করিতেছিল, করিয়াছিল, করিব, করিবে, করিতে, করিয়া, করিলে, করিবার।

(খ) সাধু রীতির বহু সর্বনামে 'হ'-বর্ণ যুক্ত থাকে, যেমন – তাহারা, ইহাদের, যাহা, তাহা, উহা, কেহ ইত্যাদি।

সাহিত্যে সাধু রীতির উদাহরণ:

> মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে! (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উনিশ শতক)

দাপ্তরিক কাজে সাধু রীতির উদাহরণ:

> আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের

> অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য। (বাংলাদেশের সংবিধান, বিশ শতক)

প্রমিত রীতি

বিশ শতকের সূচনায় কলকাতার শিক্ষিত লোকের কথ্য ভাষাকে লেখ্য রীতির আদর্শ হিসেবে চালু করার চেষ্টা হয়। এটি তখন চলিত রীতি নামে পরিচিতি পায়। এই রীতিতে ক্রিয়া, সর্বনাম, অনুসর্গ প্রভৃতি শ্রেণির শব্দ হ্রস্ব হয় এবং তৎসম শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কমে। প্রথম দিকে চলিত রীতিতে শুধু সাহিত্য রচিত হতো; দাপ্তরিক কাজ ও বিদ্যাচর্চা ইত্যাদি হতো সাধু ভাষায়। বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ চলিত রীতি সাধু রীতির জায়গা দখল করে। ক্রমে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধু রীতিকে সরিয়ে চলিত রীতি আদর্শ লেখ্য রীতিতে পরিণত হয়। একুশ শতকের সূচনা নাগাদ এই চলিত রীতিরই নতুন নাম হয় 'প্রমিত রীতি'। এটি 'মান রীতি' নামেও পরিচিত। বর্তমানে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় যাবতীয় দাপ্তরিক কাজ, বিদ্যাচর্চা, সাংবাদিকতা ও যোগাযোগের ভাষা হিসেবে প্রমিত রীতি লেখ্য বাংলা ভাষার প্রধান রীতিতে পরিণত হয়েছে।

প্রমিত রীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

(ক) প্রমিত রীতিতে ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ হ্রস্বতর।

ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেমন – 'করা' ক্রিয়ার রূপ: করছে, করেছে, করল, করলে, করলাম, করত, করছিল, করেছিল, করব, করবে, করতে, করে, করলে, করার।
সর্বনামের ক্ষেত্রে যেমন – তারা, এদের, যা, তা, ও, কেউ ইত্যাদি।
অনুসর্গের ক্ষেত্রে যেমন – থেকে, হতে, সঙ্গে ইত্যাদি।

(খ) প্রমিত রীতিতে শব্দ ব্যবহার আলোচ্য বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল। প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরনের শব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন তৎসম 'বৎসর'-ও লেখা যায় আবার তদ্ভব 'বছর'-ও লেখা যায়। একইভাবে 'চন্দ্র'-ও লেখা যায়, 'চাঁদ'-ও লেখা যায়।

(গ) প্রমিত রীতিতে কথ্য রীতির বহু শব্দ বর্জনীয়, যেমন – 'ধুলো, তুলো, মুলো, পুজো, সবচে' ইত্যাদি না লিখে 'ধুলা, তুলা, মুলা, পূজা, সবচেয়ে' ইত্যাদি লিখতে হয়।

পূর্বে উল্লিখিত সাধু রীতির সাহিত্যের উদাহরণ প্রমিত রীতিতে নিম্নরূপ হবে:

> মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেউ যদি এমন করে বেঁধে রাখতে পারত যে, সে ঘুমিয়ে পড়া শিশুটির মতো চুপ করে থাকত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সঙ্গে লাইব্রেরির তুলনা হতো। এখানে ভাষা চুপ করে আছে, প্রবাহ স্থির হয়ে আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়ে আছে। এরা সহসা যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, নিস্তব্ধতা ভেঙে ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করে একেবারে বের হয়ে আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যাকে বেঁধে রেখেছে!

২০২১

পূর্বে উল্লিখিত সাধু রীতির দাপ্তরিক উদাহরণ প্রমিত রীতিতে নিম্নরূপ হবে:

> আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, আমরা যাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি, সেজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং এর রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

প্রতিটি বাঙালি শিশুর মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা হলো তার আঞ্চলিক ভাষা। আদর্শ কথ্য বা লেখ্য প্রমিত তার কাছে দ্বিতীয় ভাষা। বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রম যেহেতু প্রমিত রীতি অনুসরণ করে, তাই পাঠ্যপুস্তকই হলো শিশুর প্রমিত রীতি শেখার প্রধান উপায়।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বর্তমানে লেখ্য ভাষার আদর্শ রীতিকে বলে –
ক. সাধু রীতি খ. লেখ্য রীতি গ. আঞ্চলিক রীতি ঘ. প্রমিত রীতি

২. বাংলা ভাষায় গদ্য রীতির সূচনা হয় –
ক. প্রাচীন যুগে খ. মধ্যযুগে গ. উনিশ শতকের শুরুতে ঘ. বিশ শতকের শুরুতে

৩. নিচের কোনটি সাধু রীতির ক্রিয়াপদ?
ক. করিল খ. করেছে গ. করত ঘ. করলাম

৪. সাধু রীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. ক্রিয়ারূপ দীর্ঘ খ. বিশেষ্যের আধিক্য
গ. অনুসর্গ হ্রস্বতর ঘ. সর্বনাম হ্রস্বতর

৫. বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে কোন উপভাষার ব্যবহার পাওয়া যায়?
ক. বরেন্দ্রি খ. রাঢ়ি গ. কামরূপি ঘ. পূর্বি

পরিচ্ছেদ ৪
বাগ্‌যন্ত্র

ধ্বনি উচ্চারণ করতে যেসব প্রত্যঙ্গ কাজে লাগে, সেগুলোকে একত্রে বাগ্‌যন্ত্র বলে। মানবদেহের উপরিভাগে অবস্থিত ফুসফুস থেকে শুরু করে ঠোঁট পর্যন্ত ধ্বনি উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রত্যঙ্গই বাগ্‌যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিচের ছবিতে দেখানো হলো এবং এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো।

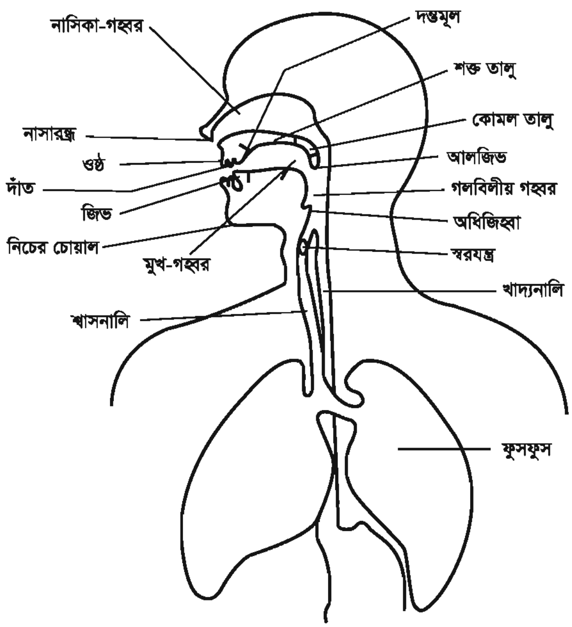

বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ

ফুসফুস

ধ্বনি সৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহের উৎস ফুসফুস। ফুসফুস শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। মূলত শ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

শ্বাসনালি

ফুসফুস থেকে বাতাস শ্বাসনালি হয়ে মুখবিবর ও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়ে আসে।

স্বরযন্ত্র

শ্বাসনালির উপরের অংশে স্বরযন্ত্রের অবস্থান। মেরুদণ্ডের ৪, ৫ ও ৬ নং অস্থির পাশে থাকা এই অংশটি নলের মতো। বাতাস স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে বলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। অধিজিহ্বা, স্বররন্ধ্র, ধ্বনিদ্বার ইত্যাদি স্বরযন্ত্রের অংশ।

জিভ

মুখগহ্বরের নিচের অংশে জিভের অবস্থান। বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে জিভ সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ। জিভের উচ্চতা অনুযায়ী, সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী এবং মুখগহ্বরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে জিভের স্পর্শের প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনির বৈচিত্র্য তৈরি হয়।

আলজিভ

মুখগহ্বরের কোমল তালুর পিছনে ঝুলন্ত মাংসপিণ্ডের নাম আলজিভ। ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কোমল তালুর সঙ্গে আলজিভ নিচে নেমে এলে বাতাস মুখ দিয়ে পুরোপুরি বের না হয়ে খানিকটা নাক দিয়ে বের হয়। এর ফলে নাসিক্য ধ্বনি তৈরি হয়।

তালু

মুখবিবরের ছাদকে বলা হয় তালু। তালুর দুটি অংশ – কোমল তালু ও শক্ত তালু। অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে কোমল তালু নিচে নামে। কোমল তালু ও জিভমূলের স্পর্শে কণ্ঠ্যধ্বনি উচ্চারিত হয়। দন্তমূলের শুরু থেকে কোমল তালু পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে বলা হয় শক্ততালু।

মূর্ধা

শক্ত তালু ও উপরের পাটির দাঁতের মধ্যবর্তী উত্তল অংশকে মূর্ধা বলে। কোনো কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ মূর্ধাকে স্পর্শ করে।

দন্তমূল ও দন্ত

দাঁতের গোড়ার নাম দন্তমূল। উপরের পাটির দন্তমূল ও দাঁতের সঙ্গে জিভের স্পর্শে বেশ কিছু ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

ওষ্ঠ

বাক্‌প্রত্যঙ্গের সবচেয়ে বাইরের অংশের নাম ওষ্ঠ বা ঠোঁট। ওষ্ঠের মধ্যকার ফাঁকের কম-বেশির ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে সংবৃত ও বিবৃত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে ওষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নাসিকা

মুখগহ্বরের পাশাপাশি নাসিকা বা নাকের ছিদ্র দিয়ে বাতাস বের হয়েও ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. কোনটি বাগ্‌যন্ত্র?
ক. পাকস্থলী খ. ফুসফুস গ. পিত্তকোষ ঘ. যকৃৎ

২. ফুসফুস থেকে তৈরি বাতাস কিসের মাধ্যমে বের হয়?
ক. নাসারন্ধ্র খ. মুখবিবর গ. তালু ঘ. ক ও খ উভয়ই

৩. বাক্‌প্রত্যঙ্গের সবচেয়ে বাইরের অংশের নাম –
ক. তালু খ. মূর্ধা গ. দন্ত ঘ. ওষ্ঠ

৪. বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ কোনটি?
ক. দাঁত খ. মূর্ধা গ. দন্তমূল ঘ. জিভ

৫. মুখ-গহ্বরের কোন অংশে তালুর অবস্থান?
ক. সামনে খ. পিছনে গ. উপরে ঘ. নিচে

৬. নাসিক্য ধ্বনি তৈরি হয় কীভাবে?
ক. আলজিভ নিচে নেমে এলে
খ. জিভ তালুতে স্পর্শ করলে
গ. ঠোঁটের ফাঁকা কম-বেশি হলে
ঘ. জিভ মূর্ধায় স্পর্শ করলে

পরিচ্ছেদ ৫

ধ্বনি ও বর্ণ

ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। এই ধ্বনিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি: [ই], [এ], [অ্যা], [আ], [অ], [ও], [উ]; এবং মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি: [প্], [ফ্], [ব্], [ভ্], [ত্], [থ্], [দ্], [ধ্], [ট্], [ঠ্], [ড্], [ঢ্], [চ্], [ছ্], [জ্], [ঝ্], [ক্], [খ্], [গ্], [ঘ্], [ম্], [ন্], [ঙ্], [স্], [শ্], [হ্], [ল্], [র্], [ড়্], [ঢ়্]। এখানে তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে ধ্বনি বা উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে।

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু মুখগহ্বরের কোথাও বাধা পায় না, সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে। অন্যদিকে যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু মুখের বাইরে বের হওয়ার আগে বাক্‌প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বাধা পায়, সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় বর্ণ। এই বর্ণ কানে শোনার বিষয়কে চোখে দেখার বিষয়ে পরিণত করে। ভাষার সবগুলো বর্ণকে একত্রে বলা হয় বর্ণমালা। ধ্বনির বিভাজন অনুযায়ী বাংলা বর্ণমালাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। স্বরধ্বনির প্রতীক স্বরবর্ণ। ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক ব্যঞ্জনবর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় মূল বর্ণের সংখ্যা ৫০টি। তবে মূল বর্ণের পাশাপাশি বাংলা বর্ণমালায় রয়েছে নানা ধরনের কারবর্ণ, অনুবর্ণ, যুক্তবর্ণ ও সংখ্যাবর্ণ।

মূল বর্ণগুলো স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে বিভক্ত।

স্বরবর্ণ: অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ = ১১টি

ব্যঞ্জনবর্ণ: ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল
শ ষ স হ
ড় ঢ় য় ৎ
ং ঃ ঁ = ৩৯টি

কারবর্ণ

স্বরবর্ণের মোট ১০টি সংক্ষিপ্ত রূপ রয়েছে, এগুলোর নাম কারবর্ণ: া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ। কারবর্ণের স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই। এগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের আগে, পরে, উপরে, নিচে বা উভয় দিকে যুক্ত হয়। কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হস্‌চিহ্ন না থাকলে ব্যঞ্জনটির সঙ্গে একটি [অ] আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

অনুবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম অনুবর্ণ। অনুবর্ণের মধ্যে রয়েছে ফলা, রেফ ও বর্ণসংক্ষেপ।

ফলা: ব্যঞ্জনবর্ণের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ অন্য ব্যঞ্জনের নিচে অথবা ডান পাশে ঝুলে থাকে, সেগুলোকে ফলা বলে। যেমন – ন-ফলা (ন), ব-ফলা (ব), ম-ফলা (ম), য-ফলা (্য), র-ফলা (্র), ল-ফলা (ল)।

রেফ: র-এর একটি অনুবর্ণ রেফ (র্)।

বর্ণসংক্ষেপ: যুক্তবর্ণ লিখতে অনেক সময়ে বর্ণকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়। এগুলো বর্ণসংক্ষেপ। যেমন – ঙ, দ, ন, ম, ষ, স ইত্যাদি। এছাড়া ৎ বর্ণটি ত-এর একটি বর্ণসংক্ষেপ, যা বাংলা বর্ণমালায় স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে স্বীকৃত।

যুক্তবর্ণ

একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে যুক্তবর্ণ তৈরি হয়। যুক্ত হওয়া বর্ণগুলোকে দেখে কখনো সহজে চেনা যায়, কখনো সহজে চেনা যায় না। এদিক দিয়ে যুক্তবর্ণ দুই রকম: স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ।

স্বচ্ছ যুক্তবর্ণ: ক্ট, জ্জ, জ্ব, ঞ্ঝ, ড্ড, ণ্ট, ণ্ঠ, দ্দ, দ্ব, দ্ম, ন্ঠ, ন্ড, ন্স, প্ট, প্ত, প্প, ল্স, ব্জ, ব্দ, ম্ফ, ল্ক, ল্গ, ল্ট, ল্ড, ল্প, ল্ফ, শ্চ, শ্ছ, ষ্ট, ষ্ঠ, ষ্ফ, স্খ, স্ট, স্ফ ইত্যাদি।

অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ: ক্ত (ক্+ত), ক্ম (ক্+ম), ক্র (ক্+র), ক্ষ (ক্+ষ), ক্ষ্ম (ক্+ষ্+ম), ক্স (ক্+স), গু (গ্+উ), গ্ধ (গ্+ধ), ঙ্ক (ঙ্+ক), ঙ্গ (ঙ্+গ), জ্ঞ (জ্+ঞ), ঞ্চ (ঞ্+চ), ঞ্ছ (ঞ্+ছ), ঞ্জ (ঞ্+জ), ট্ট (ট্+ট), ত্ত (ত্+ত), ত্থ (ত্+থ), ত্র (ত্+র), ণ্ড (ণ্+ড), দ্ধ (দ্+ধ), ন্ধ (ন্+ধ), ব্ধ (ব্+ধ), ভ্র (ভ্+র), ভ্রূ (ভ্+র্+ঊ), রু (র্+উ), রূ (র্+ঊ), শু (শ্+উ), ষ্ণ (ষ্+ণ), হু (হ্+উ), হৃ (হ্+ঋ), হ্ন (হ্+ন), হ্ম (হ্+ম) ইত্যাদি।

সংখ্যাবর্ণ

বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য দশটি সংখ্যাবর্ণ রয়েছে। যথা: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?

ক. ৬ খ. ৭ গ. ১০ ঘ. ১১

২. কোন ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে মুখগহ্বরের কোথাও বাধা পায় না?

ক. স্বরধ্বনি খ. ব্যঞ্জনধ্বনি গ. মৌলিকধ্বনি ঘ. যুগ্মধ্বনি

৩. ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় –

ক. শব্দ খ. বাক্য গ. বর্ণ ঘ. ভাষা

৪. ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হস্‌চিহ্ন না থাকলে কোন ধ্বনি আছে বলে ধরে নেওয়া হয়?
ক. [অ] খ. [আ] গ. [ই] ঘ. [উ]

৫. ষ্ণ যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ দিয়ে তৈরি?
ক. ঞ ও ষ খ. ষ ও ঞ গ. ষ ও ণ ঘ. ণ ও ষ

৬. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় –
ক. কারবর্ণ খ. অনুবর্ণ গ. ফলা ঘ. রেফ

৭. ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম –
ক. কারবর্ণ খ. অনুবর্ণ গ. ফলা ঘ. রেফ

৮. নিচের কোন জোড়টি যুক্তবর্ণের রূপভেদকে প্রকাশ করে?
ক. স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ খ. কার ও ফলা গ. স্বচ্ছ ও যুক্ত ঘ. অস্বচ্ছ ও উন্মুক্ত

৯. বাংলা কারবর্ণের সংখ্যা –
ক. ৯ খ. ১০ গ. ১১ ঘ. ১২

১০. বাংলা সংখ্যাবর্ণ কয়টি?
ক. ৭ খ. ৮ গ. ১০ ঘ. ১১

পরিচ্ছেদ ৬

স্বরধ্বনি

উচ্চারণের সময়ে জিভের উচ্চতা অনুযায়ী, জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী এবং ঠোঁটের উন্মুক্তি অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে ভাগ করা হয়। নিচের ছক থেকে স্বরধ্বনির এই উচ্চারণ-বিভাজন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে:

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
↓	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	↓
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ	অর্ধ-বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

স্বরধ্বনি উচ্চারণের ছক

উচ্চারণের সময়ে জিভ কতটা উপরে ওঠে বা কতটা নিচে নামে সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত: উচ্চ স্বরধ্বনি [ই], [উ]; উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি [এ], [ও]; নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি [অ্যা], [অ]; নিম্ন স্বরধ্বনি [আ]। উচ্চ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ উপরে ওঠে; নিম্ন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ নিচে নামে।

জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি তিন ভাগে বিভক্ত: সম্মুখ স্বরধ্বনি [ই], [এ], [অ্যা]; মধ্য স্বরধ্বনি [আ]; পশ্চাৎ স্বরধ্বনি [অ], [ও], [উ]। সম্মুখ স্বরধ্বনির বেলায় জিভ সামনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়; পশ্চাৎ স্বরধ্বনির বেলায় জিভ পিছনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়।

স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কতটুকু খোলা বা বন্ধ থাকে অর্থাৎ কী পরিমাণ উন্মুক্ত হয়, তার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত: সংবৃত [ই], [উ]; অর্ধ-সংবৃত: [এ], [ও]; অর্ধ-বিবৃত: [অ্যা] [অ]; বিবৃত: [আ]। সংবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খোলে; বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট বেশি খোলে।

অনুনাসিক স্বরধ্বনি

মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে বায়ু শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এ সময়ে কোমল তালু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে কোমল তালু খানিকটা নিচে নেমে গেলে কিছুটা বায়ু নাক

দিয়েও বের হয়। এর ফলে ধ্বনিগুলো অনুনাসিক হয়ে যায়। স্বরধ্বনির এই অনুনাসিকতা বোঝাতে বাংলা স্বরবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মৌলিক স্বরধ্বনি: [ই], [এ], [অ্যা], [আ], [অ], [ও], [উ]

অনুনাসিক স্বরধ্বনি: [ইঁ], [এঁ], [অ্যাঁ], [আঁ], [অঁ], [ওঁ], [উঁ]

অর্ধস্বরধ্বনি

যেসব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না সেগুলোকে অর্ধস্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি চারটি: [ই্], [উ্], [এ্] এবং [ও্]। স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে টেনে দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনিকে কোনোভাবেই দীর্ঘ করা যায় না। যেমন –

'চাই' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [ই্]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [ই্] হলো অর্ধস্বরধ্বনি।

একইভাবে 'লাউ' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [উ্]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [উ্] হলো অর্ধস্বরধ্বনি।

দ্বিস্বরধ্বনি

পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়। যেমন – 'লাউ' শব্দের [আ] পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং [উ্] অর্ধস্বরধ্বনি মিলে দ্বিস্বরধ্বনি [আউ্] তৈরি হয়েছে। দ্বিস্বরধ্বনির কিছু উদাহরণ:

[আই্]: তাই, নাই
[এই্]: সেই, নেই
[আও্]: যাও, দাও
[আএ্]: খায়, যায়
[উই্]: দুই, রুই
[অএ্]: নয়, হয়
[ওউ্]: মৌ, বউ
[ওই্]: কৈ, দই
[এউ্]: কেউ, ঘেউ

বাংলা বর্ণমালায় দুটি দ্বিস্বরধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ নির্ধারিত আছে, যথা: ঐ এবং ঔ। ঐ-এর মধ্যে দুটি ধ্বনি আছে, একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [ই্]। একইভাবে ঔ-এর মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [উ্]।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. উচ্চারণের সময়ে জিভের কোন অবস্থানের কারণে স্বরধ্বনি ভাগ করা হয়?
ক. উচ্চতা খ. সম্মুখ গ. পশ্চাৎ ঘ. সবগুলোই সঠিক

২. 'উ' উচ্চারণের সময়ে জিভের অবস্থান –
ক. উচ্চ-সম্মুখ খ. নিম্ন-সম্মুখ গ. উচ্চ-পশ্চাৎ ঘ. নিম্ন-পশ্চাৎ

৩. 'আ' উচ্চারণের সময়ে ঠোঁটের উন্মুক্তি কেমন?
ক. সংবৃত খ. অর্ধ-সংবৃত গ. বিবৃত ঘ. অর্ধ-বিবৃত

৪. জিভের সম্মুখ বা পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি কত প্রকার?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৫. বাংলা স্বরবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয় কী বোঝাতে?
ক. হ্রস্বস্বর খ. দীর্ঘস্বর গ. অনুনাসিকতা ঘ. ব্যঞ্জনা

৬. যে সকল স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না তাদের বলে –
ক. হ্রস্বস্বর খ. অর্ধস্বর গ. দীর্ঘস্বর ঘ. পূর্ণস্বর

৭. পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে মিলে হয় –
ক. স্বরধ্বনি খ. মৌলিক স্বরধ্বনি গ. স্বল্প স্বরধ্বনি ঘ. দ্বিস্বরধ্বনি

৮. 'লাউ' শব্দের মধ্যে কোন কোন স্বরধ্বনি আছে?
ক. অ+ই্ খ. আ+ই্ গ. আ+ এ্ ঘ. আ+উ্

পরিচ্ছেদ ৭
ব্যঞ্জনধ্বনি

উচ্চারণের স্থান ও প্রকৃতি এবং ধ্বনির কম্পন ও বায়ুপ্রবাহ বিবেচনায় ব্যঞ্জনধ্বনিকে অন্তত চার ধরনে ভাগ করা যায়: ১. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বিভাজন, ২. উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাজন, ৩. ধ্বনির কম্পনমাত্রা অনুযায়ী বিভাজন এবং ৪. ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহের মাত্রা অনুযায়ী বিভাজন।

১. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বিভাজন

বাক্প্রত্যঙ্গের ঠিক যে জায়গায় বায়ু বাধা পেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি করে সেই জায়গাটি হলো ঐ ব্যঞ্জনের উচ্চারণস্থান। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়: ১. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন, ২. দন্ত্য ব্যঞ্জন, ৩. দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন, ৪. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন, ৫. তালব্য ব্যঞ্জন, ৬. কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন, ৭. কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন।

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কোন বাক্প্রত্যঙ্গের অংশগ্রহণ মুখ্য এবং কোন বাক্প্রত্যঙ্গের অংশগ্রহণ গৌণ, নিচের সারণিতে তা দেখানো হলো:

ধ্বনি	মুখ্য বাক্প্রত্যঙ্গ	গৌণ বাক্প্রত্যঙ্গ
ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন	নিচের ঠোঁট	উপরের ঠোঁট
দন্ত্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	উপরের পাটির দাঁত
দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	দন্তমূল
মূর্ধন্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	দন্তমূলের পিছনের উঁচু অংশ (মূর্ধা)
তালব্য ব্যঞ্জন	জিভের সামনের অংশ	শক্ত তালু
কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন	জিভের পেছনের অংশ	নরম তালু
কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন	ধ্বনিদ্বারের দুটি পাল্লা	ধ্বনিদ্বার

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে বাক্প্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা

ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট দুটি কাছাকাছি এসে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। এগুলো দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি নামেও পরিচিত। পাকা, ফল, বাবা, ভাই, মা প্রভৃতি শব্দের প, ফ, ব, ভ, ম ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

দন্ত্য ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্ত্য ব্যঞ্জন বলে। তাল, থালা, দাদা, ধান প্রভৃতি শব্দের ত, থ, দ, ধ দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন বলে। নানা, রাত, লাল, সালাম প্রভৃতি শব্দের ন, র, ল, স দন্ত্যমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

মূর্ধন্য ব্যঞ্জন

দন্তমূল এবং তালুর মাঝখানে যে উঁচু অংশ থাকে তার নাম মূর্ধা। যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা মূর্ধার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে মূর্ধন্য ব্যঞ্জন বলে। টাকা, ঠেলাগাড়ি, ডাকাত, ঢোল, গাড়ি, মূঢ় প্রভৃতি শব্দের ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ় মূর্ধন্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

তালব্য ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা খানিকটা প্রসারিত হয়ে শক্ত তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে তালব্য ব্যঞ্জন বলে। চাচা, ছাগল, জাল, ঝড়, শসা প্রভৃতি শব্দের চ, ছ, জ, ঝ, শ তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের পিছনের অংশ উঁচু হয়ে আলজিভের কাছাকাছি নরম তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। কাকা, খালু, গাধা, ঘাস, কাঙাল প্রভৃতি শব্দের ক, খ, গ, ঘ, ঙ কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন

কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বার থেকে বায়ু কণ্ঠনালি হয়ে সরাসরি বের হয়ে আসে। হাতি শব্দের হ কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

২. উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট, জিভ, জিভমূল ইত্যাদি বাক্‌প্রত্যঙ্গের আকৃতিগত পরিবর্তন হয়। এতে বায়ুপথে সৃষ্ট বাধার ধরন আলাদা হয়ে উচ্চারণের প্রকৃতি বদলে যায়। উচ্চারণের এই প্রকৃতি অনুযায়ী

ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন, নাসিক্য ব্যঞ্জন, উষ্ম ব্যঞ্জন, পার্শ্বিক ব্যঞ্জন, কম্পিত ব্যঞ্জন, তাড়িত ব্যঞ্জন ইত্যাদি।

স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্‌প্রত্যঙ্গ পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বায়ুপথে বাধা তৈরি করে, সেগুলোকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বলে। এগুলো স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি নামেও পরিচিত। পথ, তল, টক, চর, কল শব্দের প, ত, ট, চ, ক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী এগুলোকে ওষ্ঠ স্পৃষ্ট, দন্ত স্পৃষ্ট, মূর্ধা স্পৃষ্ট, তালু স্পৃষ্ট এবং কণ্ঠ স্পৃষ্ট – এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা –

ওষ্ঠ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনঃ প, ফ, ব, ভ
দন্ত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনঃ ত, থ, দ, ধ
মূর্ধা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনঃ ট, ঠ, ড, ঢ
তালু স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনঃ চ, ছ, জ, ঝ
কণ্ঠ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনঃ ক, খ, গ, ঘ

নাসিক্য ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে আসা বাতাস মুখের মধ্যে প্রথমে বাধা পায় এবং নাক ও মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, সেসব ধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জন বলে। মা, নতুন, হাঙর প্রভৃতি শব্দের ম, ন, ঙ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

উষ্ম ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্‌প্রত্যঙ্গ কাছাকাছি এসে নিঃসৃত বায়ুতে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে, সেগুলোকে উষ্ম ব্যঞ্জন বলে। সালাম, শসা, হুঙ্কার প্রভৃতি শব্দের স, শ, হ উষ্ম ধ্বনির উদাহরণ। উচ্চারণস্থান অনুসারে উষ্ম ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে দন্তমূলীয় (স), তালব্য (শ), এবং কণ্ঠনালীয় (হ) – এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলোর মধ্যে স এবং শ-কে আলাদাভাবে শিস ধ্বনিও বলা হয়ে থাকে। কারণ স, শ উচ্চারণে শ্বাস অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায় এবং শিসের মতো আওয়াজ হয়।

পার্শ্বিক ব্যঞ্জন

যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা দন্তমূল স্পর্শ করে এবং ফুসফুস থেকে আসা বাতাস জিভের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকে পার্শ্বিক ব্যঞ্জন বলে। লাল শব্দে ল পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

কম্পিত ব্যঞ্জন

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ একাধিক বার অতি দ্রুত দন্তমূলকে আঘাত করে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে কম্পিত ব্যঞ্জন বলে। কর, ভার, হার প্রভৃতি শব্দের র কম্পিত ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

২০২৫

তাড়িত ব্যঞ্জন

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের সামনের অংশ দন্তমূলের একটু উপরে অর্থাৎ মূর্ধায় টোকা দেওয়ার মতো করে একবার ছুঁয়ে যায়, তাকে তাড়িত ব্যঞ্জন বলে। বাড়ি, মূঢ় প্রভৃতি শব্দের ড়, ঢ় তাড়িত ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

৩. ধ্বনির কম্পনমাত্রা অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রের ধ্বনিদ্বারে বায়ুর কম্পন কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ঘোষ ও অঘোষ।

ঘোষ ব্যঞ্জন

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশি, সেসব ধ্বনিকে বলা হয় ঘোষধ্বনি। যথা: ব, ভ, ম, দ, ধ, ন, র, ল, ড, ঢ, ড়, ঢ়, জ, ঝ, গ, ঘ, ঙ, হ ।

অঘোষ ব্যঞ্জন

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত কম, সেসব ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষধ্বনি, যথা: প, ফ, ত, থ, স, ট, ঠ, চ, ছ, শ, ক, খ।

৪. ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ুপ্রবাহের বেগ কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ।

অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন

সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, সেগুলোকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমন – প, ব, ত, দ, স, ট, ড, ড়, চ, জ, শ, ক, গ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন

সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি, সেগুলোকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন – ফ, ভ, থ, ধ, ঠ, ঢ, ঢ়, ছ, ঝ, খ, ঘ, হ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বাক্‌প্রত্যঙ্গের ঠিক যে জায়গায় বাতাস বাধা পেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি হয়, সেই জায়গাটি হলো ব্যঞ্জনের –
ক. উচ্চারণ স্থান খ. উচ্চারণ প্রকৃতি গ. ধ্বনি সৃষ্টি ঘ. ধ্বনি প্রকৃতি

২. দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনির মুখ্য বাক্‌প্রত্যঙ্গ কোনটি?
ক. নিচের ঠোঁট খ. জিভের ডগা গ. আলজিভ ঘ. দাঁত

৩. কোন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে?
ক. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন খ. দন্ত্য ব্যঞ্জন গ. দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন ঘ. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন

৪. তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ আছে কোন শব্দে?
ক. শসা খ. ঘাস গ. কল ঘ. দল

৫. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
ক. ল খ. ম গ. ন ঘ. থ

৬. কোনটি তাড়িত ব্যঞ্জনের উদাহরণ?
ক. র খ. শ গ. ড় ঘ. ণ

৭. কোনগুলো ঘোষ ব্যঞ্জন?
ক. ব, ভ খ. ট, ঠ গ. চ, ছ ঘ. ত, দ

৮. ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ কম থাকলে সেগুলোকে বলে?
ক. ঘোষ ধ্বনি খ. অঘোষ ধ্বনি গ. অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘ. মহাপ্রাণ ধ্বনি

৯. কম্পিত ব্যঞ্জনের উপস্থিতি আছে কোন শব্দে?
ক. বড়ো খ. গাঢ় গ. চানাচুর ঘ. হঠাৎ

১০. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী 'শ' কেমন ধ্বনি?
ক. দন্ত্য খ. মূর্ধন্য গ. তালব্য ঘ. কণ্ঠ্য

২০২৫

পরিচ্ছেদ ৮

বর্ণের উচ্চারণ

বাংলা ভাষায় ৩৭টি মূল ধ্বনিকে প্রকাশ করার জন্য রয়েছে ৫০টি মূল বর্ণ। এর মধ্যে অধিকাংশ বর্ণের উচ্চারণ মূল ধ্বনির অনুরূপ। কয়েকটি বর্ণের একাধিক উচ্চারণ রয়েছে। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে একাধিক বর্ণের উচ্চারণ অভিন্ন। ধ্বনিগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি হওয়ার সময়ে পাশের ধ্বনির প্রভাবে বর্ণের উচ্চারণ অনেক সময়ে বদলে যায়। এখানে বাংলা বর্ণের উচ্চারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

স্বরবর্ণ

অ

অ বর্ণের উচ্চারণ দুই রকম: [অ] এবং [ও]। সাধারণ উচ্চারণ [অ], কিন্তু পাশের ধ্বনির প্রভাবে [অ] কখনো কখনো [ও]-এর মতো উচ্চারিত হয়।
অ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ: অনেক [অনেক্], কথা [কথা], অনাথ [অনাথ্]।
অ বর্ণের [ও] উচ্চারণ: অতি [ওতি], অণু [ওনু], পক্ষ [পোক্খো], অদ্য [ওদ্দো], মন [মোন্]।

আ

আ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ [আ]: আকাশ [আকাশ্], রাত [রাত্], আলো [আলো]।
[আ] জ্ঞ-এর সঙ্গে থাকলে [অ্যা]-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন – জ্ঞান [গ্যাঁন্], জ্ঞাত [গ্যাঁতো], জ্ঞাপন [গ্যাঁপোন্]।

ই, ঈ

[ই] ধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ রয়েছে: ই এবং ঈ। কিন্তু বাংলা ভাষায় উভয় বর্ণের উচ্চারণ একই রকম: দিন [দিন্], দীন [দিনো], বিনা [বিনা], বীণা [বিনা], হীন [হিনো]।

উ, ঊ

[উ] ধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ রয়েছে: উ এবং ঊ। কিন্তু বাংলা ভাষায় উভয় বর্ণের উচ্চারণ একই রকম: উচিত [উচিত্], ঊষা [উশা], উনিশ [উনিশ্], ঊনবিংশ [উনোবিঙ্শো]।

ঋ

ঋ বর্ণের উচ্চারণ [রি]-এর মতো: ঋতু [রিতু], ঋণ [রিন্], কৃষক [ক্রিশক্], দৃশ্য [দ্রিশ্শো]।

এ

এ বর্ণের উচ্চারণ দুই রকম: [এ] এবং [অ্যা]। সাধারণ উচ্চারণ [এ], কিন্তু পাশের ধ্বনির প্রভাবে এ কখনো কখনো [অ্যা] উচ্চারিত হয়।
এ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ: একটি [এক্টি], দেশ [দেশ্], এলো [এলো]।

এ বর্ণের [অ্যা] উচ্চারণ: একটা [অ্যাক্‌টা], বেলা [ব্যালা], খেলা [খ্যালা]।

ঐ

ঐ বর্ণের উচ্চারণ [ওই্‌]: ঐকিক [ওই্‌কিক্‌], তৈল [তোই্‌লো]।

ও

ও বর্ণের উচ্চারণ [ও]: ওল [ওল্‌], বোধ [বোধ্‌]।

ঔ

ঔ বর্ণের উচ্চারণ [ওউ্‌]: ঔষধ [ওউ্‌শধ্‌], মৌমাছি [মোউ্‌মাছি]।

ব্যঞ্জনবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণগুলো সাধারণত নিজ নিজ ধ্বনি অনুযায়ী উচ্চারিত হয়। যেমন – কলা, খর, বল, নাচ শব্দের ক, খ, ব, ন ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ যথাক্রমে [ক], [খ], [ব], [ন] ইত্যাদি।
তবে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ নিজ নিজ ধ্বনি থেকে আলাদা। এ ধরনের কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ঞ

ঞ বর্ণের নিজস্ব কোনো ধ্বনি নেই। স্বতন্ত্র ব্যবহারে [আঁ]-এর মতো আর সংযুক্ত ব্যঞ্জনে [ন্‌]-এর মতো উচ্চারিত হয়: মিঞা [মিয়াঁ], চঞ্চল [চন্‌চল্‌], গঞ্জ [গন্‌জো]।

ণ

ণ বর্ণের উচ্চারণ [ন্‌]: কণা [কনা], বাণী [বানি], হরিণ [হোরিন্‌]।

ব

ব বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ [ব]। তবে ফলা হিসেবে এই বর্ণের উচ্চারণে স্বাতন্ত্র্য আছে।
শব্দের আদিতে ব-ফলার উচ্চারণ হয় না। যেমন – ত্বক [তক্‌], শ্বশুর [শোশুর্‌], স্বাধীন [শাধিন্‌]।
শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা যুক্ত হলে সেই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়: অশ্ব [অশ্‌শো], বিশ্বাস [বিশ্‌শাশ্‌], পক্ব [পক্‌কো]।

ম

ম বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ [ম]। শব্দের প্রথম বর্ণে ম-ফলা থাকলে সেই বর্ণ উচ্চারণের সময়ে ম-এর উচ্চারণ [অঁ]-এর মতো হয়, যেমন – শ্মশান [শঁশান্‌], স্মরণ [শঁরোন্‌]। শব্দের মধ্যে ম-ফলা থাকলে সেই বর্ণ উচ্চারণে দ্বিত্ব হয় এবং সামান্য অনুনাসিক হয়, যেমন – আত্মীয় [আত্‌তিঁয়ো], পদ্ম [পদ্‌দোঁ]। কিছু ক্ষেত্রে ম-ফলায় ম্‌-এর উচ্চারণ বজায় থাকে, যেমন – যুগ্ম [জুগ্‌মো], জন্ম [জন্‌মো], গুল্ম [গুল্‌মো]।

য

য বর্ণের উচ্চারণ [জ্‌]: যদি [জোদি], যিনি [জিনি], সূর্য [শুর্‌জো]। তবে য-ফলা থাকলে স্বরের উচ্চারণে পরিবর্তন হয়, যেমন – যেমন – ব্যতীত [বেতিতো], ব্যথা [ব্যাথা]। শব্দের মাঝখানে বা শেষে য-ফলা বর্ণের

২০২৩

সঙ্গে যুক্ত থাকলে ঐ বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়, যেমন – উদ্যম [উদ্‌দম্], গদ্য [গোদ্‌দো]। কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে থাকা 'য'-এর কোনো উচ্চারণ হয় না, যেমন – সন্ধ্যা [শোন্‌ধা], স্বাস্থ্য [শাস্‌থো], অর্ঘ্য [অর্‌ঘো]।

র

র বর্ণের উচ্চারণ [র]। তবে র-ফলা হিসেবে এর উচ্চারণে বৈচিত্র্য আছে। শব্দের মধ্যে বা শেষে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা থাকলে দ্বিত্বসহ র-ফলা উচ্চারিত হয়, যেমন – মাত্র [মাত্‌ত্রো], বিদ্রোহ [বিদ্‌দ্রোহো], যাত্রী [জাত্‌ত্রি]। কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না, যেমন – কেন্দ্র [কেন্‌দ্রো], শাস্ত্র [শাস্‌ত্রো], বস্ত্র [বস্‌ত্রো]।

শ, ষ, স

শ কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়, কখনো [স]-এর মতো উচ্চারিত হয়। স কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়, আবার কখনো [স]-এর মতো উচ্চারিত হয়। ষ বর্ণের উচ্চারণ সব সময়ে [শ]।

শ বর্ণের [শ] উচ্চারণ: শত [শতো], শসা [শশা]।
শ বর্ণের [স] উচ্চারণ: শ্রমিক [স্রোমিক্], শৃগাল [স্রিগাল্]।
ষ বর্ণের [শ] উচ্চারণ: ভাষা [ভাশা], ষোলো [শোলো]।
স বর্ণের [শ] উচ্চারণ: সাধারণ [শাধারোন্], সামান্য [শামান্‌নো]।
স বর্ণের [স] উচ্চারণ: আস্তে [আস্‌তে], সালাম [সালাম্]।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. ব-ফলার উচ্চারণ নেই কোন শব্দে?
ক. অশ্ব খ. পক্ব গ. বিশ্বাস ঘ. শ্বশুর

২. 'অদ্য' শব্দের উচ্চারণ –
ক. ওদ্‌দো খ. অদদো গ. অদ্‌দো ঘ. ওইদ্‌দো

৩. 'ঋণ'-এর উচ্চারণ –
ক. রিন্ খ. রিণ্ গ. ঋন্ ঘ. ঋণ

৪. কোন বর্ণটির নিজস্ব কোনো ধ্বনি নেই?
ক. ক্ষ খ. গ গ. ৎ ঘ. ঞ

৫. 'আ' কখনো অ্যা-এর মতো উচ্চারিত হয়, যেমন –
ক. রাত খ. কাতুকুতু গ. জ্ঞান ঘ. একা

৬. 'এ' বর্ণের বিবৃত উচ্চারণের উদাহরণ –
ক. একটি খ. এবার গ. দেশ ঘ. খেলা

পরিচ্ছেদ ৯

শব্দ ও পদের গঠন

এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি শব্দের মূল অংশকে শব্দমূল বলে। শব্দমূলের এক নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি দুই ধরনের: নামপ্রকৃতি ও ক্রিয়াপ্রকৃতি। ক্রিয়াপ্রকৃতির অন্য নাম ধাতু। নামপ্রকৃতি ও ধাতুর সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়। নামপ্রকৃতির উদাহরণ: মা, গাছ, শির, লতা ইত্যাদি। ধাতুর উদাহরণ: কর্, যা, চল্, ধৃ ইত্যাদি।

নামপ্রকৃতি ও ধাতুর সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোর নাম উপসর্গ ও প্রত্যয়:

> **উপসর্গ:** যেসব শব্দাংশ শব্দমূলের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে। 'পরিচালক' শব্দের 'পরি' অংশ একটি উপসর্গ।
>
> **প্রত্যয়:** যেসব শব্দাংশ শব্দমূলের পরে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। 'সাংবাদিক' শব্দের 'ইক' অংশ একটি প্রত্যয়।

উপসর্গ ও প্রত্যয় দিয়ে তৈরি শব্দকে সাধিত শব্দ বলা হয়। উপসর্গ ও প্রত্যয় ছাড়া শব্দ গঠনের আরো কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রক্রিয়া হলো সমাস, যার মাধ্যমে একাধিক শব্দ এক শব্দে পরিণত হয়। যেমন 'হাট' ও 'বাজার' শব্দ দুটি সমাসবদ্ধ হয়ে হয় 'হাটবাজার'। এছাড়া কোনো শব্দের দ্বৈত ব্যবহারে নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে বলে শব্দদ্বিত্ব, যেমন 'ঠক' ও 'ঠক' মিলে গঠিত হয় 'ঠকঠক', একইভাবে 'অঙ্ক' ও অনুরূপ ধ্বনি 'টঙ্ক' মিলে হয় 'অঙ্কটঙ্ক'।

শব্দ যখন বাক্যের মধ্যে থাকে, তখন তার নাম হয় পদ। পদে পরিণত হওয়ার সময়ে শব্দের সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয়, এগুলোর নাম লগ্নক। লগ্নক চার ধরনের:

> **বিভক্তি:** ক্রিয়ার কাল নির্দেশের জন্য এবং কারক বোঝাতে পদের সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত থাকে, সেগুলোকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি দুই প্রকার: ক্রিয়া-বিভক্তি ও কারক-বিভক্তি। 'করলাম' ক্রিয়াপদের 'লাম' শব্দাংশ হলো ক্রিয়া-বিভক্তি এবং 'কৃষকের' পদের 'এর' শব্দাংশ কারক-বিভক্তির উদাহরণ।
>
> **নির্দেশক:** যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদকে নির্দিষ্ট করে, সেগুলোকে নির্দেশক বলে। 'লোকটি' বা 'ভালোটুকু' পদের 'টি' বা 'টুকু' হলো নির্দেশকের উদাহরণ।
>
> **বচন:** যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদের সংখ্যা বোঝায়, সেগুলোকে বচন বলে। 'ছেলেরা' বা 'বইগুলো' পদের 'রা' বা 'গুলো' হলো বচনের উদাহরণ।
>
> **বলক:** যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালো হয়, সেগুলোকে বলক বলে। 'তখনই' বা 'এখনও' পদের 'ই' বা 'ও' হলো বলকের উদাহরণ।

বাক্যের যেসব পদে লগ্নক থাকে সেগুলোকে সলগ্নক পদ এবং যেসব পদে লগ্নক থাকে না সেগুলোকে অলগ্নক পদ বলে। 'ছেলেরা ক্রিকেট খেলে' – এই বাক্যের 'ছেলেরা' ও 'খেলে' সলগ্নক পদ আর 'ক্রিকেট' অলগ্নক পদ।

শব্দ ও পদের মধ্যকার কয়েকটি পার্থক্য নিচে দেখানো হলো:

শব্দ	পদ
১. প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব শব্দভাণ্ডার থাকে। সাধারণত অভিধানে তা সংকলিত হয়।	১. শব্দ যখন বাক্যে স্থান পায়, তখন তার নাম হয় পদ।
২. অভিধানের শব্দগুলো বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন।	২. বাক্যের মধ্যে পদগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
৩. শব্দের অংশ উপসর্গ ও প্রত্যয়।	৩. পদের অংশ বিভক্তি, নির্দেশক, বচন ও বলক।
৪. গঠনগতভাবে শব্দ দুই শ্রেণির: মূল শব্দ ও সাধিত শব্দ।	৪. গঠনগতভাবে পদ দুই রকমের: অলগ্নক পদ ও সলগ্নক পদ।
৫. শব্দ শুধু রূপতত্ত্বের আলোচ্য।	৫. পদ একইসঙ্গে রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে কী বলে?
ক. পদাণু খ. পদ গ. বাক্যাংশ ঘ. প্রকৃতি

২. পদের লগ্নক কত ধরনের?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৩. কোনটি শব্দের শেষে যুক্ত হয় না?
ক. প্রত্যয় খ. বিভক্তি গ. বলক ঘ. উপসর্গ

৪. যেসব শব্দাংশ পদের যঙ্গে যুক্ত হয়ে বক্তব্য জোরালো করে তাকে কী বলে?
ক. বলক খ. প্রত্যয় গ. বিভক্তি ঘ. উপসর্গ

৫. কোনটি সাধিত শব্দ?
ক. গাছ খ. পরিচালক গ. মাছ ঘ. চাঁদ

৬. কোনটি মৌলিক শব্দ?

ক. চাঁদ খ. বন্ধুত্ব গ. প্রশাসন ঘ. দায়িত্ব

৭. শব্দের কোথায় প্রত্যয় যুক্ত হয়?

ক. প্রথমে খ. শেষে গ. মধ্যে ঘ. যে কোনো স্থানে

৮. কোনটি নির্দেশক?

ক. রা খ. পরি গ. টুকু ঘ. ই

৯. কোনটি লগ্নক নয়?

ক. প্রত্যয় খ. নির্দেশক গ. বলক ঘ. বচন

১০. ‘নৌকার ছইয়ে নীল মাছরাঙাটি বসে আছে’ বাক্যে অলগ্নক পদ কোনটি?

ক. নৌকার খ. ছইয়ে গ. নীল ঘ. মাছরাঙাটি

পরিচ্ছেদ ১০

উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন

যেসব অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে। অজানা (অ+জানা), অভিযোগ (অভি+যোগ), বেতার (বে+তার) প্রভৃতি শব্দের 'অ', 'অভি', 'বে' হলো উপসর্গ।

অনেক সময়ে শব্দের শুরুতে একসঙ্গে একাধিক উপসর্গ বসতে পারে। যেমন, 'সম্প্রদান' শব্দে 'দান'-এর আগে 'সম্' এবং 'প্র' – এই দুটি উপসর্গ যুক্ত হয়েছে। একইভাবে 'বিনির্মাণ' শব্দে 'মান'-এর আগে বসেছে 'বি' এবং 'নির্' উপসর্গ।

উপসর্গের নিজের অর্থ নেই; কিন্তু নতুন নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরিতে উপসর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য বলা হয় – উপসর্গের অর্থ নেই, কিন্তু অর্থের দ্যোতনা তৈরি করার ক্ষমতা আছে।

বাংলা ভাষায় অর্ধশতাধিক উপসর্গ রয়েছে।

উপসর্গের কাজ

নতুন শব্দ তৈরি করা উপসর্গের কাজ। যেমন – সম্+বাদ = সংবাদ, বি+বাদ = বিবাদ। 'বাদ' শব্দের সঙ্গে 'সম্' এবং 'বি' উপসর্গ যোগ করে নতুন শব্দ 'সংবাদ' ও 'বিবাদ' তৈরি হলো।

উপসর্গের আর একটি কাজ শব্দের অর্থ পরিবর্তন করা। যেমন – সু+নজর = সুনজর (অর্থের সংকোচন); সম্+পূর্ণ = সম্পূর্ণ (অর্থের সম্প্রসারণ); গর+হাজির = গরহাজির (বিপরীত অর্থ) ইত্যাদি।

নিচে কয়েকটি সুপরিচিত উপসর্গের অর্থদ্যোতনা, সাধিত শব্দ ও বিশ্লেষণ দেখানো হলো।

উপসর্গ	শব্দ গঠন	সাধিত শব্দ	দ্যোতনা
অ-	অ+কাজ	অকাজ	অনুচিত
	অ+বোধ	অবোধ	অল্প
অতি-	অতি+কায়	অতিকায়	বৃহৎ
	অতি+আচার	অত্যাচার	অতিরিক্ত
অধি-	অধি+কার	অধিকার	কর্তৃত্ব
	অধি+বাসী	অধিবাসী	মধ্যে
অনা-	অনা+বৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	অভাব
	অনা+সৃষ্টি	অনাসৃষ্টি	বাজে
অনু-	অনু+গমন	অনুগমন	পিছনে
	অনু+রূপ	অনুরূপ	তুল্য
অপ-	অপ+কর্ম	অপকর্ম	মন্দ
	অপ+সংস্কৃতি	অপসংস্কৃতি	বিকৃত

অব-	অব+দান	অবদান	বিশেষ
	অব+গুণ্ঠন	অবগুণ্ঠন	অল্প
অভি-	অভি+জ্ঞ	অভিজ্ঞ	সম্যক
	অভি+জাত	অভিজাত	উত্তম
আ-	আ+রক্ত	আরক্ত	ঈষৎ
	আ+খাম্বা	আখাম্বা	সদৃশ
উৎ-	উৎ+ক্ষেপণ	উৎক্ষেপণ	ঊর্ধ্বে
	উৎ+বাস্তু	উদ্বাস্তু	পরিত্যক্ত
উপ-	উপ+কূল	উপকূল	নিকট
	উপ+ভোগ	উপভোগ	সম্যক
কদ-	কদ+বেল	কদবেল	গৌণ
কু-	কু+কাজ	কুকাজ	নিন্দনীয়
	কু+পথ	কুপথ	অসৎ
গর-	গর+হাজির	গরহাজির	বিপরীত
	গর+ঠিকানা	গরঠিকানা	ভিন্ন
দর-	দর+দালান	দরদালান	মধ্যস্থ
	দর+কাঁচা	দরকাঁচা	সামান্য
দুঃ- (দুর্/দুস্)	দুঃ+শাসন	দুঃশাসন	মন্দ
	দুর্+মূল্য	দুর্মূল্য	অধিক
	দুস্+প্রাপ্য	দুষ্প্রাপ্য	অল্প
	দুর্+দিন	দুর্দিন	মন্দ
না-	ন+লায়েক	নালায়েক	অপূর্ণ
	না+হক	নাহক	নেতি
নি-	নি+দারুণ	নিদারুণ	অতিশয়
	নি+খাদ	নিখাদ	নেই এমন
নিঃ-(নির্/নিস)	নিঃ+শেষ	নিঃশেষ	পুরোপুরি
	নির্+ধন	নির্ধন	নেই এমন
	নির্+গমন	নির্গমন	বাইরে
	নিস্+তরঙ্গ	নিস্তরঙ্গ	নেই এমন
নিম-	নিম+খুন	নিমখুন	প্রায়
	নিম+রাজি	নিমরাজি	অর্ধেক
পরা-	পরা+জয়	পরাজয়	বিপরীত
	পরা+বাস্তব	পরাবাস্তব	অতিশয়
পরি-	পরি+ত্যাগ	পরিত্যাগ	সম্পূর্ণ
	পরি+পন্থী	পরিপন্থী	বিরুদ্ধ
পাতি-	পাতি+হাঁস	পাতিহাঁস	ছোটো
প্র-	প্র+গতি	প্রগতি	প্রকৃষ্ট
	প্র+কোপ	প্রকোপ	প্রচণ্ড
প্রতি-	প্রতি+ধ্বনি	প্রতিধ্বনি	তুল্য
	প্রতি+হিংসা	প্রতিহিংসা	পালটা

বদ-	বদ+মেজাজ	বদমেজাজ	উগ্র
	বদ+জাত	বজ্জাত	নিন্দনীয়
বি-	বি+ভুঁই	বিভুঁই	ভিন্ন
	বি+জ্ঞান	বিজ্ঞান	বিশেষ
বে-	বে+দখল	বেদখল	হৃত
	বে+আইন	বেআইন	বহির্ভূত
ভর-	ভর+পেট	ভরপেট	পূর্ণ
	ভর+জোয়ার	ভরজোয়ার	চূড়ান্ত
স-	স+ঠিক	সঠিক	সম্পূর্ণ
সম্-	সম্+মুখ	সম্মুখ	অভিমুখে
	সম্+যোজন	সংযোজন	একত্র
সু-	সু+দিন	সুদিন	ভালো
	সু+কৌশল	সুকৌশল	চমৎকার
হা-	হা+ভাত	হাভাত	অভাব

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১ নিচের কোনটি উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দ?

ক. প্রবীণ খ. ভিখারি গ. বাবুয়ানা ঘ. সেলাই

২. নিচের কোন শব্দে অপূর্ণ অর্থে 'না' উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. নাহক খ. নাজুক গ. নালায়েক ঘ. নাদাবি

৩. ঈষৎ অর্থ প্রকাশ করছে কোন উপসর্গ যুক্ত শব্দটি?

ক. আখাম্বা খ. উপকূল গ. অনভিজ্ঞ ঘ. আরক্ত

৫. নিচের কোনটি উপসর্গ?

ক. গুলো খ. উপ গ. টা ঘ. ও

৬. 'পাতি' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়?

ক. ছোটো খ. বিপরীত গ. নিম্ন ঘ. শূন্য

পরিচ্ছেদ ১১

প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন

শব্দ ও ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। যেমন – বাঘ+আ=বাঘা; দিন+ইক = দৈনিক; দুল্‌+অনা = দোলনা; কৃ+তব্য = কর্তব্য।

শব্দের পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়, সেগুলোকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। তদ্ধিত প্রত্যয় দিয়ে সাধিত শব্দকে বলে তদ্ধিতান্ত শব্দ। উপরের উদাহরণে 'আ' ও 'ইক' তদ্ধিত প্রত্যয় এবং 'বাঘা' ও 'দৈনিক' হলো তদ্ধিতান্ত শব্দ।

অন্যদিকে ধাতুর পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়, সেগুলোকে কৃৎপ্রত্যয় বলে। কৃৎপ্রত্যয় দিয়ে সাধিত শব্দকে বলে কৃদন্ত শব্দ। উপরের উদাহরণে, 'অনা' ও 'তব্য' হলো কৃৎপ্রত্যয় এবং 'দোলনা' ও 'কর্তব্য' হলো কৃদন্ত শব্দ।

প্রত্যয়ের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। তবে প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার পরে অনেক সময়ে শব্দের অর্থ ও শ্রেণিপরিচয় বদলে যায়। নিচে প্রত্যয় দিয়ে গঠিত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো:

প্রত্যয়	শব্দ গঠন	সাধিত শব্দ	প্রত্যয়ের ধরন
-অ	শিশু+অ	শৈশব	তদ্ধিত
	জি+অ	জয়	কৃৎ
-অক	পঠ্‌+অক	পাঠক	কৃৎ
	নিন্দ্‌+অক	নিন্দক	কৃৎ
-অট	দাপ+অট	দাপট	তদ্ধিত
	কপ্‌+অট	কপট	কৃৎ
-অনা	দুল্‌+অনা	দোলনা	কৃৎ
	খেল্‌+অনা	খেলনা	কৃৎ
-অনীয়	মান্‌+অনীয়	মাননীয়	কৃৎ
	দৃশ্‌+অনীয়	দর্শনীয়	কৃৎ
-অন্ত	উড়্‌+অন্ত	উড়ন্ত	কৃৎ
	মহ্‌+অন্ত	মহন্ত	কৃৎ
-অম	কর্দ্‌+অম	কর্দম	কৃৎ
	চর্‌+অম	চরম	কৃৎ
-আ	বাঘ+আ	বাঘা	তদ্ধিত
	পড়্‌+আ	পড়া	কৃৎ
	শুন্‌+আ	শোনা	কৃৎ
-আই	ঢাকা+আই	ঢাকাই	তদ্ধিত
	সিল্‌+আই	সেলাই	কৃৎ
-আও	ঘির্‌+আও	ঘেরাও	কৃৎ
	পাকড়্‌+আও	পাকড়াও	কৃৎ

২০২৩

-আন	গাড়ি+আন	গাড়োয়ান	তদ্ধিত
	শী+আন	শয়ান	কৃৎ
-আনা	বিবি+আনা	বিবিয়ানা	তদ্ধিত
	মুনশি+আনা	মুনশিয়ানা	তদ্ধিত
-আনি	বাবু+আনি	বাবুয়ানি	তদ্ধিত
	শুন্+আনি	শুনানি	কৃৎ
-আনো	বেত+আনো	বেতানো	তদ্ধিত
	চাল্+আনো	চালানো	কৃৎ
-আমি	পাগল+আমি	পাগলামি	তদ্ধিত
	ছেলে+আমি	ছেলেমি	তদ্ধিত
-আরি	ভিখ+আরি	ভিখারি	তদ্ধিত
	ধুন+আরি	ধুনারি	তদ্ধিত
-আরু	বোমা+আরু	বোমারু	তদ্ধিত
	খোঁজ্+আরু	খোঁজারু	কৃৎ
-আল	ঘাট+আল	ঘাটাল	তদ্ধিত
	মাত্+আল	মাতাল	কৃৎ
-আলো	জমক+আলো	জমকালো	তদ্ধিত
	রস+আলো	রসালো	তদ্ধিত
-ই	চাষ+ই	চাষি	তদ্ধিত
	ভাজ্+ই	ভাজি	কৃৎ
-ইক	দিন+ইক	দৈনিক	তদ্ধিত
	চরিত্র+ইক	চারিত্রিক	তদ্ধিত
-ইয়া	জাল+ইয়া	জালিয়া>জেলে	তদ্ধিত
	গা+ইয়া	গাইয়া>গাইয়ে	কৃৎ
-ইল	পঙ্ক+ইল	পঙ্কিল	তদ্ধিত
	সল্+ইল	সলিল	কৃৎ
-ইষ্ণু	চল্+ইষ্ণু	চলিষ্ণু	কৃৎ
	সহ্+ইষ্ণু	সহিষ্ণু	কৃৎ
-ঈ (ইন্)	প্রাণ+ঈ	প্রাণী	তদ্ধিত
	স্থা+ঈ	স্থায়ী	কৃৎ
-ঈ	নর+ঈ	নারী	তদ্ধিত
	ছাত্র+ঈ	ছাত্রী	তদ্ধিত
-ঈন	গ্রাম+ঈন	গ্রামীণ	তদ্ধিত
	সর্বজন+ঈন	সর্বজনীন	তদ্ধিত
-ঈয়	রাষ্ট্র+ঈয়	রাষ্ট্রীয়	তদ্ধিত
	মিশর+ঈয়	মিশরীয়	তদ্ধিত

-উ	ঢাল+উ	ঢালু	তদ্ধিত
	ঝাড়ু+উ	ঝাড়ু	কৃৎ
-উক	পেট+উক	পেটুক	তদ্ধিত
	মিশ্+উক	মিশুক	কৃৎ
-উড়	গর+উড়	গরুড়	তদ্ধিত
	লেজ+উড়	লেজুড়	তদ্ধিত
-উয়া	মাছ+উয়া	মাছুয়া	তদ্ধিত
	পড়ু+উয়া	পড়ুয়া	কৃৎ
-ওয়া	ঘর+ওয়া	ঘরোয়া	তদ্ধিত
	লাগ্+ওয়া	লাগোয়া	কৃৎ
-ওয়ালা	বাড়ি+ওয়ালা	বাড়িওয়ালা	তদ্ধিত
	রিকশা+ওয়ালা	রিকশাওয়ালা	তদ্ধিত
-ক	ফলা+ক	ফলক	তদ্ধিত
	চড়ু+ক	চড়ক	কৃৎ
-কর	বাজি+কর	বাজিকর	তদ্ধিত
	কারি+কর	কারিকর	তদ্ধিত
-খানা	ছাপা+খানা	ছাপাখানা	তদ্ধিত
	ডাক্তার+খানা	ডাক্তারখানা	তদ্ধিত
-ড়া	গাছ+ড়া	গাছড়া	তদ্ধিত
	চাম+ড়া	চামড়া	তদ্ধিত
-ত	মুচ্+ত	মুক্ত	কৃৎ
	জ্ঞা+ত	জ্ঞাত	কৃৎ
-তব্য	কৃ+তব্য	কর্তব্য	কৃৎ
	দা+তব্য	দাতব্য	কৃৎ
-তম	আশি+তম	আশিতম	তদ্ধিত
	দীর্ঘ+তম	দীর্ঘতম	তদ্ধিত
-তর	এমন+তর	এমনতর	তদ্ধিত
	অশ্ব+তর	অশ্বতর	তদ্ধিত
-তা	শত্রু+তা	শত্রুতা	তদ্ধিত
	বহ্+তা	বহতা	কৃৎ
-তি	চাক+তি	চাকতি	তদ্ধিত
	কাট্+তি	কাটতি	কৃৎ
-ত্ব	কবি+ত্ব	কবিত্ব	তদ্ধিত
	সতী+ত্ব	সতীত্ব	তদ্ধিত
-ত্র	ছদ্+ত্র	ছত্র	কৃৎ
	নী+ত্র	নেত্র	কৃৎ
-থ	চতুর্+থ	চতুর্থ	তদ্ধিত
	কাশ+থ	কাষ্ঠ	কৃৎ
-দার	অংশী+দার	অংশীদার	তদ্ধিত

২০২৫

	চুড়ি+দার	চুড়িদার	তদ্ধিত
-ন	নাতি+ন	নাতিন	তদ্ধিত
-না	রাঁধ্+না	রান্না	কৃৎ
	কাঁদ্+না	কান্না	কৃৎ
-পনা	গিন্নি+পনা	গিন্নিপনা	তদ্ধিত
	বেহায়া+পনা	বেহায়াপনা	তদ্ধিত
-বর	স্থা+বর	স্থাবর	কৃৎ
	চত্+বর	চত্বর	কৃৎ
-বাজ	ধান্দা+বাজ	ধান্দাবাজ	তদ্ধিত
	ধোঁকা+বাজ	ধোঁকাবাজ	তদ্ধিত
-বান	দয়া+বান	দয়াবান	তদ্ধিত
	জ্ঞান+বান	জ্ঞানবান	তদ্ধিত
-মান	বুদ্ধি+মান	বুদ্ধিমান	তদ্ধিত
	বৃধ্+মান	বর্ধমান	কৃৎ
-য	সুন্দর+য	সৌন্দর্য	তদ্ধিত
	কৃ+য	কার্য	কৃৎ
-র	মধু+র	মধুর	তদ্ধিত
	নম্+র	নম্র	কৃৎ
-ল	দীঘ+ল	দীঘল	তদ্ধিত
	অম্+ল	অম্ল	কৃৎ
-লা	মেঘ+লা	মেঘলা	তদ্ধিত
	হাম্+লা	হামলা	কৃৎ
-সই	মানান+সই	মানানসই	তদ্ধিত
	চলন+সই	চলনসই	তদ্ধিত
-সে	পানি+সে	পানসে	তদ্ধিত
	ফিকা+সে	ফ্যাকাসে	তদ্ধিত

প্রত্যয় যোগ করলে শব্দের অর্থ অনেক সময়ে বদলে যায়, যেমন –

অবজ্ঞা অর্থে: চোর⟶চোরা, বৃহৎ অর্থে: ডিঙি⟶ডিঙা, সদৃশ অর্থে: বাঘ⟶বাঘা, আগত অর্থে: দখিন⟶দখিনা, আদর অর্থে: কানু⟶ কানাই, জাত অর্থে: ঢাকা ⟶ ঢাকাই, ভাব অর্থে: ইতর ⟶ ইতরামি, নিন্দা অর্থে: জেঠা ⟶ জেঠামি, ভাব অর্থে: বাহাদুর ⟶ বাহাদুরি, পেশা অর্থে: ডাক্তার ⟶ ডাক্তারি, মালিক অর্থে: জমিদার ⟶ জমিদারি, উপকরণ অর্থে: মাটি ⟶ মেটে, নৈপুণ্য অর্থে: না ⟶ নেয়ে, রোগগ্রস্ত অর্থে: বাত ⟶ বেতো, যুক্ত অর্থে: টাক ⟶ টেকো, সংশ্লিষ্ট অর্থে: গাঁ ⟶ গেঁয়ো।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. ধাতুর পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয় তাদের কী বলে?
ক. কৃৎ প্রত্যয় খ. তদ্ধিত প্রত্যয় গ. কৃদন্ত শব্দ ঘ. তদ্ধিতান্ত পদ

২. তদ্ধিত প্রত্যয় দিয়ে সাধিত শব্দকে কী বলে?
ক. প্রত্যয় খ. প্রকৃতি গ. মৌলিক শব্দ ঘ. তদ্ধিতান্ত শব্দ

৩. নিচের কোনটি তদ্ধিতান্ত শব্দের উদাহরণ?
ক. খেলনা খ. নাগর গ. গমন ঘ. পড়া

৪. নিচের কোনটির নিজস্ব অর্থ আছে?
ক. প্রত্যয় খ. উপসর্গ গ. শব্দ ঘ. বচন

৫. নিচের কোনটি কৃদন্ত শব্দের উদাহরণ?
ক. ভাজি খ. বিবাহিত গ. দৈনিক ঘ. পাগলামি

৬. নিচের কোন শব্দটি 'উয়া' প্রত্যয় যোগে গঠিত?
ক. লাগোয়া খ. ঘরোয়া গ. পড়ুয়া ঘ. বাড়িওয়ালা

৭. অবজ্ঞা অর্থে কোন শব্দটি ব্যবহার হয়েছে?
ক. কানাই খ. গেঁয়ো গ. চোরা ঘ. বেতো

পরিচ্ছেদ ১২

সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন

সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়। বাক্যের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক পদের এক শব্দে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। নিচের বাক্য দুটির দিকে তাকানো যাক:

১ম বাক্য: পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময় সংক্রান্ত সূচি স্কুল ও কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

২য় বাক্য: পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময়সূচি স্কুল-কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন ।

১ম বাক্যের 'পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক', 'সময় সংক্রান্ত সূচি' এবং 'স্কুল ও কলেজ' পদগুলো ২য় বাক্যে যথাক্রমে 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক', 'সময়সূচি' এবং 'স্কুল-কলেজ' হিসেবে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। এই সংক্ষেপ প্রক্রিয়ার নাম সমাস।

সমাসবদ্ধ শব্দকে বলে সমস্তপদ, যেমন 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক', 'সময়সূচি' এবং 'স্কুল-কলেজ'। এর প্রথম অংশের নাম পূর্বপদ এবং শেষ অংশের নাম পরপদ। এখানে 'পরীক্ষা', 'সময়' ও 'স্কুল' হলো পূর্বপদ এবং 'নিয়ন্ত্রক', 'সূচি' ও 'কলেজ' হলো পরপদ।

যেসব শব্দ দিয়ে সমস্তপদকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে ব্যাসবাক্য বলে। এখানে 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক' পদের ব্যাসবাক্য হলো 'পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক', 'সময়সূচি' পদের ব্যাসবাক্য হলো 'সময় সংক্রান্ত সূচি' এবং 'স্কুল-কলেজ' পদের ব্যাসবাক্য হলো 'স্কুল ও কলেজ'। এছাড়া যেসব পদ নিয়ে সমাস হয়, সেগুলোকে সমস্যমান পদ বলে। ১ম বাক্যের 'পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক' পদগুলোর 'পরীক্ষাসমূহের' এবং 'নিয়ন্ত্রক' হলো সমস্যমান পদ।

সমস্তপদ সাধারণত এক শব্দ হিসেবে লেখা হয়, যেমন 'সময়সূচি'। উচ্চারণ বা অর্থের বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কায় কিছু ক্ষেত্রে পূর্বপদ ও পরপদের মাঝখানে হাইফেন (-) বসে, যেমন 'স্কুল-কলেজ'। কিছু ক্ষেত্রে পূর্বপদ ও পরপদকে আলাদা লেখা হয়, যেমন 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক'।

সমাস মূলত চার প্রকার। যথা: দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি।

১. দ্বন্দ্ব সমাস

দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয় পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে। যেমন – 'সোনা-রুপা' সমস্তপদের ব্যাসবাক্য 'সোনা ও রুপা'। নিচের বাক্যে সমস্তপদটির প্রয়োগ থেকে এর পূর্বপদ ও পরপদের অর্থের প্রাধান্য বোঝা যাবে:

সোনা-রুপার দাম বেড়ে গেছে।

অর্থাৎ সোনার দামও বেড়ে গেছে, রুপার দামও বেড়ে গেছে।

দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে সমজাতীয়, বিপরীত ও অনুরূপ শব্দের সংযোগ ঘটে। যেমন – মা ও বাবা = মা-বাবা, স্বর্গ ও নরক = স্বর্গ-নরক, জমা ও খরচ = জমাখরচ, হাত ও পা = হাত-পা, উনিশ ও বিশ = উনিশ-বিশ, ঝড় ও বৃষ্টি = ঝড়বৃষ্টি, পোটলা ও পুটলি = পোটলা-পুটলি, তুমি ও আমি = তুমি-আমি, আসা ও যাওয়া = আসা-যাওয়া, ধীরে ও সুস্থে = ধীরেসুস্থে, ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ।

২০২৫

কিছু দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের বিভক্তি সমাসবদ্ধ হলেও বিদ্যমান থাকে। এই ধরনের দ্বন্দ্ব সমাসের নাম অলুক দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন –
হাতে ও কলমে = হাতে-কলমে, চোখে ও মুখে = চোখেমুখে, চলনে ও বলনে = চলনে-বলনে ইত্যাদি।

সমস্যমান পদ কখনো কখনো দুইয়ের বেশি হতে পারে। যেমন –
সাহেব, বিবি ও গোলাম = সাহেব-বিবি-গোলাম; হাত, পা, চোখ ও কান = হাত-পা-চোখ-কান ইত্যাদি।

২. কর্মধারয় সমাস

যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন – গোলাপ নামের ফুল = গোলাপফুল, যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচা-মিঠা।

ক. কিছু কর্মধারয় সমাসের সমস্যমান পদে 'যে' যোজক থাকে, যেমন –
খাস যে জমি = খাসজমি, চিত যে সাঁতার = চিতসাঁতার
ভাজা যে বেগুন = বেগুনভাজা, সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ
কনক যে চাঁপা = কনকচাঁপা, টাক যে মাথা = টাকমাথা
যে চালাক সে চতুর = চালাকচতুর, যে শান্ত সে শিষ্ট = শান্তশিষ্ট

খ. কিছু কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ হয়, সেগুলোকে দ্বিগু কর্মধারয় বলে। যেমন –

তিন ফলের সমাহার = ত্রিফলা, চার রাস্তার মিলন = চৌরাস্তা

গ. কিছু কর্মধারয় সমাসে সমস্যমান পদের মধ্যবর্তী এক বা একাধিক পদ লোপ পায়। এগুলো মধ্যপদলোপী কর্মধারয় নামে পরিচিত। যেমন –

ঘি মাখানো ভাত = ঘিভাত, হাতে পরা হয় যে ঘড়ি = হাতঘড়ি
ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই, বিজয় নির্দেশক পতাকা = বিজয়-পতাকা

ঘ. যার সঙ্গে তুলনা করা হয়, তা উপমান। কিছু কর্মধারয় সমাসে উপমানের সঙ্গে গুণবাচক শব্দের সমাস হয়। এগুলোকে উপমান কর্মধারয় বলে। যেমন –

কাজলের মতো কালো = কাজলকালো
শশের মতো ব্যস্ত = শশব্যস্ত

এই সমাসে পরপদ সাধারণত বিশেষণ হয়।

ঙ. যাকে তুলনা করা হয়, তা উপমেয়। কিছু কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের সমাস হয়। এগুলোকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন –
পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ, আঁখি পদ্মের ন্যায় = পদ্মআঁখি, মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ

এই সমাসে উভয় পদই বিশেষ্য হয়।

চ. কিছু কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের অভেদ কল্পনা করা হয়। এগুলোকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন –
বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু, মন রূপ মাঝি = মনমাঝি।

৩. তৎপুরুষ সমাস

সমস্যমান পদের বিভক্তি ও সন্নিহিত অনুসর্গ লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তার নাম তৎপুরুষ সমাস। এই সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়।

ক. বিভক্তি লোপ পাওয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ:

দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, ছেলেকে ভুলানো = ছেলে-ভুলানো
মামার বাড়ি = মামাবাড়ি, ধানের খেত = ধানখেত, পথের রাজা = রাজপথ
গোলায় ভরা = গোলাভরা, গাছে পাকা = গাছপাকা, অকালে মৃত্যু = অকালমৃত্যু।

খ. সন্নিহিত অনুসর্গ লোপ পাওয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ:

মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা, চিনি দিয়ে পাতা = চিনিপাতা
রান্নার জন্য ঘর = রান্নাঘর, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা
গ্রাম থেকে ছাড়া = গ্রামছাড়া, আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া।

গ. কিছু ক্ষেত্রে বিভক্তি লোপ পায় না, এসব তৎপুরুষ সমাসের নাম অলুক তৎপুরুষ, যেমন –

গরুর গাড়ি = গরুরগাড়ি, তেলে ভাজা = তেলেভাজা।

৪. বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কিছু বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন – বউ ভাত পরিবেশন করে যে অনুষ্ঠানে = বউভাত, লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি ইত্যাদি।

ক. পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য হলে তাকে সমানাধিকার বহুব্রীহি বলে। যেমন – এক গোঁ যার = একগুঁয়ে, লাল পাড় যে শাড়ির = লালপেড়ে।

খ. পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য (কখনো কখনো ক্রিয়াবিশেষ্য) হলে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি হয়। যেমন – গোঁফে খেজুর যার = গোঁফখেজুরে।

গ. যে বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্য থেকে এক বা একাধিক পদ লোপ পায়, তাকে পদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন – চিরুনির মতো দাঁত যার = চিরুনদাঁতি, হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি।

ঘ. পারস্পরিক ক্রিয়ায় কোনো অবস্থা তৈরি হলে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। যেমন – হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি।

ঙ. যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদের পূর্বপদের বিভক্তি অক্ষুণ্ন থাকে, তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। যেমন – গায়ে এসে পড়ে যে = গায়েপড়া, কানে খাটো যে = কানেখাটো।

চ. যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক, তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন – চার ভুজ যে ক্ষেত্রের = চতুর্ভুজ, সে (তিন) তার যে যন্ত্রের = সেতার।

২০২১

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. সমাসের মাধ্যমে গঠিত হয় –
ক. নতুন শব্দ খ. নতুন বাক্য গ. নতুন বর্ণ ঘ. নতুন ধ্বনি

২. সমাসবদ্ধ পদকে বলে –
ক. সমস্তপদ খ. সমস্যমান পদ গ.পূর্বপদ ঘ.পরপদ

৩. ব্যাসবাক্য কাকে ব্যাখ্যা করে?
ক. পূর্বপদ খ. পরপদ গ. সমস্তপদ ঘ. সমস্যমান পদ

৪. 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময়সূচি স্কুল-কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন' – এই বাক্যে সময়সূচি কোন পদ?
ক. সমস্তপদ খ. সমস্যমান পদ গ.পূর্বপদ ঘ. পরপদ

৫. অর্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বাংলা সমাস কত প্রকার?
ক. দুই খ.তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৬. নিচের কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?
ক. নয়-ছয় খ. খাসজমি গ. কনকচাঁপা ঘ. ত্রিফলা

৭. নিচের কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ক. হাতঘড়ি খ. চোখে-মুখে গ. সেতার ঘ. তেলেভাজা

৮. নিচের কোনটির ব্যাসবাক্যে 'যে' যোজক রয়েছে?
ক. বেগুনভাজা খ. ত্রিফলা গ. ঘরজামাই ঘ. হাতঘড়ি

৯. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের উদাহরণ কোনটি?
ক. চৌরাস্তা খ. ঘিভাত গ. চালাকচতুর ঘ. টাকমাথা

১০. উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?
ক. চাঁদমুখ খ. শশব্যস্ত গ. হাতঘড়ি ঘ. বিষাদসিন্ধু

১১. নিচের কোনটিতে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে?
ক. কাজলকালো খ. মনমাঝি গ. তুষারশুভ্র ঘ. চৌরাস্তা

১২. বিভক্তি লোপ পাওয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ কোনটি?
ক. ছেলে-ভুলানো খ. তেলেভাজা গ. গরুরগাড়ি ঘ. হাতে কাটা

১৩. নিচের কোনটি অলুক তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?
ক. গ্রামছাড়া খ. গাছপাকা গ. ধানক্ষেত ঘ. গরুরগাড়ি

১৪. কোন সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কিছু বোঝায়?
ক. দ্বিগু সমাস খ. তৎপুরুষ সমাস গ. বহুব্রীহি সমাস ঘ. কর্মধারয় সমাস

১৫. যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদে পূর্বপদের বিভক্তি অক্ষুণ্ন থাকে তাকে কী বলে?
ক. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি খ. ব্যতিহার বহুব্রীহি গ. পদলোপী বহুব্রীহি ঘ. অলুক বহুব্রীহি

২০২৫

পরিচ্ছেদ ১৩

সন্ধি

পাশাপাশি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। পৃথিবীর বহু ভাষায় পাশাপাশি শব্দের একাধিক ধ্বনি নিয়মিতভাবে সন্ধিবদ্ধ হলেও বাংলা ভাষায় তা বিরল। যেমন 'আমি এখন চা আনতে যাই' বাংলা ভাষার এই বাক্যটিকে সন্ধির সূত্র অনুযায়ী 'আম্যেখন চানতে যাই' বলা যায় না। তবে বাংলা ভাষায় উপসর্গ-প্রত্যয় দিয়ে এবং সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দগঠনের ক্ষেত্রে সন্ধির সূত্র কাজে লাগে।

সন্ধি তিন প্রকার: স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি।

১. স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনকে স্বরসন্ধি বলে।

সূত্র-১: অ/আ+অ/আ = আ। যেমন – উত্তর+অধিকার = উত্তরাধিকার, আশা+অতীত = আশাতীত

সূত্র-২: ই/ঈ+ই/ঈ = ঈ। যেমন – অতি+ইন্দ্রিয় = অতীন্দ্রিয়, পরি+ঈক্ষা = পরীক্ষা

সূত্র-৩: উ/ঊ+উ/ঊ = ঊ। যেমন – মরু+উদ্যান = মরূদ্যান

সূত্র-৪: অ/আ+ই/ঈ = এ। যেমন – শুভ+ইচ্ছা = শুভেচ্ছা

সূত্র-৫: অ/আ+উ/ঊ = ও। যেমন – সূর্য+উদয় = সূর্যোদয়

সূত্র-৬: অ/আ+ঋ = অর্। যেমন – মহা+ঋষি = মহর্ষি

সূত্র-৭: অ/আ+ঋত = আর্। যেমন – শীত+ঋত = শীতার্ত

সূত্র-৮: অ/আ+এ/ঐ = ঐ। যেমন – জন+এক = জনৈক

সূত্র-৯: অ/আ+ও/ঔ = ঔ। যেমন – বন+ওষধি = বনৌষধি

সূত্র-১০: ই/ঈ+অন্য স্বর = য্+স্বর। যেমন – প্রতি+এক = প্রত্যেক

সূত্র-১১: উ/ঊ+অন্য স্বর = ব্+স্বর। যেমন – সু+অল্প = স্বল্প

সূত্র-১২: ঋ+অন্য স্বর = র্+স্বর। পিতৃ+আলয় = পিত্রালয়

সূত্র-১৩: এ+ অন্য স্বর = অয়্+স্বর। যেমন – শে+অন = শয়ন

সূত্র-১৪: ঐ+ অন্য স্বর = আয়্+স্বর। যেমন – নৈ+অক = নায়ক

সূত্র-১৫: ও+ অন্য স্বর = অব্+স্বর। যেমন – গো+আদি = গবাদি

সূত্র-১৬: ঔ+ অন্য স্বর = আব্+স্বর। যেমন – নৌ+ইক = নাবিক।

কিছু স্বরসন্ধি সূত্র অনুসরণ করে না, সেগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি বলে। যেমন – কুল+অটা = কুলটা (সূত্র অনুসারে কুলাটা হওয়ার কথা)। গো+অক্ষ = গবাক্ষ (সূত্র অনুসারে গবক্ষ হওয়ার কথা) ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনসন্ধি

স্বরে-ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে ও ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

ক. স্বর+ব্যঞ্জন

স্বর+ছ = স্বর+চ্ছ। যেমন – কথা+ছলে = কথাচ্ছলে, পরি+ছেদ = পরিচ্ছেদ।
এখানে পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী ছ-এর জায়গায় চ্ছ হয়েছে।

খ. ব্যঞ্জন+স্বর

ক/চ/ট/ত/প+স্বর = গ/জ/ড(ড়)/দ/ব। যেমন – দিক্+অন্ত = দিগন্ত, সৎ+উপায় = সদুপায়

স্বরধ্বনিগুলো ঘোষবৎ হয়। এখানে ঘোষবৎ স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনি (ক, চ, ট, ত, প) পরিবর্তিত হয়ে ঘোষধ্বনিতে (গ, জ, ড, দ, ব) পরিণত হয়।

গ. ব্যঞ্জন+ব্যঞ্জন

ব্যঞ্জনসন্ধিতে একটি ধ্বনির প্রভাবে পার্শ্ববর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন –

চলৎ+চিত্র = চলচ্চিত্র (এখানে চ-এর প্রভাবে ত হয়েছে চ)
বিপদ্+জনক = বিপজ্জনক (এখানে জ-এর প্রভাবে দ হয়েছে জ)
উৎ+লাস = উল্লাস (এখানে ল-এর প্রভাবে ত হয়েছে ল)
বাক্+দান = বাগ্দান (এখানে ঘোষধ্বনি দ-এর প্রভাবে ক হয়েছে গ)
তৎ+মধ্যে = তন্মধ্যে (এখানে নাসিক্য ধ্বনি ম-এর প্রভাবে ত হয়েছে ন)
শম্+কা = শঙ্কা (এখানে কণ্ঠ্যধ্বনি ক-এর প্রভাবে ম হয়েছে ঙ)
সম্+চয় = সঞ্চয় (এখানে তালব্যধ্বনি চ-এর প্রভাবে ম হয়েছে ঞ)
সম্+তাপ = সন্তাপ (এখানে দন্ত্যধ্বনি ত-এর প্রভাবে ম হয়েছে ন)
সম্+মান = সম্মান (এখানে ওষ্ঠ্যধ্বনি ম-এর প্রভাবে ম অপরিবর্তিত রয়েছে)
ষষ্+থ = ষষ্ঠ (এখানে মূর্ধন্যধ্বনি ষ-এর প্রভাবে থ হয়েছে ঠ)।

কিছু ব্যঞ্জনসন্ধি নিয়ম ছাড়া হয়, সেগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন – গো+পদ = গোষ্পদ, এক+দশ = একাদশ, বৃহৎ+পতি = বৃহস্পতি ইত্যাদি।

৩. বিসর্গসন্ধি

বিসর্গসন্ধিতে বিসর্গের কয়েক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়:
১. বিসর্গ বিদ্যমান থাকে: মনঃ+কষ্ট = মনঃকষ্ট, অধঃ+পতন = অধঃপতন, বয়ঃ+সন্ধি = বয়ঃসন্ধি
২. বিসর্গ 'ও' হয়ে যায়: মনঃ+যোগ = মনোযোগ, তিরঃ+ধান = তিরোধান, তপঃ+বন = তপোবন
৩. বিসর্গ 'র্' হয়ে যায়: নিঃ+আকার = নিরাকার, পুনঃ+মিলন = পুনর্মিলন, আশীঃ+বাদ = আশীর্বাদ
৪. বিসর্গ শ্/ষ্/স্ হয়: নিঃ+চয় = নিশ্চয়, দুঃ+কর = দুষ্কর, পুরঃ+কার = পুরস্কার
৫. কিছু কিছু সন্ধিতে পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়: নিঃ+রব = নীরব, নিঃ+রস = নীরস, নিঃ+রোগ = নীরোগ।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. পাশাপাশি ধ্বনির মিলনকে বলে?

ক. একত্রীকরণ খ. সন্নিবেশ গ. সমাস ঘ. সন্ধি

২. অ/আ + অ/আ = আ সূত্রের উদাহরণ কোনটি?

ক. উত্তরাধিকার খ. জনৈক গ. অতীন্দ্রিয় ঘ. নাবিক

৩. স্বরের সঙ্গে স্বরের যে সন্ধি হয় তাকে কোন সন্ধি বলে?

ক. স্বরসন্ধি খ. ব্যঞ্জনসন্ধি গ. বিসর্গসন্ধি ঘ. স্বর-ব্যঞ্জন সন্ধি

৪. গো + আদি = গবাদি – কোন সূত্রে সিদ্ধ?

ক. ও + অন্য স্বর = অব্ + স্বর খ. এ + অন্য স্বর= অয়্ + স্বর

গ. ঋ + অন্য স্বর = র্ + স্বর ঘ. উ/ঊ + অন্য স্বর = ব্ + স্বর

৫. ব্যঞ্জনসন্ধি কতভাবে হতে পারে?

ক. এক খ. দুই গ. তিন ঘ. চার

৬. 'পরিচ্ছেদ' কোন নিয়মে ব্যঞ্জনসন্ধি?

ক. স্বর + স্বর খ. স্বর + ব্যঞ্জন গ. ব্যঞ্জন + ব্যঞ্জন ঘ. ব্যঞ্জন + স্বর

৭. নিচের কোনটিতে জ-এর প্রভাবে ত হয়েছে জ?

ক. সন্ধ্যা খ. উজ্জ্বল গ. বিপদমূলক ঘ. চলচ্চিত্র

৮. নিচের কোনটি বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ?

ক. ষষ্ঠ খ. সম্মান গ. স্বচ্ছ ঘ. মনোযোগ

৯. নিচের কোনটিতে বিসর্গ 'ও' হয়ে গেছে?

ক. নীরোগ খ. আরোগ্য গ. তিরোধান ঘ. ভৌগোলিক

১০. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি কোনটি?

ক. নায়ক খ. পিত্রালয় গ. শুভেচ্ছা ঘ. একাদশ

পরিচ্ছেদ ১৪

শব্দদ্বিত্ব

অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় কোনো শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে শব্দদ্বিত্ব বলে। শব্দদ্বিত্ব তিন ধরনের: অনুকার দ্বিত্ব, ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব ও পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব।

১. অনুকার দ্বিত্ব

পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে অনুকার দ্বিত্ব বলে। এতে প্রথম শব্দটি অর্থপূর্ণ হলেও প্রায় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শব্দটি অর্থহীন হয় এবং প্রথম শব্দের অনুকরণে তৈরি হয়। এই অনুকরণ প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে ট, ফ, ব, ম, শ প্রভৃতি ধ্বনি যুক্ত থাকতে দেখা যায়। তাতে শব্দকে খানিকটা অনির্দিষ্ট, সাধারণ বা গুরুত্বহীন করা হয়। প্রকাশ পায় 'এই রকম একটা' ভাব। যেমন –

> অঙ্ক-টঙ্ক, আম-টাম, কেক-টেক, ঘর-টর, গরু-টরু, ছাগল-টাগল, ঝাল-টাল, হেন-তেন, লুচিফুচি, টাট্টু-ফাট্টু, আগড়ুম-বাগড়ুম, চাকর-বাকর, এলোমেলো, ঝিকিমিকি, কচর-মচর, ঝিলমিল, শেষ-মেষ, অল্পসল্প, বুদ্ধিশুদ্ধি, গুটিশুটি, মোটাসোটা, নরম-সরম, ব্যাপার-স্যাপার, বুঝে-সুঝে।

অনুকার দ্বিত্বে অনেক সময়ে স্বরের পরিবর্তন ঘটে, যেমন –

> আড়াআড়ি, খোঁজাখুঁজি, ঘোরাঘুরি, চুপচাপ, ঠেকাঠেকি, তাড়াতাড়ি, দলাদলি, দামাদামি, পাকাপাকি, বাড়াবাড়ি, মোটামুটি, টুকরো-টাকরা, ধারধোর, জোগাড়-জাগাড়।

২. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব

কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। যেমন – ঠন একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। কোনো ধাতব পদার্থের সঙ্গে অন্য কোনো ধাতব পদার্থের সংঘর্ষে এই ধরনের ধ্বনি তৈরি হয়। ঠন শব্দটি পরপর দুই বার বা কখনো ততোধিক বার ব্যবহৃত হলে ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব সৃষ্টি হয়। যেমন – সাঁ করে তির ছুটে যায়, সাঁ সাঁ করে তিরগুলো ছুটে যাচ্ছে, সাঁ সাঁ সাঁ করে অসংখ্য তির চারদিকে ছুটে গেল। অনেক সময়ে কল্পিত ধ্বনির ভিত্তিতেও ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হয়। যেমন – ফোড়া টনটন করে, গা ছমছম করে। কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ:

> কুট কুট, কোঁত কোঁত, কুটুস-কুটুস, খক খক, খুটুর-খুটুর, টুং টুং, ঠুক ঠুক, ধুপ ধুপ, দুম দুম, ঢং ঢং, চকচক, জ্বলজ্বল, ঝমঝম, টসটস, থকথকে, ফুসুর ফুসুর, ভটভট, শোঁ শোঁ, হিস হিস।

কিছু ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন –

> খপাখপ, গবাগব, ঝটাঝট, ফটাফট, দমাদম, পটাপট।

৩. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব

পুনরায় আবৃত্ত হলে তাকে পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বলে। পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিহীন বা বিভক্তিযুক্ত হতে পারে। যেমন – জ্বর জ্বর, পর পর, কবি কবি, হাতে হাতে, কথায় কথায়, জোরে জোরে ইত্যাদি।

বিভক্তিহীন পুনরাবৃত্তঃ ভালো ভালো (কথা), কত কত (লোক), হঠাৎ হঠাৎ (ব্যথা), ঘুম ঘুম (চোখ), উড়ু উড়ু (মন), গরম গরম (জিলাপি), হায় হায় (করা)।

বিভক্তিযুক্ত পুনরাবৃত্তঃ কথায় কথায় (বাড়া), মজার মজার (কথা), ঝাঁকে ঝাঁকে (চলা), চোখে চোখে (রাখা), মনে মনে (হাসা), সুরে সুরে (বলা), পথে পথে (হাঁটা)।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে দুইবার ব্যবহৃত হওয়া শব্দকে বলে –
ক. শব্দ পরিবর্তন খ. শব্দদ্বিত্ব গ. শব্দ গঠন ঘ. শব্দ প্রয়োগ

২. শব্দদ্বিত্ব কত প্রকার?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৩. পর পর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে কী বলে?
ক. অনুকার দ্বিত্ব খ. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব গ. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব ঘ. পদদ্বিত্ব

৪. কোন ধরনের দ্বিত্বে বিভক্তি যুক্ত হতে দেখা যায়?
ক. অনুকার দ্বিত্বে খ. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্বে গ. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বে ঘ. ক ও খ উভয়ই

৫. কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ?
ক. চুপচাপ খ. সুরে সুরে গ. চোখে চোখে ঘ. ঢং ঢং

৬. বিভক্তিযুক্ত শব্দদ্বিত্ব কোনটি?
ক. ঝাঁকে ঝাঁকে খ. হায় হায় গ. ঘুম ঘুম ঘ. কত কত

৭. নিচের কোন ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে?
ক. খপাখপ খ. থকথকে গ. ভট ভট ঘ. মজায় মজায়

পরিচ্ছেদ ১৫

নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ

বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য শব্দ ও কিছু বিশেষণ শব্দ রয়েছে যা নরবাচক অথবা নারীবাচক বলে ধরা হয়। আবার এমন কিছু বিশেষ্য-বিশেষণ শব্দ রয়েছে যা দিয়ে নর বা নারী উভয়কে বোঝায়। বিশেষ্য ও বিশেষণের এই নর-নারীভেদের নাম লিঙ্গ। ব্যাকরণে শব্দের নর ও নারীবাচকতাকে সংক্ষেপে 'পুং' ও 'স্ত্রী' দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নরবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ, যথা: পিতা, পুত্র ইত্যাদি। নারীবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, যথা: মাতা, কন্যা ইত্যাদি। নরবাচক ও নারীবাচক উভয়কে বোঝায় এমন সজীব বিশেষ্য শব্দকে উভলিঙ্গ বলে, যথা: সন্তান, মন্ত্রী ইত্যাদি। আবার নরবাচক বা নারীবাচক কোনোটাকেই বোঝায় না এমন অজীব বিশেষ্য শব্দকে ক্লীবলিঙ্গ বলে, যথা: ঘর, গাড়ি, টেবিল ইত্যাদি।

সাধারণ নারীবাচক শব্দ দুই ধরনের: পত্নীবাচক এবং অপত্নীবাচক। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বোঝালে পত্নীবাচক হয়। যেমন – পিতা-মাতা, চাচা-চাচি, দাদা-দাদি, জেলে-জেলেনি, গুরু-গুরুপত্নী ইত্যাদি। অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না বোঝালে অপত্নীবাচক হয়। যেমন – খোকা-খুকি, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, নেতা-নেত্রী, পাগল-পাগলি।

কিছু শব্দ রয়েছে যা নিত্য নরবাচক ও নিত্য নারীবাচক। নিত্য নরবাচকের উদাহরণ: কৃতদার, অকৃতদার। নিত্য নারীবাচকের উদাহরণ: সতীন, বিধবা।

নরবাচক শব্দ থেকে নারীবাচক শব্দগঠন

প্রত্যয় যোগে

নরবাচক শব্দকে নারীবাচক শব্দে পরিবর্তন করতে সাধারণত কিছু প্রত্যয় যোগ করতে হয়। এ রকম কয়েকটি প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখানো হলো:

-আ প্রত্যয়: বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রিয়-প্রিয়া, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা।
-ই প্রত্যয়: দাদা-দাদি, জেঠা-জেঠি, পাগল-পাগলি।
-ইনি প্রত্যয়: কাঙাল-কাঙালিনি, বাঘ-বাঘিনি।
-ইনী প্রত্যয়: বিজয়ী-বিজয়িনী, যোগী-যোগিনী, তেজস্বী-তেজস্বিনী।
-ঈ প্রত্যয়: কিশোর-কিশোরী, নর-নারী, সুন্দর-সুন্দরী।
-নি প্রত্যয়: জেলে-জেলেনি, বেদে-বেদেনি, ধোপা-ধোপানি।
-বতী প্রত্যয়: গুণবান-গুণবতী, পুণ্যবান-পুণ্যবতী।
-মতী প্রত্যয়: বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, শ্রীমান-শ্রীমতী।

এছাড়া '-অক' প্রত্যয় দিয়ে গঠিত নরবাচক শব্দকে নারীবাচক করার সময়ে 'অক'-এর জায়গায় '-ইকা' হয়। যেমন – পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গায়ক-গায়িকা।

নারী-নির্দেশক শব্দ যোগে

কিছু ক্ষেত্রে নারী-নির্দেশক শব্দ যোগ করে নারীবাচক শব্দ তৈরি করা হয়।

যেমন – লোক-স্ত্রীলোক, শ্রমিক-নারী শ্রমিক, ছেলে-ছেলে বউ।

কিছু ক্ষেত্রে নর-নির্দেশক শব্দের বদলে নারী-নির্দেশক শব্দ যোগ করে নারীবাচক শব্দ তৈরি করা হয়।

যেমন – মদ্দা বিড়াল - মাদি বিড়াল, ভাইপো - ভাইঝি।

স্বতন্ত্র শব্দে

কিছু নারীবাচক শব্দের সঙ্গে নরবাচক শব্দের গঠনগত মিল থাকে না।
যেমন – ভাই-বোন, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, বর-কনে, বাদশা-বেগম।

বাংলা ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাকে নারীবাচক করা হয় না। যেমন –
নার্গিস আখতার একজন সহকারী শিক্ষক।
নমিতা রায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বিশেষ্য ও বিশেষণের নারী ও নরভেদের নাম কী?
ক. বচন খ. নির্দেশক গ. বলক ঘ. লিঙ্গ

২. নিচের কোন শব্দটি উভলিঙ্গ প্রকাশক?
ক. সন্তান খ. ভেড়ি গ. ছাত্র ঘ. ঘর

৩. 'ক্লীব লিঙ্গ' শব্দ কোনটি?
ক. গাড়ি খ. মন্ত্রী গ. মানুষ ঘ. পাখি

৪. কোন শব্দটি অপত্নীবাচক?
ক. মাতা খ. দাদি গ. চাচি ঘ. শিক্ষিকা

৫. নিচের কোনটি নিত্য নরবাচক শব্দ?
ক. কৃতদার খ. ছেলে গ. নেতা ঘ. বাবা

৬. নিচের কোনটি নিত্য নারীবাচক শব্দ?
ক. শিক্ষিকা খ. জেলেনি গ. মেয়ে ঘ. সতীন

৭. '-অক' প্রত্যয় দিয়ে গঠিত নরবাচক শব্দকে নারীবাচক করার সময়ে '-অক' এর জায়গায় কী হয়?
ক. -একা খ. -ওকা গ. -ইকা ঘ. -আকা

৮. নিচের কোন নারীবাচক শব্দের সঙ্গে নরবাচক শব্দের গঠনগত মিল নেই?
ক. বেগম খ. ভাইঝি গ. ছেলে বউ ঘ. গায়িকা

পরিচ্ছেদ ১৬

সংখ্যাবাচক শব্দ

যেসব শব্দ দিয়ে সংখ্যা বোঝায়, সেগুলোকে সংখ্যাবাচক শব্দ বা সংখ্যাশব্দ বলে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় প্রভৃতি সংখ্যাশব্দ – এগুলো এখানে কথায় লেখা হয়েছে। আবার বিশেষ কিছু বর্ণ বা সংকেত দিয়ে এগুলো প্রকাশ করা যায়, যথা: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ প্রভৃতি সংখ্যাশব্দ – এগুলো এখানে অঙ্কে বা সংখ্যাবর্ণে লেখা হয়েছে। দূরত্ব, দৈর্ঘ্য, আয়তন, খণ্ড, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরিমাপের ক্ষেত্রে সংখ্যাশব্দের ব্যাপক ব্যবহার হয়।

সংখ্যাশব্দ দুই রকমের: ক্রমবাচক ও পূরণবাচক। ক্রমবাচক, যথা: এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। পূরণবাচক, যথা: প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম।

১. ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ

একের পর এক যে সংখ্যাগুলো আসে, সেগুলো ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ। যেমন – ১ (এক), ২ (দুই), ৩ (তিন), ৪ (চার), ৫ (পাঁচ), ৬ (ছয়), ৭ (সাত), ৮ (আট), ৯ (নয়), ১০ (দশ), ১১ (এগারো), ১২ (বারো), ১৩ (তেরো), ১৪ (চোদ্দ), ১৫ (পনেরো), ১৬ (ষোলো), ১৭ (সতেরো), ১৮ (আঠারো), ১৯ (উনিশ), ২০ (বিশ) ইত্যাদি।

ক্রমবাচক সংখ্যাবর্ণের সুবিধা হলো এতে ১ থেকে ৯ এবং ০ দিয়ে অসীম সংখ্যার পূর্ব পর্যন্ত ক্রম তৈরি করা যায়।

ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দের এক বা একাধিক প্রতিশব্দ রয়েছে। এগুলো কখনো স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয়, কখনো সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'দুই' সংখ্যাশব্দের প্রতিশব্দ 'দ্বি', 'দু', এবং 'দো'। 'তিন' সংখ্যাশব্দের প্রতিশব্দ 'ত্রি' এবং 'তে'।

২. পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ

পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ দিয়ে কোনো সংখ্যার ক্রমিক অবস্থান ও পরিমাণকে বোঝায়। যেমন 'এক' সংখ্যার ক্রমিক অবস্থান 'প্রথম', 'প্রথমা', 'পহেলা' ইত্যাদি। এগুলোকে পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ বলে।

পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ তিন ধরনের হয়: ১. সাধারণ পূরণবাচক, ২. তারিখ পূরণবাচক ও ৩. ভগ্নাংশ পূরণবাচক।

সাধারণ পূরণবাচক

ক্রমবাচক সংখ্যার পর্যায় বা অবস্থানকে নির্দেশ করতে সাধারণ পূরণবাচক হয়ে থাকে। যেমন – প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ বা এগারোতম ইত্যাদি। সাধারণ পূরণবাচক সংক্ষিপ্ত রূপেও লেখা যায়। যেমন – ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম ইত্যাদি।

১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যার পূর্ণ পূরণবাচক ও সংক্ষিপ্ত পূরণবাচক দুই রকম: একাদশ (১১শ) ও এগারোতম (১১তম), দ্বাদশ (১২শ) ও বারোতম (১২তম), ত্রয়োদশ (১৩শ) ও তেরোতম (১৩তম), চতুর্দশ (১৪শ) ও চোদ্দতম (১৪তম), পঞ্চদশ (১৫শ) ও পনেরোতম (১৫তম), ষোড়শ (১৬শ) ও ষোলোতম (১৬তম), সপ্তদশ (১৭শ) ও সতেরোতম (১৭তম), অষ্টাদশ (১৮শ) ও আঠারোতম (১৮তম)।

১৯ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার সংক্ষিপ্ত পূরণবাচকে শুধু 'তম' প্রত্যয় যোগ করা হয়। যথা: উনিশতম বা ঊনবিংশতিতম (১৯তম), বিশতম বা বিংশতিতম (২০তম), একুশতম বা একবিংশতিতম (২১তম), আটাশতম বা অষ্টাবিংশতিতম (২৮তম), উনপঞ্চাশতম বা ঊনপঞ্চাশত্তম (৪৯তম), আশিতম বা অশীতিতম (৮০তম), নব্বইতম বা নবতিতম (৯০তম), নিরানব্বইতম বা নবনবতিতম (৯৯তম) ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় সাধারণ পূরণবাচকের নারীবাচক রূপের ব্যবহার আছে। যেমন – প্রথমা (১মা), দ্বিতীয়া (২য়া), তৃতীয়া (৩য়া), চতুর্থী (৪র্থী), পঞ্চমী (৫মী), ষষ্ঠী (৬ষ্ঠী), সপ্তমী (৭মী), অষ্টমী (৮মী), নবমী (৯মী), দশমী (১০মী), একাদশী (১১শী), দ্বাদশী (১২শী), ত্রয়োদশী (১৩শী), চতুর্দশী (১৪শী), পঞ্চদশী (১৫শী), ষোড়শী (১৬শী), সপ্তদশী (১৭শী), অষ্টাদশী (১৮শী) ইত্যাদি।

তারিখ পূরণবাচক

বাংলা ভাষায় তারিখ নির্দেশ করার জন্য সংখ্যাশব্দের পূরণবাচকে নির্দিষ্ট কিছু প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা: পহেলা বা পয়লা (১লা), দোসরা (২রা), তেসরা (৩রা), চৌঠা (৪ঠা), পাঁচই (৫ই), ছয়ই (৬ই), সাতই (৭ই), আটই (৮ই), নয়ই (৯ই), দশই (১০ই), এগারোই (১১ই), বারোই (১২ই), তেরোই (১৩ই), চোদ্দই (১৪ই), পনেরোই (১৫ই), ষোলোই (১৬ই), সতেরোই (১৭ই), আঠারোই (১৮ই), উনিশে (১৯শে), বিশে (২০শে), একুশে (২১শে), বাইশে (২২শে), তেইশে (২৩শে), চব্বিশে (২৪শে), পঁচিশে (২৫শে), ছাব্বিশে (২৬শে), সাতাশে (২৭শে), আটাশে (২৮শে), উনত্রিশে (২৯শে), ত্রিশে (৩০শে), একত্রিশে (৩১শে)।

ভগ্নাংশ পূরণবাচক

কখনো পূর্ণসংখ্যার থেকে খানিকটা কম বা খানিকটা বেশি বোঝাতে ভগ্নাংশ পূরণবাচক হয়। যেমন – আধ, সাড়ে, পোয়া, সোয়া, দেড়, আড়াই, তেহাই ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. নিচের কোনটি সংখ্যাবর্ণ?
ক. পাঁচ খ. ৩ গ. আড়াই ঘ. ৪ঠা

২. নিচের কোনটি সংখ্যাশব্দ?
ক. বারো খ. ২৩৩ গ. দুজন ঘ. একাকী

৩. একের পর এক যে সংখ্যাগুলো আসে সেগুলোকে কী বলে?
ক. ক্রমবাচক খ. পূরণবাচক গ. সংখ্যাবাচক ঘ. তারিখবাচক

৪. নিচের কোনটি পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ?
ক. পহেলা খ. সাত গ. সতেরো ঘ. দ্বি

৫. নিচের কোনটি পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ নয়?
ক. উনিশে খ. আড়াই গ. আশি ঘ. তেহাই

৬. সাধারণ পূরণবাচকের নারীবাচক রূপের ব্যবহার আছে কোনটিতে?
ক. দশমী খ. ষোড়শ গ. আটাশে ঘ. ষোলই

৭. পূর্ণসংখ্যার থেকে খানিকটা কম বা বেশি বোঝালে কী ধরনের পূরণবাচক হয়?
ক. গুণিতক পূরণবাচক খ. ভগ্নাংশ পূরণবাচক
গ. তারিখ পূরণবাচক ঘ. সাধারণ পূরণবাচক

পরিচ্ছেদ ১৭

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা শব্দভাণ্ডারকে বিভিন্ন বিবেচনায় ভাগ করা যায়ঃ ক. উৎস বিবেচনা, খ. গঠন বিবেচনা, গ. পদ বিবেচনা।

ক. উৎস বিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ

উৎস বিবেচনায় বাংলা শব্দভান্ডারকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়ঃ তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি। এর মধ্যে তৎসম ও তদ্ভব শ্রেণিকে নিজস্ব উৎসের এবং দেশি ও বিদেশি শ্রেণিকে আগন্তুক উৎসের শব্দ হিসেবে গণ্য করা হয়।

১. তৎসম শব্দঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিবর্তিত যেসব বাংলা শব্দের লিখিত চেহারা সংস্কৃত ভাষার শব্দের অনুরূপ সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে। যথাঃ পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ, বৃক্ষ। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করে গঠিত পারিভাষিক শব্দকেও তৎসম শব্দ বলা হয়। যথাঃ অধ্যাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী, মহাপরিচালক, সচিবালয় ইত্যাদি।

২. তদ্ভব শব্দঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিবর্তিত যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় একেবারেই স্বতন্ত্র, সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলা হয়। উদাহরণঃ হাত, পা, কান, নাক, জিভ, দাঁত; হাতি, ঘোড়া, সাপ, পাখি, কুমির ইত্যাদি।

৩. দেশি শব্দঃ বাংলা অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা থেকে কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে, এগুলোকে দেশি শব্দ বলা হয়। উদাহরণঃ কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, ডাব, টোপর, ঢেঁকি ইত্যাদি।

৪. বিদেশি শব্দঃ ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের আন্তঃসম্পর্ক তৈরি হওয়ায় সেসব দেশের বহু শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, এই শব্দগুলোকে বিদেশি শব্দ বলে। এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে রয়েছে আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, তুর্কি, হিন্দি ইত্যাদি। উদাহরণ –

আরবিঃ আল্লাহ, হারাম, হালাল, হজ, জাকাত, ঈদ, উকিল, কলম, নগদ, বাকি, আদালত, তারিখ, হালুয়া ইত্যাদি।

ফারসিঃ খোদা, দোজখ, নামাজ, রোজা, চশমা, তোশক, দোকান, কারখানা, আমদানি, জানোয়ার ইত্যাদি।

ইংরেজিঃ চেয়ার, টেবিল, কলেজ, স্কুল, পেনসিল, ব্যাগ, ফুটবল, ক্রিকেট, হাসপাতাল, বাক্স, বোতল ইত্যাদি।

পর্তুগিজঃ আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাদরি, বালতি ইত্যাদি।

ফরাসিঃ কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ, আঁতেল, কার্তুজ ইত্যাদি।

ওলন্দাজঃ হরতন, ইস্কাপন, রুইতন, টেক্কা, তুরুপ ইত্যাদি।

তুর্কিঃ চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।

হিন্দিঃ পানি, ধোলাই, লাগাতার, সমঝোতা।

২০২৫

খ. গঠন বিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ

গঠন বিবেচনায় বাংলা শব্দকে মৌলিক এবং সাধিত – এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. মৌলিক শব্দ: যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করলে অর্থপূর্ণ কোনো অংশ থাকে না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন – গাছ, পাখি, ফুল, হাত, গোলাপ ইত্যাদি।

২. সাধিত শব্দ: যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে এক বা একাধিক অর্থপূর্ণ অংশ থাকে, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করে অথবা সমাস প্রক্রিয়ায় সাধিত শব্দ তৈরি হয়। যেমন – পরিচালক, গরমিল, সম্পাদকীয়, সংসদ সদস্য, নীলাকাশ ইত্যাদি। শব্দের দ্বিত্ব করেও সাধিত শব্দ হয়ে থাকে। যেমন – ফিসফিস, ধুমাধুম ইত্যাদি।

গ. পদ বিবেচনায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ

শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তার নাম হয় পদ। বাক্যের অন্তর্গত এসব শব্দ বা পদকে মোট আটটি শ্রেণিতে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়: ১. বিশেষ্য, ২. সর্বনাম, ৩. বিশেষণ, ৪. ক্রিয়া, ৫. ক্রিয়াবিশেষণ, ৬. অনুসর্গ, ৭. যোজক ও ৮. আবেগ।

বাক্যে প্রয়োগের উপরে শব্দশ্রেণির এই আট রকম বিভাজন চূড়ান্ত হয়ে থাকে। যেমন, যখন বলা হয়: 'লাল থেকে নীল ভালো, তখন 'লাল' এটি বিশেষ্য পদ। কিন্তু যখন বলা হয়: আমি একটি লাল ফুল তুলেছি – তখন 'লাল' বিশেষণ পদ।

পদ বিবেচনায় শব্দের এসব শ্রেণিভেদ নিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করা হলো।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. উৎস বিবেচনায় বাংলা শব্দভান্ডার কত প্রকার?
ক. তিন খ. চার গ. পাঁচ ঘ. ছয়

২. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?
ক. গ্রহ খ. কুড়ি গ. কলম ঘ. পাখি

৩. কোন শ্রেণির বাংলা শব্দের লিখিত চেহারা সংস্কৃতের অনুরূপ?
ক. তৎসম খ. তদ্ভব গ. দেশি ঘ. বিদেশি

৪. গঠন বিবেচনায় শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা –
ক. প্রত্যয় ও বিভক্তি খ. ধ্বনি ও বর্ণ গ. মৌলিক ও সাধিত ঘ. তৎসম ও তদ্ভব

৫. পদ বিবেচনায় শব্দ কত প্রকার?
ক. পাঁচ খ. সাত গ. আট ঘ. দশ

৬. কোনটি পদের নাম নয়?
ক. আবেগ খ. অনুসর্গ গ. যোজক ঘ. পদাণু

পরিচ্ছেদ ১৮

বিশেষ্য

যেসব শব্দ দিয়ে ব্যক্তি, প্রাণী, স্থান, বস্তু, ধারণা ও গুণের নাম বোঝায়, সেগুলোকে বিশেষ্য বলে। যেমন – নজরুল, বাঘ, ঢাকা, ইট, ভোজন, সততা ইত্যাদি।

বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ

বিশেষ্য সাধারণত ছয় প্রকার: ১. নাম-বিশেষ্য, ২. জাতি-বিশেষ্য, ৩. বস্তু-বিশেষ্য, ৪. সমষ্টি-বিশেষ্য, ৫. গুণ-বিশেষ্য এবং ৬. ক্রিয়া-বিশেষ্য।

১. নাম-বিশেষ্য: ব্যক্তি, স্থান, দেশ, কাল, সৃষ্টি প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট নামকে নাম-বিশেষ্য বলা হয়। যেমন –

ব্যক্তিনাম: হাবিব, সজল, লতা, শম্পা।
স্থাননাম: ঢাকা, বাংলাদেশ, হিমালয়, পদ্মা।
কালনাম: সোমবার, বৈশাখ, জানুয়ারি, রমজান।
সৃষ্টিনাম: গীতাঞ্জলি, সঞ্চিতা, ইত্তেফাক, অপরাজেয় বাংলা।

২. জাতি-বিশেষ্য: জাতি-বিশেষ্য সাধারণ-বিশেষ্য নামেও পরিচিত। এ ধরনের বিশেষ্য নির্দিষ্ট কোনো নামকে না বুঝিয়ে প্রাণী ও অপ্রাণীর সাধারণ নামকে বোঝায়। যেমন – মানুষ, গরু, ছাগল, ফুল, ফল, নদী, সাগর, পর্বত ইত্যাদি।

৩. বস্তু-বিশেষ্য: কোনো দ্রব্য বা বস্তুর নামকে বস্তু-বিশেষ্য বলে। যেমন – ইট, লবণ, আকাশ, টেবিল, বই ইত্যাদি।

৪. সমষ্টি-বিশেষ্য: এ ধরনের বিশেষ্য দিয়ে ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন – জনতা, পরিবার, ঝাঁক, বাহিনী, মিছিল ইত্যাদি।

৫. গুণ-বিশেষ্য: গুণগত অবস্থা ও ধারণার নামকে গুণ-বিশেষ্য বলে। যেমন – সরলতা, দয়া, আনন্দ, গুরুত্ব, দীনতা, ধৈর্য ইত্যাদি।

৬. ক্রিয়া-বিশেষ্য: যে বিশেষ্য দিয়ে কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায়, তাকে ক্রিয়া-বিশেষ্য বলে। যেমন – পঠন, ভোজন, শয়ন, করা, করানো, পাঠানো, নেওয়া ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. যে সব শব্দ দিয়ে কোনো কিছুর নাম বোঝায় তাকে কী বলে?

ক. বিশেষ্য খ. অনুসর্গ গ. যোজক ঘ. সর্বনাম

২. যে বিশেষ্য দিয়ে কোনো কাজের নাম বোঝায়, তাকে বলে –

ক. বস্তু-বিশেষ্য খ. সমষ্টি-বিশেষ্য

গ. গুণ-বিশেষ্য ঘ. ক্রিয়া-বিশেষ্য

৩. 'পদ্মা' কোন জাতীয় নাম-বিশেষ্য?

ক. সৃষ্টিনাম খ. কালনাম গ. স্থাননাম ঘ. ব্যক্তিনাম

৪. জাতি-বিশেষ্যের উদাহরণ কোনটি?

ক. আকাশ খ. নদী গ. পদ্মা ঘ. হিমালয়

৫. নিচের কোনগুলি সমষ্টি-বিশেষ্যের উদাহরণ?

ক. পরিবার ও মিছিল খ. নদী ও সাগর গ. সঞ্চিতা ও ইত্তেফাক ঘ. আকাশ ও বই

৬. গুণ-বিশেষ্য কোনটি?

ক. সাগর খ. সততা গ. ভোজন ঘ. বাহিনী

৭. নিচের কোনটি কালনাম শ্রেণির নাম-বিশেষ্য?

ক. বৈশাখ খ. হিমালয় গ. আকাশ ঘ. পবন

পরিচ্ছেদ ১৯

সর্বনাম

বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দকে সর্বনাম শব্দ বলে। বাক্যের মধ্যে বিশেষ্য যে ভূমিকা পালন করে, সর্বনাম অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। যেমন – "শিমুল মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করত। তাই সে পরীক্ষায় ভালো করেছে।" দ্বিতীয় বাক্যের 'সে' প্রথম বাক্যের 'শিমুল'-এর পরিবর্তে বসেছে। বিশেষ্য শব্দের মতো সর্বনাম শব্দের সঙ্গেও বিভক্তি, নির্দেশক, বচন প্রভৃতি যুক্ত হয়।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ

সর্বনামকে নিচের নয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. ব্যক্তিবাচক সর্বনাম: ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ব্যক্তিনামের পরিবর্তে বসে। এই সর্বনাম তিন ধরনের:

বক্তা পক্ষের সর্বনাম: আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি।
শ্রোতা পক্ষের সর্বনাম: তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, আপনি, আপনারা, তোমাকে, তোকে, আপনাকে ইত্যাদি।
অন্য পক্ষের সর্বনাম: সে, তারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ওর, ওদের ইত্যাদি।
শ্রোতাপক্ষ ও অন্যপক্ষের সর্বনামকে মর্যাদা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়: সাধারণ সর্বনাম (তুমি, সে), মানী সর্বনাম (আপনি, তিনি, ইনি, উনি) ও ঘনিষ্ঠ সর্বনাম (তুই, এ, ও)।

২. আত্মবাচক সর্বনাম: কর্তা নিজেই কোনো কাজ করেছে, এ ভাবটি জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য এ ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। যেমন – নিজে (সে নিজে অঙ্কটা করছে), স্বয়ং ইত্যাদি।

৩. নির্দেশক সর্বনাম: যে সর্বনাম নৈকট্য বা দূরত্ব নির্দেশ করে, তাকে নির্দেশক সর্বনাম বলে। যেমন – নিকট নির্দেশক: এ, এই, এরা, ইনি; দূর নির্দেশক: ও, ওই, ওরা, উনি।

৪. অনির্দিষ্ট সর্বনাম: অনির্দিষ্ট বা পরিচয়হীন কিছু বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাকে অনির্দিষ্ট সর্বনাম বলে। যেমন – কেউ, কোথাও, কিছু, একজন (একজন এসে খবরটা দেয়) ইত্যাদি।

৫. প্রশ্নবাচক সর্বনাম: প্রশ্ন তৈরির জন্যে প্রশ্নবাচক সর্বনাম প্রয়োগ করা হয়। যেমন – কে, কারা, কাকে, কার, কী (কী দিয়ে ভাত খায়?) ইত্যাদি।

৬. সাপেক্ষ সর্বনাম: পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। যেমন – যারা-তারা, যে-সে, যেমন-তেমন (যেমন কর্ম তেমন ফল) ইত্যাদি।

৭. পারস্পরিক সর্বনাম: দুই পক্ষের সহযোগিতা বা নির্ভরতা বোঝাতে পারস্পরিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন – পরস্পর, নিজেরা নিজেরা (যাবতীয় দ্বন্দ্ব নিজেরা নিজেরা মিটমাট করে) ইত্যাদি।

৮. সকলবাচক সর্বনাম: ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের সমষ্টি বোঝাতে সকলবাচক সর্বনাম হয়। যেমন – সবাই, সকলে, সকলকে, সবার, সমস্ত, সব ইত্যাদি।

৯. অন্যবাচক সর্বনাম: নিজ ভিন্ন অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বোঝাতে অন্যবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন – অন্য, অপর, পর, অমুক ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দকে কী শব্দ বলে?
ক. সর্বনাম খ. বিশেষণ গ. অনুসর্গ ঘ. ক্রিয়া

২. সর্বনামকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. পাঁচ খ. ছয় গ. নয় ঘ. এগারো

৩. নিচের কোনটি ব্যক্তিবাচক সর্বনাম?
ক. একজন খ. উনি গ. স্বয়ং ঘ. আমি

৪. কর্তা নিজেই কাজটি করেছেন, তা বোঝালে কোন সর্বনাম হয়?
ক. ব্যক্তিবাচক খ. আত্মবাচক গ. নির্দেশক ঘ. অনির্দিষ্ট

৫. সাপেক্ষ সর্বনামের উদাহরণ কোনটি?
ক. অন্য খ. এ গ. যে–সে ঘ. পরস্পর

৬. নিজ ভিন্ন অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বোঝাতে কোন সর্বনাম ব্যবহৃত হয়?
ক. অনির্দিষ্ট খ. আত্মবাচক গ. অন্যবাচক ঘ. সফলবাচক

৭. কোন সর্বনাম নৈকট্য বা দূরত্ব নির্দেশ করে?
ক. সাপেক্ষ সর্বনাম খ. অনির্দিষ্ট সর্বনাম গ. আত্মবাচক সর্বনাম ঘ. নির্দেশক সর্বনাম

পরিচ্ছেদ ২০

বিশেষণ

যে শব্দ দিয়ে সাধারণত বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বিশেষণ বলে। যেমন – সুন্দর ফুল, বাজে কথা, পঞ্চাশ টাকা, হাজার সমস্যা, তাজা মাছ।

বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ

কোন কোন শ্রেণির শব্দকে বিশেষিত করে, সেই অনুযায়ী বিশেষণকে আলাদা করা যায়। বিশেষণ শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে, সেই বিবেচনায়ও বিশেষণকে ভাগ করা সম্ভব। এছাড়া বাক্যের মধ্যে বিশেষণটির অবস্থান কোথায় তা দিয়েও বিশেষণকে চিহ্নিত করা যায়। এসব বিবেচনায় বিশেষণকে নানা নামে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

১. বর্ণবাচক: যে বিশেষণ দিয়ে রং নির্দেশ করা হয়, তাকে বর্ণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, লাল ফিতা – এখানে 'নীল', 'সবুজ' বা 'লাল' হলো বর্ণবাচক বিশেষণ।

২. গুণবাচক: যে বিশেষণ দিয়ে গুণ বা বৈশিষ্ট্য বোঝায়, তাকে গুণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – চালাক ছেলে, ঠান্ডা পানি – এখানে 'চালাক' ও 'ঠান্ডা' হলো গুণবাচক বিশেষণ।

৩. অবস্থাবাচক: যে বিশেষণ দিয়ে অবস্থা বোঝায়, তাকে অবস্থাবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – চলন্ত ট্রেন, তরল পদার্থ – এখানে 'চলন্ত' ও 'তরল' অবস্থাবাচক বিশেষণ।

৪. ক্রমবাচক: যে বিশেষণ দিয়ে ক্রমসংখ্যা বোঝায়, তাকে ক্রমবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – এক টাকা, আট দিন – এখানে 'এক' ও 'আট' ক্রমবাচক বিশেষণ।

৫. পূরণবাচক: যে বিশেষণ দিয়ে পূরণসংখ্যা বোঝায়, তাকে পূরণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – তৃতীয় প্রজন্ম, ৩৪তম অনুষ্ঠান – এখানে 'তৃতীয়' ও '৩৪তম' পূরণবাচক বিশেষণ।

৬. পরিমাণবাচক: যে বিশেষণ দিয়ে পরিমাণ বা আয়তন বোঝায়, তাকে পরিমাণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – আধা কেজি চাল, অনেক লোক – এখানে 'আধা কেজি' ও 'অনেক' পরিমাণবাচক বিশেষণ।

৭. উপাদানবাচক: যে বিশেষণ দিয়ে উপাদান নির্দেশ করে, তাকে উপাদানবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – বেলে মাটি, পাথুরে মূর্তি – এখানে 'বেলে' ও 'পাথুরে' উপাদানবাচক বিশেষণ।

৮. প্রশ্নবাচক: যে বিশেষণ দিয়ে প্রশ্নবাচকতা নির্দেশিত হয়, তাকে প্রশ্নবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – কেমন গান? কতক্ষণ সময়? – এখানে 'কেমন' ও 'কতক্ষণ' প্রশ্নবাচক বিশেষণ।

৯. নির্দিষ্টতাবাচক: যে বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত শব্দকে নির্দিষ্ট করা হয়, তাকে নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ বলে। যেমন – এই দিনে, সেই সময় – এখানে 'এই' ও 'সেই' নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ।

১০. ভাববাচক বিশেষণ: যেসব বিশেষণ বাক্যের অন্তর্গত অন্য বিশেষণকে বিশেষিত করে, সেসব বিশেষণকে ভাববাচক বিশেষণ বলে। যেমন – 'খুব ভালো খবর' ও 'গাড়িটা বেশ জোরে চলছে' – এসব বাক্যে 'খুব' এবং 'বেশ' ভাববাচক বিশেষণ।

১১. বিধেয় বিশেষণ: বাক্যের বিধেয় অংশে যেসব বিশেষণ বসে, সেসব বিশেষণকে বিধেয় বিশেষণ বলে। যেমন – 'লোকটা পাগল' বা 'এই পুকুরের পানি ঘোলা' – বাক্য দুটির 'পাগল' ও 'ঘোলা' বিধেয় বিশেষণ।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বিশেষণ কার দোষ, গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি প্রকাশ করে?
ক. বিশেষ্য ও বিশেষণ   খ. বিশেষ্য ও সর্বনাম
গ. বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ   ঘ. বিশেষণ ও অনুসর্গ

২. 'সবুজ মাঠের পরে আমাদের গ্রাম' – বাক্যটিতে বিশেষণ পদ কোনটি?
ক. মাঠের   খ. আমাদের   গ. সবুজ   ঘ. পরে

৩. বর্ণবাচক বিশেষণের উদাহরণ কোনটি?
ক. লাল   খ. আধা   গ. পাথুরে   ঘ. এক

৪. 'চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ো না' – বাক্যটিতে 'চলন্ত' কোন জাতীয় বিশেষণ?
ক. অবস্থাবাচক   খ. উপাদান বাচক   গ. গুণবাচক   ঘ. ভাববাচক

৫. নিচের কোন উদাহরণে ভাববাচক বিশেষণ রয়েছে?
ক. খুব ভালো খবর   খ. লোকটা পাগল   গ. আধা কেজি চাল   ঘ. কতক্ষণ সময়

৬. 'তৃতীয়' কোন জাতীয় বিশেষণ?
ক. পূরণবাচক   খ. পরিমাণবাচক   গ. ক্রমবাচক   ঘ. গুণবাচক

পরিচ্ছেদ ২১

ক্রিয়া

বাক্যে উদ্দেশ্য বা কর্তা কী করে বা কর্তার কী ঘটে বা হয়, তা নির্দেশ করা হয় যে পদ দিয়ে তাকে ক্রিয়া বলে। যেমন –

রাজীব <u>খেলছে।</u>

বৃষ্টি <u>হতে পারে।</u>

ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন –

পড়্ + ই = পড়ি, পড়্ + এ = পড়ে, পড়্ + ছে = পড়ছে, পড়্ + বে = পড়বে

পক্ষ (পুরুষ) এবং কাল ভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ হয়। যেমন –

পক্ষভেদ: আমি পড়ি, আমরা পড়ি, তুমি পড়ো, তোমরা পড়ো, সে পড়ে, তারা পড়ে।

কালভেদ: আমি পড়ি, আমি পড়ছি, আমি পড়েছি, আমি পড়েছিলাম, আমি পড়ছিলাম, আমি পড়ব।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে, বাক্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে এবং গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া দুই প্রকার:

১. **সমাপিকা ক্রিয়া:** যে ক্রিয়া দিয়ে ভাব সম্পূর্ণ হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন – ভালো করে পড়াশোনা <u>করবে</u>।

২. **অসমাপিকা ক্রিয়া:** যে ক্রিয়া ভাব সম্পূর্ণ করতে পারে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন – ভালো করে পড়াশোনা <u>করলে</u> ভালো ফল হবে।

অসমাপিকা ক্রিয়া তিন ধরনের: ১. ভূত অসমাপিকা, ২. ভাবী অসমাপিকা এবং ৩. শর্ত অসমাপিকা। যথা:

ভূত অসমাপিকা: সে গান <u>করে</u> আনন্দ পায়।

ভাবী অসমাপিকা: সে গান <u>শিখতে</u> রাজশাহী যায়।

শর্ত অসমাপিকা: গান <u>করলে</u> তার মন ভালো হয়।

খ. বাক্যের মধ্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়া তিন প্রকার:

১. **অকর্মক ক্রিয়া:** বাক্যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম না থাকলে সেই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন – সে <u>ঘুমায়</u>।

এই বাক্যে কোনো কর্ম নেই।

২. **সকর্মক ক্রিয়া:** বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন – সে বই পড়ছে।

এই বাক্যে 'পড়ছে' হলো সকর্মক ক্রিয়া। 'বই' হলো 'পড়ছে' ক্রিয়ার কর্ম।

৩. **দ্বিকর্মক ক্রিয়া:** বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন – শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন।

এই বাক্যে 'দিলেন' একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া। 'কী দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় মুখ্য কর্ম ('বই'), আর 'কাকে দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় গৌণ কর্ম ('ছাত্রকে')।

গ. গঠন বিবেচনায় ক্রিয়া পাঁচ রকম:

১. **সরল ক্রিয়া:** একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে। যেমন – সে লিখছে। ছেলেরা মাঠে খেলছে। এখানে লিখছে ও খেলছে – এগুলো সরল ক্রিয়া।

২. **প্রযোজক ক্রিয়া:** কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন – তিনি আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন; রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায় – এখানে 'করাচ্ছেন' ও 'খাওয়ায়' প্রযোজক ক্রিয়া।

৩. **নামক্রিয়া:** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের শেষে -আ বা -আনো প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নামক্রিয়া বলে। যেমন – বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে -আনো যুক্ত হয়ে হয় চমকানো: আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়; বিশেষণ কম শব্দের সঙ্গে -আ যুক্ত হয়ে হয় কমা: বাজারে সবজির দাম কমছে না; ধ্বন্যাত্মক ছটফট শব্দের সঙ্গে -আনো যুক্ত হয়ে হয় ছটফটানো: জবাই করা মুরগি উঠানে ছটফটায়।

৪. **সংযোগ ক্রিয়া:** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়। করা ক্রিয়া যোগে: গান করা, গরম করা, ঠনঠন করা, ব্যাট করা; কাটা ক্রিয়া যোগে: সাঁতার কাটা, বিপদ কাটা; হওয়া ক্রিয়া যোগে: উদয় হওয়া, বড়ো হওয়া, রাজি হওয়া; দেওয়া ক্রিয়া যোগে: কথা দেওয়া, মন দেওয়া, দোষ দেওয়া; ধরা ক্রিয়া যোগে: ভাঙন ধরা, মরচে ধরা, ক্যাচ ধরা; পাওয়া ক্রিয়া যোগে: লজ্জা পাওয়া, কষ্ট পাওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া; খাওয়া ক্রিয়া যোগে: আছাড় খাওয়া, মার খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া; মারা ক্রিয়া যোগে: উঁকি মারা, পকেট মারা।

৫. **যৌগিক ক্রিয়া:** অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন – মরে যাওয়া, কমে আসা, এগিয়ে চলা, হেসে ওঠা, উঠে পড়া, পেয়ে বসা, সরে দাঁড়ানো, বেঁধে দেওয়া, বুঝে নেওয়া, বলে ফেলা, করে তোলা, চেপে রাখা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বাক্যের উদ্দেশ্য বা কর্তা কী করে বা কর্তার কী ঘটে বা হয় তা কোন পদের দ্বারা নির্দেশিত হয়?
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ গ. ক্রিয়া ঘ. যোজক

২. ধাতুর সঙ্গে কী যুক্ত হয়ে ক্রিয়া হয়?
ক. প্রত্যয় খ. অনুসর্গ গ. বিভক্তি ঘ. উপসর্গ

৩. ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয় –
ক. পুরুষ ভেদে খ. কাল ভেদে গ. বচন ভেদে ঘ. ক ও খ উভয়ই

৪. নিচের কোন বাক্যটিতে অসমাপিকা ক্রিয়া নেই?
ক. সে গান করে আনন্দ পায় খ. রাতের বেলা আকাশে চাঁদ ওঠে
গ. ভালো করে পড়াশোনা করবে ঘ. পড়াশোনা করলে ভালো ফল হবে

৫. কোনটি অসমাপিকা ক্রিয়ার ধরন?
ক. শর্ত খ. ভূত গ. ভাবী ঘ. সবগুলোই

৬. নিচের বাক্যগুলোতে কোনটি অকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ?
ক. সে বই পড়ছে গ. তিনি আমাকে বই দিলেন
খ. লতা ঘুমায় ঘ. সে গল্প লিখছে

৭. অন্যকে দিয়ে করা বোঝালে কোন ক্রিয়া হয়?
ক. সরল ক্রিয়া গ. প্রযোজক ক্রিয়া খ. নাম ক্রিয়া ঘ. যৌগিক ক্রিয়া

৮. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠন করে তাকে কী বলে?
ক. সংযোগ ক্রিয়া খ. নাম ক্রিয়া গ. সরল ক্রিয়া ঘ. যৌগিক ক্রিয়া

৯. নিচের কোনটি যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ?
ক. এগিয়ে চলা খ. উদয় হওয়া গ. ডিগবাজি খাওয়া ঘ. বৃদ্ধি পাওয়া

১০. ধ্বন্যাত্মক নামক্রিয়ার উদাহরণ আছে কোন বাক্যে?
ক. চিঠিটা ওকে দিয়ে লেখাতে হবে।
খ. পাখিটা ছটফটাচ্ছে।
গ. ঘণ্টা বেজে উঠল।
ঘ. মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

পরিচ্ছেদ ২২

ক্রিয়াবিশেষণ

যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। নিচের বাক্য তিনটির নিম্নরেখ শব্দগুলো ক্রিয়াবিশেষণের উদাহরণ:

ছেলেটি দ্রুত দৌড়ায়।
লোকটি ধীরে হাঁটে।
মেয়েটি গুনগুনিয়ে গান করছে।

অনেক সময়ে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে '-এ', '-তে' ইত্যাদি বিভক্তি এবং '-ভাবে', '-বশত', '-মতো' ইত্যাদি শব্দাংশ যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবিশেষণ তৈরি হয়। যেমন – ততক্ষণে, দ্রুতগতিতে, শান্তভাবে, ভ্রান্তিবশত, আচ্ছামতো ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিশেষণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: কোনো ক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়, ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ তা নির্দেশ করে। যেমন –

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।
ঠিকভাবে চললে কেউ কিছু বলবে না।

২. কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: এই ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল নির্দেশ করে। যেমন –

আজকাল ফলের চেয়ে ফুলের দাম বেশি।
যথাসময়ে সে হাজির হয়।

৩. স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: ক্রিয়ার স্থান নির্দেশ করে স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ। যেমন –

মিছিলটি সামনে এগিয়ে যায়
তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

৪. নেতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ: না, নি ইত্যাদি দিয়ে ক্রিয়ার নেতিবাচক অবস্থা বোঝায়। এগুলো সাধারণত ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন –

সে এখন যাবে না।
তিনি বেড়াতে যাননি।
এমন কথা আমার জানা নেই।

৫. পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ: বাক্যের মধ্যে বিশেষ কোনো ভূমিকা পালন না করলেও 'কি', 'যে', 'বা','না', 'তো' প্রভৃতি পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে। যেমন –

কি: আমি কি যাব?
যে: খুব যে বলেছিলেন আসবেন!

বা: কখনো বা দেখা হবে।
না: একটু ঘুরে আসুন না, ভালো লাগবে।
তো: মরি তো মরব।

গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াবিশেষণকে একপদী ও বহুপদী – এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

একপদী ক্রিয়াবিশেষণ: আস্তে, জোরে, চেঁচিয়ে, সহজে, ভালোভাবে ইত্যাদি।

বহুপদী ক্রিয়াবিশেষণ: ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে কী বলে?
ক. ক্রিয়া-বিশেষ্য খ. ক্রিয়াবিশেষণ গ. গুণ-বিশেষ্য ঘ. অনুসর্গ

২. কোনটি কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ?
ক. তিনি এখানে এসেছিলেন।
খ. ছেলেটি দ্রুত দৌড়ায়।
গ. গতকাল তিনি ঘুরে গিয়েছেন।
ঘ. একটু ঘুরে আসুন না!

৩. 'মিছিলটি সামনে এগিয়ে যায়'– বাক্যটিতে কোন ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ধরনবাচক খ. কালবাচক গ. স্থানবাচক ঘ. পদাণু

৪. 'কি', 'যে', 'বা', 'তো' প্রভৃতি কোন ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ?
ক. পদাণু খ. কালবাচক গ. স্থানবাচক ঘ. ধরনবাচক

৫. নিচের কোনটি একপদী ক্রিয়াবিশেষণের উদাহরণ?
ক. জোরে খ. ভয়ে ভয়ে গ. মরতে মরতে ঘ. যায় যায়

পরিচ্ছেদ ২৩

অনুসর্গ

যেসব শব্দ কোনো শব্দের পরে বসে শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, সেসব শব্দকে অনুসর্গ বলে। যেমন –

সে কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না। – এই বাক্যে 'ছাড়া' একটি অনুসর্গ।

কোন পর্যন্ত পড়েছ? – এই বাক্যে 'পর্যন্ত' একটি অনুসর্গ।

কয়েকটি অনুসর্গের উদাহরণ:

অপেক্ষা, অবধি, অভিমুখে, আগে, উপরে, করে, কর্তৃক, কাছে, কারণে, ছাড়া, জন্য, তরে, থেকে, দরুন, দিকে, দিয়ে, দ্বারা, ধরে, নাগাদ, নিচে, পর্যন্ত, পানে, পাশে, পিছনে, প্রতি, বদলে, বনাম, বরাবর, বাইরে, বাদে, বাবদ, বিনা, ব্যতীত, ভিতরে, মতো, মধ্যে, মাঝে, লেগে, সঙ্গে, সম্মুখে, সাথে, সামনে, হতে ইত্যাদি।

যেসব শব্দের পরে অনুসর্গ বসে, সেসব শব্দের সঙ্গে '-কে' '-র', '- ইত্যাদি বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে। যেমন –

তোমাকে দিয়ে এ কাজ সম্ভব।

সে পরীক্ষার জন্য পড়ছে।

অনুসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: সাধারণ অনুসর্গ ও ক্রিয়াজাত অনুসর্গ।

সাধারণ অনুসর্গ

যেসব অনুসর্গ ক্রিয়া ছাড়া অন্য শব্দ থেকে তৈরি হয়, সেগুলোকে সাধারণ অনুসর্গ বলে। যেমন –

উপরে: মাথার উপরে নীল আকাশ।

কাছে: কার কাছে গেলে জানা যাবে?

জন্যে: হারানো ঘড়িটার জন্য অনেক কেঁদেছি।

দ্বারা: এমন কাজ তোমার দ্বারা হবে না।

বনাম: আজ বাংলাদেশ বনাম ভারতের খেলা।

ক্রিয়াজাত অনুসর্গ

যেসব অনুসর্গ ক্রিয়াপদ থেকে তৈরি হয়েছে, সেগুলোকে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে। যেমন –

করে: ভালো করে খেয়ে নাও।

থেকে: ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে পদ্মা নদী পার হতে হয়।

দিয়ে: মন দিয়ে লেখাপড়া করা দরকার।

ধরে: বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি।

বলে: সে সঙ্গে যাবে বলে তৈরি হয়ে এসেছে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. অনুসর্গকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

২. সাধারণ অনুসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে কোনটিতে?
ক. মাথার উপরে নীল আকাশ। খ. ভালো করে খেয়ে নাও।
গ. মন দিয়ে লেখাপড়া করো। ঘ. বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি।

৩. নিচের কোনটিতে ক্রিয়াজাত অনুসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে?
ক. এমন কাজ তোমার দ্বারা হবে না। খ. কার কাছে গেলে জানা যাবে?
গ. সবার সামনে থাকবে। ঘ. তুমি আসবে বলে দাঁড়িয়ে আছি।

৪. কোনটি অনুসর্গের উদাহরণ?
ক. আপন, তুমি খ. বলে, কয়ে গ. অভিমুখে, কাছে ঘ. জোরে, আস্তে

৫. ক্রিয়াপদ থেকে তৈরি হয়েছে কোন অনুসর্গ?
ক. ক্রিয়াজাত অনুসর্গ খ. ক্রিয়ামুখী অনুসর্গ
গ. ক্রিয়াধর্মী অনুসর্গ ঘ. ক্রিয়ালগ্ন অনুসর্গ

পরিচ্ছেদ ২৪

যোজক

পদ, বর্গ বা বাক্যকে যেসব শব্দ যুক্ত করে, সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন – এবং, ও, আর, অথবা, তবু, সুতরাং, কারণ, তবে ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজককে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

১. **সাধারণ যোজক:** এ ধরনের যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যকে যোগ করে। যেমন –

রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে।
জলদি দোকানে যাও এবং পাউরুটি কিনে আনো।

২. **বিকল্প যোজক:** এ ধরনের যোজক একাধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন –

লাল বা নীল কলমটা আনো।
চা না-হয় কফি খান।

৩. **বিরোধ যোজক:** এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের সংযোগ ঘটায় এবং প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে। যেমন –

এত পড়লাম, কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করতে পারলাম না।
তাকে আসতে বললাম, তবু এল না।

৪. **কারণ যোজক:** এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন –

জিনিসের দাম বেড়েছে, কারণ চাহিদা বেশি।
বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।

৫. **সাপেক্ষ যোজক:** এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন –

যদি রোদ ওঠে, তবে রওনা দেব।
যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি।

২০১৭

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. যোজক কাকে যুক্ত করে?

ক. পদ খ. বর্গ গ. বাক্য ঘ. সবগুলো

২. বিরোধ যোজক আছে কোন বাক্যে?

ক. সংখ্যাটি সতেরো কিংবা আঠারো হবে।

খ. লোকটি শিক্ষিত, তবে সৎ নন।

গ. যখন বৃষ্টি থাকল, তখন সবাই রওনা হলাম।

ঘ. দুবার বলেছি, ফলে তৃতীয় বার বলার প্রয়োজন বোধ করিনি।

৩. কোন যোজক কার্যকারণ দেখাতে দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায়?

ক. সাধারণ যোজক খ. বিকল্প যোজক গ. কারণ যোজক ঘ. বিরোধ যোজক

৪. কোন যোজক একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়?

ক. কারণ যোজক খ. বিকল্প যোজক গ. সাপেক্ষ যোজক ঘ. কারণ যোজক

৫. "যদি রোদ ওঠে তবে রওনা দেবো" – বাক্যটি কোন যোজক নির্দেশ করেছে?

ক. সাধারণ যোজক খ. বিকল্প যোজক গ. বিরোধ যোজক ঘ. সাপেক্ষ যোজক

পরিচ্ছেদ ২৫

আবেগ

মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা হয় যেসব শব্দ দিয়ে সেগুলোকে আবেগ শব্দ বলা হয়। এই ধরনের শব্দ বাক্যের অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হয়ে আলগাভাবে বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন – ছি ছি, আহা, বাহ্, শাবাশ, হায় হায় ইত্যাদি।

নিচে বিভিন্ন ধরনের আবেগ শব্দের প্রয়োগ দেখানো হলো।

১. **সিদ্ধান্ত আবেগ:** এ জাতীয় শব্দের সাহায্যে অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়। যেমন –

হ্যাঁ, আমাদের জিততেই হবে।
বেশ, তবে যাওয়াই যাক।

২. **প্রশংসা আবেগ:** এ ধরনের শব্দ প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন –

শাবাশ! এমন খেলাই তো চেয়েছিলাম।
বাহ্, চমৎকার লিখেছ।

৩. **বিরক্তি আবেগ:** এ ধরনের শব্দ অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন –

ছি ছি! এরকম কথা তার মুখে মানায় না।
জ্বালা! তোমাকে নিয়ে আর পারি না!

৪. **আতঙ্ক আবেগ:** এ ধরনের আবেগ-শব্দ আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ করে। যেমন –

উহ্, কী বিপদে পড়া গেল।
বাপরে বাপ! কী ভয়ঙ্কর ছিল রাক্ষসটা।

৫. **বিস্ময় আবেগ:** এ ধরনের শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করে। যেমন –

আরে! তুমি আবার কখন এলে?
আহ্, কী চমৎকার দৃশ্য!

৬. **করুণা আবেগ:** এ ধরনের শব্দ করুণা, মায়া, সহানুভূতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করে। যেমন –

আহা! বেচারার এত কষ্ট।
হায় হায়! ওর এখন কী হবে!

৭. **সম্বোধন আবেগ:** এ ধরনের শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন –

হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন।
ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।

৮. **অলংকার আবেগ:** এ ধরনের শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্যে অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন –

দুর! এ কথা কি বলতে আছে?
যাকগে, ওসব কথা থাক।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. আবেগ শব্দ কীভাবে ব্যবহৃত হয়?
ক. স্বাধীনভাবে খ. অনুমোদিতভাবে গ. নিয়ন্ত্রিতভাবে ঘ. শর্তসাপেক্ষে

২. অনুমোদন, সম্মতি ও সমর্থন প্রকাশ পায় কোন জাতীয় আবেগ শব্দে?
ক. সিদ্ধান্ত আবেগ খ. অলঙ্কার আবেগ গ. বিস্ময় আবেগ ঘ. সম্বোধন আবেগ

৩. নিচের কোনটি সঠিক?
ক. হ্যাঁ – সিদ্ধান্ত আবেগ খ. শাবাশ – আতঙ্ক আবেগ
গ. আরে – করুণা আবেগ ঘ. আহা – বিস্ময় আবেগ

৪. সম্বোধন আবেগ আছে কোন বাক্যে?
ক. ওহে, কী বলেছি, শুনেছ?
খ. নাহ্, ওকে নিয়ে আর পারি না।
গ. আরে! তুমি আবার কখন এলে?
ঘ. দুর! ওসব কথা আমি বলিনি।

৫. নিচের কোনটি অলংকার আবেগ?
ক. হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন।
খ. আহা! বেচারার এত কষ্ট!
গ. উহ্! কী বিপদে পড়া গেল।
ঘ. দূর পাগল! এ কথা কি বলতে আছে?

পরিচ্ছেদ ২৬

নির্দেশক

যেসব লগ্নক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা বোঝায়, সেগুলোকে নির্দেশক বলে। যেমন – -টা, -টি, -খানা, -খানি, -জন, -টুকু। নিচে কয়েকটি নির্দেশকের প্রয়োগ দেখানো হলো।

ক) -টা, -টি

বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণের সঙ্গে -টা, -টি নির্দেশক বসে। এর দুটি রূপান্তর: -টো ও -টে। যেমন –

বাড়িটা, ছেলেটা, এটা, সেটা, আমারটা, কিছুটা, একটা, সারাটা, করাটা; দিনটি, মেয়েটি, একটি, কয়েকটি, আরেকটি; দুটো; তিনটে ইত্যাদি।

খ) -খানা, -খানি

বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে -খানা, -খানি নির্দেশক বসে। যেমন –

ব্যাপারখানা, ভাবখানা, একখানা, আধখানা, মুখখানি, অনেকখানি ইত্যাদি।

যেসব ক্ষেত্রে -টা বা -টি বসে, সেসব ক্ষেত্রে -খানা বা -খানি বসতে পারে। যেমন, বাড়িটা বা বাড়িটি না বলে বাড়িখানা বা বাড়িখানিও বলা যায়।

গ) -জন

শুধু মানুষের বেলায় -জন নির্দেশকের ব্যবহার হয়। যেমন –

বিজ্ঞজন, লোকজন, অনেকজন, কয়জন, এতজন, পণ্ডিতজন।

সংখ্যার সঙ্গেও -জন নির্দেশকের ব্যবহার হয়। যেমন –

<u>একজন</u> রাজা, <u>দুজন</u> ডাক্তার ইত্যাদি।

অধিক সংখ্যার বেলায় 'জন' নির্দেশকটি সংখ্যা পরে আলাদা শব্দের মতো বসে। যেমন –

পাঁচ জন, পঁচিশ জন, ৪৫ জন ইত্যাদি।

ঘ) -টুকু

-টুকু নির্দেশক দিয়ে কোনো কিছুর সামান্য অংশ বা অল্প পরিমাণ বোঝায়। বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে নির্দেশকটি ব্যবহৃত হয়। এর রূপভেদ: -টু বা -টুক। যেমন –

সাবানটুকু, হাসিটুকু, শরবতটুকু, এতটুকু, সময়টুকু, একটু, আধটু, যতটুক, ততটুক ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. কোনটি নির্দেশক নয়?

ক. -টা খ. -তম গ. -খানা ঘ. -জন

২. -টা/-টি নির্দেশকের রূপান্তর?

ক. -টো খ. -টুকু

গ. -তা ঘ. -তে

৩. কিছুটা বা সামান্য অংশ বা অল্প পরিমাণ বোঝাতে কোন নির্দেশক ব্যবহৃত হয়?

ক. -টুক খ. -টি গ. -খানা ঘ. -খানি

৪. কোন নির্দেশকটি শব্দের পরে আলাদাভাবে বসে?

ক. জন খ. টুকু গ. খানা ঘ. খানি

৫. নির্দেশক যুক্ত হয় কোন শব্দের সঙ্গে?

ক. বিশেষ্য খ. সর্বনাম গ. বিশেষণ ঘ. সবগুলোই

২০২৫

পরিচ্ছেদ ২৭

বচন

বচন হলো সংখ্যার ধারণা। বচনের মাধ্যমে গণনাবাচক বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের সংখ্যা নির্দেশিত হয়। বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার: একবচন ও বহুবচন। সাধারণত কিছু শব্দাংশ বা লগ্নক একবচন শব্দের পরে যুক্ত হয়ে বহুবচন শব্দ তৈরি করে।

একবচন শব্দের উদাহরণ:

শিক্ষক ক্লাসে এসেছেন।
বইটা কোথায় হারিয়ে গেল?

এখানে প্রথম বাক্যের 'শিক্ষক' শব্দের সঙ্গে কোনো লগ্নক যুক্ত হয়নি। দ্বিতীয় বাক্যে 'বই' শব্দের সঙ্গে যুক্ত 'টা' একটি নির্দেশক। এর সঙ্গেও কোনো বহুবচন লগ্নক যুক্ত হয়নি।

বহুবচন শব্দের উদাহরণ:

মাঝিরা নৌকা চালায়।
কলমগুলোর দাম অনেক।

এখানে প্রথম বাক্যের একবচন 'মাঝি' শব্দের সঙ্গে '-রা' লগ্নক যুক্ত হয়ে বহুবচন 'মাঝিরা' হয়েছে। একইভাবে দ্বিতীয় বাক্যে '-গুলো' লগ্নক যুক্ত হয়ে বহুবচন 'কলমগুলো' হয়েছে।

ক) '-রা', '-এরা', '-গুলো', '-গুলি', '-দের' ইত্যাদি লগ্নক যুক্ত হলে শব্দটির বহুবচন হয়। যেমন –

রা – ছাত্ররা, ধনীরা
এরা – ভাইয়েরা, শিক্ষকেরা
গুলো – ফুলগুলো, গরুগুলো
গুলি – বইগুলি, ঘরগুলি
দের – ছেলেদের, মেয়েদের।

খ) কিছু একবচন শব্দ বহুবচন হওয়ার সময়ে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটায়। যেমন –

একবচন – আমি, বহুবচন – আমরা
একবচন – তুমি, বহুবচন – তোমরা
একবচন – সে, বহুবচন – তারা
একবচন – তিনি, বহুবচন – তাঁরা।

গ) প্রাণী বা বস্তুর নামকে বহুবচন করতে '-সব', '-সমূহ', '-আবলি', '-মালা' ইত্যাদি লগ্নক যোগ করতে হয়। যেমন –

সব – ভাইসব, পাখিসব
সমূহ – গ্রন্থসমূহ, বৃক্ষসমূহ

আবলি – নিয়মাবলি, রচনাবলি
মালা – মেঘমালা, পর্বতমালা।

ঘ) মানী পক্ষের বহুবচন করার সময়ে '-গণ,' '-বৃন্দ', '-মণ্ডলী', '-বর্গ' ইত্যাদি লগ্নক যোগ করা হয়। যেমন –
গণ – সদস্যগণ, সচিবগণ
বৃন্দ – দর্শকবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ
মণ্ডলী – সুধীমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী
বর্গ – পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রীবর্গ।

অনেক ক্ষেত্রে বচন লগ্নক ব্যবহৃত না হলেও বহুবচন হতে পারে। যেমন –
বাজারে লোক কম।
মৌমাছি মৌচাক বানায়।
সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. একাধিক সংখ্যা বোঝাতে যেসব লগ্নক বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে যুক্ত হয়, তার নাম –
ক. বচন খ. যোজক গ. আবেগ ঘ. পদাণু

২. নিচের কোনটি একবচন?
ক. আমি খ. বইগুলি গ. মাঝিরা ঘ. কলমগুলো

৩. 'মানী' লোকের বেলায় বহুবচনে কী লগ্নক ব্যবহৃত হয়?
ক. বৃন্দ খ. মালা গ. সব ঘ. রাজি

৪. নিচের কোন বাক্যে বহুবচন ব্যবহৃত না হয়েও বহুবচন বোঝাচ্ছে?
ক. মৌমাছি মৌচাক বানায়।
খ. ছাত্ররা এসে জড়ো হয়েছে।
গ. এ নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই।
ঘ. হাজার হাজার কৃষক ফুলের চাষ করেন।

৫. 'পর্বত' শব্দকে বহুবচন করতে কোন লগ্নকটি ব্যবহৃত হয়?
ক. কুল খ. সব গ. সমূহ ঘ. মালা

পরিচ্ছেদ ২৮

বিভক্তি

বাক্যের মধ্যে অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক বোঝাতে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে অর্থহীন কিছু লগ্নক যুক্ত হয়, সেগুলোকে বিভক্তি বলে। যেমনঃ -এ, -তে, -য়, -য়ে, -কে, -রে, -র, -এর, -য়ের ইত্যাদি।

> লোকে কি না বলে! – এই বাক্যে 'লোক' শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে '-এ' বিভক্তি।
>
> সে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গরু চরাতে গেছে। – এই বাক্যে 'ছেলে' শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে '-কে' বিভক্তি।
>
> বাড়ির পুকুরের পাড়ে বড়ো ভাইয়ের কলাবাগান। – এই বাক্যে 'বাড়ি', 'পুকুর' এবং 'ভাই' শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে '-র', '-এর' এবং '-য়ের' বিভক্তি।

বিভক্তিগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দেখানো যায়।

ক) -এ, -তে, -য়, -য়ে বিভক্তি

সাধারণত ক্রিয়ার স্থান, কাল, ভাব বোঝাতে -এ, -তে, -য়, -য়ে ইত্যাদি বিভক্তির ব্যবহার হয়। কখনো কখনো বাক্যের কর্তার সঙ্গেও এসব বিভক্তি বসে।

যেসব শব্দের শেষে কারচিহ্ন নেই, সেসব শব্দের সঙ্গে -এ বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন – সকালে, দিনাজপুরে, ই-মেইলে, কম্পিউটারে, ছাগলে, তিলে ইত্যাদি।

শব্দের শেষে ই-কার ও উ-কার থাকলে -তে বিভক্তি হয়। যেমন – হাতিতে, রাত্রিতে, মধুতে, রামুতে ইত্যাদি।

আ-কারান্ত শব্দের শেষে -য় বিভক্তি হয়। যেমন – ঘোড়ায়, সন্ধ্যায়, ঢাকায় ইত্যাদি।

শব্দের শেষে দ্বিস্বর থাকলে -য়ে বিভক্তি হয়। যেমন – ছইয়ে, ভাইয়ে, বউয়ে।

ই-কারান্ত শব্দের শেষেও -য়ে বিভক্তি দেখা যায়। যেমন – ঝিয়ে, ঘিয়ে।

খ) -কে, -রে বিভক্তি

বাক্যে গৌণকর্মের সঙ্গে সাধারণত -কে এবং -রে বিভক্তি বসে। ক্রিয়াকে 'কাকে' প্রশ্ন করলে যে শব্দ পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন – শিশুকে, দরিদ্রকে, আমাকে, আমারে ইত্যাদি।

গ) -র, -এর, -য়ের বিভক্তি

বাক্যের মধ্যে পরবর্তী শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ বোঝাতে পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে -র, -এর এবং -য়ের বিভক্তি যুক্ত হয়। সাধারণত আ-কারান্ত, ই/ঈ-কারান্ত ও উ/ঊ-কারান্ত শব্দের শেষে -র বিভক্তি বসে। যেমন – রাজার, প্রজার, হাতির, বুদ্ধিজীবীর, তনুর, বধূর।

যেসব শব্দের শেষে কারচিহ্ন নেই, সেসব শব্দের শেষে -এর বিভক্তি হয়। যেমন – বলের, শব্দের, নজরুলের, সাতাশের ইত্যাদি।

শব্দের শেষে দ্বিস্বর থাকলে -য়ের বিভক্তি হয়। যেমন – ভাইয়ের, বইয়ের, লাউয়ের, মৌয়ের ইত্যাদি।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. 'লোকে কিনা বলে' – বাক্যের লোক শব্দের সঙ্গে কোন বিভক্তি যুক্ত আছে?
ক. -এ খ. -তে গ. -যে ঘ. -রে

২. সাধারণত ক্রিয়ার কাল, স্থান ও ভাব বোঝাতে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
ক. -কে, -রে খ. -র, -এর গ. -এ, -তে ঘ. -এ, -য়ের

৩. শব্দের শেষে ই-কার ও উ-কার থাকলে -এ বিভক্তির রূপভেদ হয় –
ক. -য়ে খ. -এ গ. -কে ঘ. -তে

৪. আ-কারান্ত শব্দের শেষে -এ বিভক্তির রূপভেদ –
ক. -ই খ. -রে গ. -র ঘ. -য়

৫. শব্দের শেষে দ্বিস্বর থাকলে -এ বিভক্তির রূপভেদ হয় –
ক. -এ খ. -তে গ. -য়ে ঘ. -রে

৬. বাক্যে গৌণ কর্মের সঙ্গে কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়?
ক. -র খ. -এ গ. -কে ঘ. -তে

৭. বাক্যের মধ্যে পরবর্তী শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ বোঝাতে কোন বিভক্তি হয়?
ক. -র খ. -এ গ. -কে ঘ. -তে

পরিচ্ছেদ ২৯

ক্রিয়াবিভক্তি

ক্রিয়ার দুইটি অংশ: প্রথম অংশ ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং দ্বিতীয় অংশ ক্রিয়াবিভক্তি। ক্রিয়ামূলের সঙ্গে যেসব লগ্নক যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার কাল ও পক্ষ নির্দেশিত হয়, সেগুলোকে ক্রিয়াবিভক্তি বলে। যেমন –

পড়ছি (পড়্ + ছি) – ক্রিয়ার এই রূপটি থেকে বোঝা যায় যে, এই ক্রিয়ার কর্তা বক্তা পক্ষের এবং এটা দিয়ে ঘটমান বর্তমান কালের পড়া ক্রিয়াকে বোঝায়।

পড়বেন (পড়্ + বেন) – ক্রিয়ার এই রূপটি থেকে বোঝা যায় যে, এই ক্রিয়ার কর্তা শ্রোতা পক্ষের এবং এটা দিয়ে সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের পড়া ক্রিয়াকে বোঝায়।

পড়ছিল (পড়্ + ছিল) – ক্রিয়ার এই রূপটি থেকে বোঝা যায় যে, এই ক্রিয়ার কর্তা অন্য পক্ষের এবং এটা দিয়ে সাধারণ অতীত কালের পড়া ক্রিয়াকে বোঝায়।

উপরের উদাহরণগুলোতে '-ছি', '-বেন', '-ছিল' – এগুলো হলো ক্রিয়াবিভক্তি।

অধিকাংশ বাংলা ক্রিয়ার দুটি রূপ আছে: সাধারণ রূপ ও প্রযোজক রূপ। উভয় রূপের সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তির রূপ আলাদা। নিচের সারণিতে ক্রিয়ামূল 'কর্'-এর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তির প্রয়োগ দেখানো হলো:

সাধারণ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তি

কাল↓ পক্ষ→	আমি	তুমি	তুই	সে	আপনি/তিনি
সাধারণ বর্তমান	-ই (করি)	-ও (করো)	-ইস (করিস)	-এ (করে)	-এন (করেন)
ঘটমান বর্তমান	-ছি (করছি)	-ছ (করছ)	-ছিস (করছিস)	-ছে (করছে)	-ছেন (করছেন)
পুরাঘটিত বর্তমান	-এছি (করেছি)	-এছ (করেছ)	-এছিস (করেছিস)	-এছে (করেছে)	-এছেন (করেছেন)
অনুজ্ঞা বর্তমান		-ও (করো)	-ইস (করিস)	-উক (করুক)	-উন (করুন)
সাধারণ অতীত	-লাম (করলাম)	-লে (করলে)	-লি (করলি)	-ল (করল)	-লেন (করলেন)
ঘটমান অতীত	-ছিলাম (করছিলাম)	-ছিলে (করছিলে)	-ছিলি (করছিলি)	-ছিল (করছিল)	-ছিলেন (করছিলেন)
পুরাঘটিত অতীত	-এছিলাম (করেছিলাম)	-এছিলে (করেছিলে)	-এছিলি (করেছিলি)	-এছিল (করেছিল)	-এছিলেন (করেছিলেন)
নিত্য অতীত	-তাম (করতাম)	-তে (করতে)	-তি (করতি)	-ত (করত)	-তেন (করতেন)

সাধারণ ভবিষ্যৎ	-ব (করব)	-বে (করবে)	-বি (করবি)	-বে (করবে)	-বেন (করবেন)
অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ		-ও (কোরো)	-বি (করবি)	-বে (করবে)	-বেন (করবেন)
অসমাপিকা	ভূত অসমাপিকা: -এ (করে); ভাবী অসমাপিকা: -তে (করতে); শর্ত অসমাপিকা: -লে (করলে)				

প্রযোজক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তি

কাল↓পক্ষ→	আমি	তুমি	তুই	সে	আপনি/তিনি
সাধারণ বর্তমান	-আই (করাই)	-আও (করাও)	-আস (করাস)	-আয় (করায়)	-আন (করান)
ঘটমান বর্তমান	-আচ্ছি (করাচ্ছি)	-আচ্ছ (করাচ্ছ)	-আচ্ছিস (করাচ্ছিস)	-আচ্ছে (করাচ্ছে)	-আচ্ছেন (করাচ্ছেন)
পুরাঘটিত বর্তমান	-ইয়েছি (করিয়েছি)	-ইয়েছ (করিয়েছ)	-ইয়েছিস (করিয়েছিস)	-ইয়েছে (করিয়েছে)	-ইয়েছেন (কবিয়েছেন)
অনুজ্ঞা বর্তমান		-আও (করাও)	-আস (করাস)	-আক (করাক)	-আন (করান)
সাধারণ অতীত	-আলাম (করালাম)	-আলে (করালে)	-আলি (করালি)	-আল (করাল)	-আলেন (করালেন)
ঘটমান অতীত	-আচ্ছিলাম (করাচ্ছিলাম)	-আচ্ছিলে (করাচ্ছিলে)	-আচ্ছিলি (করাচ্ছিলি)	-আচ্ছিল (করাচ্ছিল)	-আচ্ছিলেন (করাচ্ছিলেন)
পুরাঘটিত অতীত	-ইয়েছিলাম (করিয়েছিলাম)	-ইয়েছিলে (করিয়েছিলে)	-ইয়েছিলি (করিয়েছিলি)	-ইয়েছিল (করিয়েছিল)	-ইয়েছিলেন (করিয়েছিলেন)
নিত্য অতীত	-আতাম (করাতাম)	-আতে (করাতে)	-আতি (করাতি)	-আত (করাত)	-আতেন (করাতেন)
সাধারণ ভবিষ্যৎ	-আব (করাব)	-আবে (করাবে)	-আবি (করাবি)	-আবে (করাবে)	-আবেন (করাবেন)
অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ		-ইয়ো (করিয়ো)	-আবি (করাবি)	-আবে (করাবে)	-আবেন (করাবেন)
অসমাপিকা	ভূত অসমাপিকা: -ইয়ে (করিয়ে); ভাবী অসমাপিকা: -আতে (করাতে); শর্ত অসমাপিকা: -আলে (করালে)				

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. ক্রিয়ার প্রথম অংশকে কী বলে?

ক. শব্দ খ. শব্দমূল গ. ধাতু ঘ. ক্রিয়াবিভক্তি

২. ক্রিয়ার দ্বিতীয় অংশকে কী বলে?

ক. ধ্বনি খ. বর্ণ গ. ধাতু ঘ. ক্রিয়াবিভক্তি

৩. সাধারণ ক্রিয়ার বর্তমান কালে বক্তা পক্ষের ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?

ক. -ই (করি) খ. -আই (করাই) গ. -লে (করলে) ঘ. -এন (করেন)

৪. প্রযোজক ক্রিয়ার সাধারণ অতীত কালে শ্রোতা পক্ষের মানী ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?

ক. -তি (করাতি) খ. -আলাম (করালাম)
গ. -ইয়েছি (করিয়েছি) ঘ. -আলেন (করালেন)

৫. সাধারণ ক্রিয়ার নিত্য অতীত কালে শ্রোতা পক্ষের ঘনিষ্ঠ ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?

ক. -ব (করব) খ. -তি (করতি) গ. -বে (করবে) ঘ. -এন (করেন)

৬. প্রযোজক ক্রিয়ার সাধারণত বর্তমান কালে বক্তা পক্ষের ক্রিয়াবিভক্তি কোনটি?

ক. -আও (করাও) খ. -আস (করাস) গ. -আয় (করায়) ঘ. -আই (করাই)

৭. নিচের কোনটি প্রযোজক ক্রিয়ার ভাবী অসমাপিকা ক্রিয়াবিভক্তি?

ক. -আনো (করানো) খ. -ইয়ে (করিয়ে) গ. -আতে (করাতে) ঘ. -আলে (করালে)

২০২৫

পরিচ্ছেদ ৩০

ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার: বর্তমান কাল, অতীত কাল ও ভবিষ্যৎ কাল।

১. বর্তমান কাল

বর্তমানে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে বর্তমান কাল বলে। বর্তমান কাল চার প্রকার: সাধারণ বর্তমান, ঘটমান বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান এবং অনুজ্ঞা বর্তমান।

সাধারণ বর্তমান

যে ক্রিয়া বর্তমান কালে নিয়মিতভাবে ঘটে, তাকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন –

আমি স্কুলে <u>যাই</u>।
সূর্য পূর্ব দিকে <u>ওঠে</u>।

ঘটমান বর্তমান

যে ক্রিয়া বর্তমানে চলছে বোঝায়, তাকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে। যেমন –

আমি স্কুলে <u>যাচ্ছি</u>।
আমাদের পরীক্ষা <u>চলছে</u>।

পুরাঘটিত বর্তমান

এইমাত্র সম্পন্ন ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত বর্তমান কাল বলে। যেমন –

আমি অঙ্কটি <u>করেছি</u>।
তারা বাড়িতে <u>ফিরেছে</u>।

অনুজ্ঞা বর্তমান

যে ক্রিয়া দিয়ে বর্তমান কালে বক্তার আদেশ, অনুমতি, অনুরোধ, প্রার্থনা, আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, অভিশাপ, উপদেশ, উপেক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞা বর্তমান কাল বলে। যেমন –

তাড়াতাড়ি কাজটি <u>করো</u>।
সকলের মঙ্গল <u>হোক</u>।

২. অতীত কাল

অতীতে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হতো তাকে অতীত কাল বলে। অতীত কাল চার প্রকার: সাধারণ অতীত, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত এবং নিত্য অতীত।

সাধারণ অতীত

অতীত কালে যে কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বোঝায়, তাকে সাধারণ অতীত কাল বলে। যেমন –

তারা সেখানে বেড়াতে গেল।
তখন বাতিটা জ্বলে উঠল।

ঘটমান অতীত

যে ক্রিয়া অতীত কালে চলছিল বোঝায়, তাকে ঘটমান অতীত কাল বলে। যেমন –

আমরা তখন বই পড়ছিলাম।
তারা মাঠে খেলছিল।

পুরাঘটিত অতীত

অতীতের যে ক্রিয়া বহু পূর্বেই ঘটে গেছে এবং পরে আরো কিছু ঘটনা ঘটেছে, তার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলে। যেমন –

বৃষ্টি শেষ হওয়ার আগেই আমরা বাড়ি পৌঁছেছিলাম।
খরবটা তুমি আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলে।

নিত্য অতীত

অতীত কালে প্রায়ই ঘটতো এমন বোঝালে নিত্য অতীত কাল হয়। যেমন –

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতাম।
তারা সাগরের তীরে ঝিনুক কুড়াত।

৩. ভবিষ্যৎ কাল

ভবিষ্যতে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হবে তাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার: সাধারণ ভবিষ্যৎ, ঘটমান ভবিষ্যৎ এবং অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ।

সাধারণ ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যৎ কালে যে কাজ সাধারণভাবে সম্পন্ন হবে বোঝায়, তাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন –

আমরা রংপুরে যাব।
দু-এক দিনের মধ্যে সে আসবে।

ঘটমান ভবিষ্যৎ

যে ক্রিয়া ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে বোঝায়, তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন –

আমাদের কাজ আমরা করতে থাকব।
এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে।

অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ

যে ক্রিয়া দিয়ে ভবিষ্যৎ কালের আদেশ, অনুমতি, অনুরোধ, প্রার্থনা, আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, উপদেশ, উপেক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন –

তাড়াতাড়ি কাজটি কোরো।
ভালোভাবে পৌঁছে যেয়ো।

ক্রিয়ার কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

অনেক সময়ে ক্রিয়াবিভক্তি যে কালের হয়, ঘটনা সেই কালের হয় না। এগুলো ক্রিয়ার কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ। নিচের বাক্য দুটির দিকে তাকানো যাক:

আমি গত বছর পরীক্ষা দিয়েছিলাম।
আমি গত বছর পরীক্ষা দিয়েছি।

প্রথম বাক্যে ক্রিয়ার কাল অতীত এবং ক্রিয়া ঘটার সময় অতীতের। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে ক্রিয়ার কাল বর্তমান কালের এবং ক্রিয়া ঘটার সময় অতীতের। দ্বিতীয় বাক্যটি কালের বিশিষ্ট প্রয়োগের নমুনা।

সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ:

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (ঘটনা অতীতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমান।)
সবাই যেন সভায় হাজির থাকে। (ঘটনা ভবিষ্যতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমান।)

ঘটমান বর্তমান কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ:

আগামী মাসে আমরা সিলেট যাচ্ছি। (ঘটনা ভবিষ্যতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমান।)

সাধারণ অতীত কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ:

শিকারি পাখিটিকে এইমাত্র গুলি করল। (ঘটনা পুরাঘটিত বর্তমানের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল অতীত।)
যদি বৃষ্টি হতো, সবাই মিলে খিচুড়ি খেতাম। (ঘটনা ভবিষ্যতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল অতীত।)

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ:

তোমরা হয়ত ছয় দফার কথা শুনে থাকবে। (ঘটনা অতীতের; কিন্তু কাল ভবিষ্যৎ।)

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কী বলে?
ক. ক্রিয়ার মূল খ. ক্রিয়ার স্থান গ. ক্রিয়ার কাল ঘ. ক্রিয়ার বিভক্তি

২. ঘটমান বর্তমান কালের উদাহরণ কোনটি?
ক. আমি রোজ স্কুলে যাই খ. আমি স্কুলে যাচ্ছি
গ. আমি স্কুলে এসেছি ঘ. আমরা স্কুলে এসেছি

৩. কোন কালে অনুজ্ঞা হয় না?
ক. বর্তমান কালে খ. ভবিষ্যৎ কালে
গ. অতীত কালে ঘ. ঘটমান ভবিষ্যৎ কালে

৪. কাজটি চলছে এখনও শেষ হয়নি, এমন বোঝাতে কোন বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়?
ক. সাধারণ বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান গ. পুরাঘটিত বর্তমান ঘ. অনুজ্ঞা বর্তমান

৫. "আমার আশীর্বাদ নিয়ো" – বাক্যটি কোন কালের?
ক. সাধারণ বর্তমান খ. অনুজ্ঞা বর্তমান গ. সাধারণ অতীত ঘ. নিত্য অতীত

৬. আজ বিকেলে যদি সুমন আসত, মজা হতো – বাক্যটির ক্রিয়া অতীতের কিন্তু ঘটনা কোন কালের?
ক. সাধারণ বর্তমান খ. ঘটমান বর্তমান গ. সাধারণ অতীত ঘ. সাধারণ ভবিষ্যৎ

৭. নিচের কোন বাক্যে ঘটনা অতীতের, কিন্তু ক্রিয়ার কাল সাধারণ বর্তমান কালের?
ক. আমি গত বছর পরীক্ষা দিয়েছি।
খ. সবাই যেন সভায় হাজির থাকে।
গ. গত বছর তিনি একুশে পদক পান।
ঘ. পরের সপ্তাহে আমরা বাড়ি যাচ্ছি।

পরিচ্ছেদ ৩১

বাক্যের অংশ ও শ্রেণিবিভাগ

এক বা একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত পূর্ণ অর্থবোধক ভাষিক একককে বাক্য বলে। বাক্য দিয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। যেমন – "সজল ও লতা বই পড়ে।" – এটি একটি বাক্য। পাঁচটি শব্দ দিয়ে গঠিত এই বাক্যে বক্তার মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশিত হয়েছে।

বাক্যের মধ্যে স্থান পাওয়া প্রত্যেকটি শব্দকে পদ বলে। এদিক দিয়ে পদ হলো বাক্যের একক। রূপতত্ত্ব অংশে শব্দশ্রেণি নামে বাক্যের এই পদ বিভাজনকে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপরের বাক্যের 'সজল', 'লতা' ও 'বই' হলো বিশেষ্য, 'ও' হলো যোজক এবং 'পড়ে' হলো ক্রিয়া।

বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দের গুচ্ছ অনেক সময়ে পদের মতো কাজ করে। তখন সেই একাধিক শব্দের গুচ্ছকে বর্গ বলা হয়। উপরের বাক্যে 'সজল ও লতা' একটি বর্গ।

সাধারণ বাক্যের প্রধান তিনটি অংশ: কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া। বাক্যের ক্রিয়াকে যে চালায়, সে হলো কর্তা। যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে বলে কর্ম। আর বাক্যের মধ্যে যে অংশ দিয়ে কোনো কিছু করা, ঘটা বা হওয়া বোঝায় তাকে বলে ক্রিয়া। উপরের বাক্যে 'সজল ও লতা' হলো কর্তা, 'বই' হলো কর্ম এবং 'পড়ে' হলো ক্রিয়া।

প্রতিটি বাক্যকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় – এই দুই অংশে ভাগ করা যায়। বাক্যের যে অংশে কারো সম্পর্কে বলা হয়, সেই অংশ হলো বাক্যের উদ্দেশ্য। এছাড়া বাক্যের যে অংশে উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা হয়, সেই অংশ হলো বাক্যের বিধেয়। উপরের বাক্যে 'সজল ও লতা' উদ্দেশ্য এবং 'বই পড়ে' বিধেয়।

গঠনগত দিক দিয়ে বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: সরল, জটিল ও যৌগিক।

(১) **সরল বাক্য:** একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকলে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন – জেসমিন সবার জন্য চা বানিয়েছে।

(২) **জটিল বাক্য:** একটি মূল বাক্যের অধীনে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে জটিল বাক্য তৈরি হয়। যেমন – যদি তোমার কিছু বলার থাকে, তবে এখনই বলে ফেলো।

(৩) **যৌগিক বাক্য:** এক বা একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যৌগিক বাক্য গঠন করে। যেমন – রহমত রাতে রুটি খায় আর রহিমা খায় ভাত।

বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকা-না থাকা বিবেচনায় বাক্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: সক্রিয় বাক্য ও অক্রিয় বাক্য।

(১) **সক্রিয় বাক্য:** যেসব বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকে, সেগুলোকে সক্রিয় বাক্য বলে। যেমন – আমার মা চাকরি করেন।

(২) **অক্রিয় বাক্য:** যেসব বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকে না, সেগুলোকে অক্রিয় বাক্য বলে। যেমন – তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। তবে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগে এগুলো সক্রিয় বাক্য হয়ে যায়। যেমন – 'তিনি বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন' বা 'তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হবেন'।

বক্তব্যের লক্ষ্য অনুযায়ী বাক্যকে বিবৃতিবাচক, নেতিবাচক, প্রশ্নবাচক, অনুজ্ঞাবাচক ও আবেগবাচক প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়:

(১) **বিবৃতিবাচক বাক্য:** সাধারণভাবে কোনো বিবরণ প্রকাশ পায় যেসব বাক্যে, সেগুলোকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। বিবৃতিবাচক বাক্য ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। যেমন –

আমরা রোজ বেড়াতে যেতাম।
তারা তোমাদের ভোলেনি।

(২) **প্রশ্নবাচক বাক্য:** বক্তা কারও কাছ থেকে কিছু জানার জন্য যে ধরনের বাক্য বলে, সেগুলো প্রশ্নবাচক বাক্য। যেমন –

তোমার নাম কী?
সুন্দরবনকে কোন ধরনের বনাঞ্চল বলা হয়?

(৩) **অনুজ্ঞাবাচক বাক্য:** আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝাতে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য হয়। যেমন –

আমাকে একটি কলম দাও।
তার মঙ্গল হোক।

(৪) **আবেগবাচক বাক্য:** কোনো কিছু দেখে বা শুনে অবাক হয়ে যে ধরনের বাক্য তৈরি হয়, তাকে আবেগবাচক বাক্য বলে। যেমন –

দারুণ! আমরা জিতে গিয়েছি।
অত উঁচু পাহাড়ে উঠে আমি তো ভয়েই মরি!

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. এক বা একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত পূর্ণ অর্থবোধক ভাষিক একককে কী বলে?
ক. বাক্য খ. বাক্যাংশ গ. উদ্দেশ্য ঘ. বিধেয়

২. বাক্যের মধ্যে স্থান পাওয়া প্রত্যেকটি শব্দকে কী বলা হয়?
ক. যোজক খ. বর্গ গ. ধ্বনি ঘ. পদ

৩. বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দের গুচ্ছকে কী বলে?
ক. বর্ণ খ. বর্গ গ. পদ ঘ. শব্দ

৪. বাক্যের ক্রিয়াকে যে চালায় তাকে বলে –
ক. কর্তা খ. কর্ম গ. ক্রিয়া ঘ. পদ

৫. "সজল স্কুলে যায়।" – বাক্যের উদ্দেশ্য –
ক. সজল খ. স্কুলে গ. যায় ঘ. স্কুলে যায়

৬. একটি মূল বাক্যের অধীনে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে তাকে কোন বাক্য বলে?
ক. সরল বাক্য খ. যৌগিক বাক্য গ. জটিল বাক্য ঘ. সক্রিয় বাক্য

৭. এক বা একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ যোজকের মাধ্যমে মিলে যে বাক্য হয় তাকে কী বাক্য বলে?
ক. সরল বাক্য খ. যৌগিক বাক্য গ. জটিল বাক্য ঘ. অক্রিয় বাক্য

৮. বাক্যের বিধেয় অংশে ক্রিয়া থাকা না থাকা বিবেচনায় বাক্যকে কতভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৯. কোনো কিছু দেখে বা শুনে অবাক বা বিস্মিত হলে কোন ধরনের বাক্য তৈরি হয়?
ক. নেতিবাচক বাক্য খ. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য গ. প্রশ্নবাচক বাক্য ঘ. আবেগবাচক বাক্য

পরিচ্ছেদ ৩২

বাক্যের বর্গ

বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্যাংশকে বর্গ বলে। বর্গ হলো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত শব্দের গুচ্ছ। বর্গকে বলা যায় বাক্যের একক, কেননা মানুষ কথা বলতে গিয়ে শব্দের পরে শব্দ না বসিয়ে প্রায়ই বর্গের পরে বর্গ বসায়। যেমন –

মালা ও মায়া খুব সকালে বাড়ির সামনে **থাকা স্কুল-বাসে উঠে পড়ল**।

এই বাক্যে 'মালা ও মায়া', 'খুব সকালে', 'বাড়ির সামনে থাকা', 'স্কুল-বাসে', 'উঠে পড়ল' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ এক একটি বর্গ।

কোনো একটি বর্গ বাক্যের মধ্যে যে পদের মতো আচরণ করে, সেই পদের নাম অনুযায়ী বর্গের নাম হয়। উপরের উদাহরণে 'মালা ও মায়া' ও 'স্কুল-বাসে' হলো বিশেষ্যবর্গ; 'বাড়ির সামনে থাকা' হলো বিশেষণবর্গ, 'খুব সকালে' ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ এবং 'উঠে পড়লো' হলো ক্রিয়াবর্গ।

নিচে বিভিন্ন ধরনের বর্গের পরিচয় দেওয়া হলোঃ

১. বিশেষ্যবর্গ

বিশেষ্যের আগে এক বা একাধিক বিশেষণ বা সম্বন্ধপদ যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বর্গ তৈরি হয়। যেমন –

অসুস্থ ছেলেটি আজ স্কুলে আসেনি।

আমার ভাই পড়তে বসেছে।

আবার, যোজক দ্বারা দুইটি বিশেষ্য যুক্ত হয়ে বিশেষ্যবর্গ তৈরি হয়। যেমন –

রহিম ও করিম বৃষ্টিতে ভিজছে।

২. বিশেষণবর্গ

বিশেষণজাতীয় শব্দের গুচ্ছকে বলা যায় বিশেষণবর্গ। যেমন –

আমটা দেখতে ভারী সুন্দর।

ভদ্রলোক সত্যিকারের নির্লোভ।

পোকায় খাওয়া কাঠ দিয়ে আসবাব বানানো ঠিক নয়।

৩. ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ

যে শব্দগুচ্ছ ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ বলে।

সকাল আটটার সময়ে সে রওনা হলো।

তারপর আমরা দশ নম্বর প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমি সকাল থেকে বসে আছি।
বেঁচে থাকার মতো সামান্য কয়টা টাকা বেতন পাই।
সে খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে।

৪. ক্রিয়াবর্গ

বাক্যের বিধেয় অংশের ক্রিয়া প্রায় ক্ষেত্রেই ক্রিয়াবর্গ তৈরি করে। যেমন –

অস্ত্রসহ সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে।
সে লিখছে আর হাসছে।
সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বসে পড়লো।
বাচ্চাটা অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করছে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বাক্যের মধ্যে একাধিক শব্দ দিয়ে গঠিত বাক্যাংশকে কী বলে?
ক. বর্গ খ. উদ্দেশ্য গ. বিধেয় ঘ. বাক্যাংশ

২. 'বর্গ' আসলে –
ক. বাক্যের বিন্যাস খ. ধ্বনিগুচ্ছ গ. বর্ণের সমষ্টি ঘ. শব্দের গুচ্ছ

৩. বর্গের নাম হয় –
ক. পদ অনুযায়ী খ. বাক্য অনুযায়ী গ. ধ্বনি অনুযায়ী ঘ. বর্ণ অনুযায়ী

৪. বিশেষ্যের আগে এক বা একাধিক বিশেষণ বা সম্বন্ধপদ যুক্ত হয়ে কোন বর্গ তৈরি হয়?
ক. বিশেষ্যবর্গ খ. বিশেষণবর্গ গ. ক্রিয়াবিশেষণবর্গ ঘ. ক্রিয়াবর্গ

৫. বিশেষণ জাতীয় শব্দের গুচ্ছকে বলে –
ক. বিশেষ্যবর্গ খ. ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ গ. বিশেষণবর্গ ঘ. ক্রিয়াবর্গ

৬. বিধেয় অংশের ক্রিয়া সাধারণত –
ক. বিশেষ্যবর্গ খ. বিশেষণবর্গ গ. ক্রিয়াবিশেষণ-বর্গ ঘ. ক্রিয়াবর্গ

পরিচ্ছেদ ৩৩

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

বাক্যকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় – এই দুই অংশে ভাগ করা যায়। বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন – 'সুমন বল খেলে।' এই বাক্যে সুমনকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হচ্ছে। অতএব 'সুমন' বাক্যটির উদ্দেশ্য। বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। বিধেয় অংশে সাধারণত ক্রিয়া থাকে। এখানে 'বল খেলে' অংশটি বাক্যের বিধেয়।

বাক্য দীর্ঘতর হলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশের সঙ্গে নানা ধরনের শব্দ ও বর্গ যুক্ত হতে পারে। উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে এইসব শব্দ ও বর্গ প্রসারিত করে বলে এগুলোর নাম প্রসারক। এছাড়া বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে বলা হয় পূরক। যেমন –

সেলিম সাহেবের ছেলে সুমন গাছতলায় বসে বই পড়ছে।

এখানে 'সুমন' উদ্দেশ্য, 'সেলিম সাহেবের ছেলে' উদ্দেশ্যের প্রসারক। অন্যদিকে 'পড়ছে' বিধেয়ের ক্রিয়া, 'গাছতলায় বসে' বিধেয়ের প্রসারক এবং 'বই' হলো বিধেয়ের পূরক।

তবে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের এই অবস্থান বদলে যেতে পারে। যেমন –

চিনি বা শর্করা এইসব মিলিয়ে তৈরি হয়।

এই বাক্যকে এভাবেও লেখা যেতে পারে –

এইসব মিলিয়ে তৈরি হয় চিনি বা শর্করা।

উপরের প্রথম বাক্যে উদ্দেশ্য 'চিনি বা শর্করা' প্রথমে বসেছে, বিধেয়ের প্রসারক 'এইসব মিলিয়ে' মাঝখানে বসেছে, এবং বিধেয় ক্রিয়া 'তৈরি হয়' শেষে বসেছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় বাক্যে উদ্দেশ্য 'চিনি বা শর্করা' শেষে বসেছে, বিধেয়ের প্রসারক 'এইসব মিলিয়ে' প্রথমে বসেছে, এবং বিধেয় ক্রিয়া 'তৈরি হয়' মাঝখানে বসেছে।

সাধারণত উদ্দেশ্যের পূর্বে উদ্দেশ্যের প্রসারক এবং বিধেয়ের পূর্বে বিধেয়ের প্রসারক বসে। তবে বিধেয়ের স্থান ও কাল সংক্রান্ত প্রসারক উদ্দেশ্যের পূর্বেও বসতে পারে। যেমন –

<u>১৯৫২ সালে</u> <u>ঢাকার রাজপথে</u> <u>বাঙালি জাতির অহংকার</u> <u>রফিক-সালাম-বরকত-জব্বার</u> <u>মাতৃভাষার জন্য</u> <u>জীবন</u> <u>উৎসর্গ করেছিলেন</u>।

এই বাক্যে উদ্দেশ্য হলো 'রফিক-সালাম-বরকত-জব্বার', উদ্দেশ্যের প্রসারক হলো 'বাঙালি জাতির অহংকার'। বিধেয় ক্রিয়া হলো 'উৎসর্গ করেছিলেন', বিধেয়ের পূরক হলো 'জীবন'। অন্যদিকে '১৯৫২ সালে', 'ঢাকার রাজপথে', এবং 'মাতৃভাষার জন্য' – এই তিনটি অংশ হলো বিধেয়ের প্রসারক।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বাক্যের দুই অংশ –

ক. উদ্দেশ্য ও কর্তা খ. বিধেয় ও কর্ম গ. উদ্দেশ্য ও বিধেয় ঘ. উদ্দেশ্য ও কর্ম

২. বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে কী বলে?

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয় গ. পূরক ঘ. প্রসারক

৩. বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে কী বলে?

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয় গ. পূরক ঘ. প্রসারক

৪. উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে প্রসারিত করা হয় যেসব শব্দ ও বর্গ দিয়ে, তাকে বলে –

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয় গ. পূরক ঘ. প্রসারক

৫. বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষ্য অংশকে বলে –

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয় গ. পূরক ঘ. প্রসারক

৬. বাংলা বাক্যে উদ্দেশ্য কোথায় বসে?

ক. বাক্যের শুরুতে খ. বাক্যের মাঝে গ. বাক্যের শেষে ঘ. যে কোনো জায়গায়

৭. 'এইসব মিলিয়ে তৈরি হয় চিনি বা শর্করা' – এখানে 'এইসব মিলিয়ে' বর্গ হলো –

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয় গ. উদ্দেশ্যের প্রসারক ঘ. বিধেয়ের প্রসারক

৮. বিধেয়ের স্থান ও কাল সংক্রান্ত প্রসারক বসতে পারে –

ক. উদ্দেশ্যের পূর্বে খ. বিধেয়ের পূর্বে

গ. উদ্দেশ্যের বা বিধেয়ের পরে ঘ. উদ্দেশ্যের বা বিধেয়ের পূর্বে

৯. মোঘল সম্রাট শাজাহান তাঁর ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাজমহল নির্মাণ করেন – এখানে মোঘল সম্রাট কী?

ক. উদ্দেশ্যের প্রসারক খ. বিধেয়ের প্রসারক গ. বিধেয়ের পূরক ঘ. বিধেয়ের ক্রিয়া

১০. 'যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, তাদের ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না' – এখানে ঋণ কী?

ক. উদ্দেশ্যের প্রসারক খ. বিধেয়ের প্রসারক গ. বিধেয়ের পূরক ঘ. বিধেয়ের ক্রিয়া

পরিচ্ছেদ ৩৪

সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য

গঠন-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলা বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: সরল বাক্য, জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য। নিচের বাক্যগুলো লক্ষ করা যাক:

আমি পড়াশোনা শেষ করে খেলতে যাব।
যখন আমার পড়াশোনা শেষ হবে, তখন আমি খেলতে যাব।
আমি পড়াশোনা শেষ করব; তারপর খেলতে যাব।

প্রথম বাক্যে একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া আছে। এটি সরল বাক্য। দ্বিতীয় বাক্যের দুটি অংশ 'যখন' ও 'তখন' যোজক দ্বারা যুক্ত হয়েছে। এটি জটিল বাক্যের উদাহরণ। তৃতীয় বাক্যে 'করব' ও 'যাব' দুটি সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে। এটি একটি যৌগিক বাক্য।

১. সরল বাক্য

যে বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন –

পাখিগুলো নীল আকাশে উড়ছে।
তিনি ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সরল বাক্যে অনেক সময়ে ক্রিয়া অনুপস্থিত থাকে। যেমন –

আমরা তিন ভাইবোন।

বাক্যের মধ্যে এক বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও সরল বাক্য হয়। যেমন –

তিনি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে পায়চারি করতে করতে বাজারের দিকে গেলেন ।

২. জটিল বাক্য

যে-সে, যারা-তারা, যিনি-তিনি, যাঁরা-তাঁরা, যা-তা প্রভৃতি সাপেক্ষ সর্বনাম এবং যদি-তবে, যদিও-তবু, যেহেতু-সেহেতু, যত-তত, যেটুকু-সেটুকু, যেমন-তেমন, যখন-তখন প্রভৃতি সাপেক্ষ যোজক দিয়ে যখন অধীন বাক্যগুলো যুক্ত থাকে, তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন –

যে ছেলেটি এখানে এসেছিল, সে আমার ভাই।
যদি তুমি যাও, তবে তার দেখা পাবে।
যখন বৃষ্টি নামল, তখন আমরা ছাতা খুঁজতে শুরু করলাম।

৩. যৌগিক বাক্য

দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্য যখন যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। এবং, ও, আর, অথবা, বা, কিংবা, কিন্তু, অথচ, সেজন্য, ফলে ইত্যাদি যোজক যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কমা (,), সেমিকোলন (;), কোলন (:), ড্যাশ (–) ইত্যাদি যতিচিহ্নও যোজকের কাজ করে। যেমন –

হামিদ বই পড়ছে, আর সীমা রান্না করছে।
সে ঘর ঝাড়ু দিল, ঘর মুছল, তারপর পড়তে বসল।
অন্ধকার হয়ে এসেছে – বন্ধুরাও মুখ ভার করে রইল।
তোমরা চেষ্টা করেছ, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওনি – এতে দোষের কিছু নেই।

বাক্যের রূপান্তর

বাক্যের মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের পারস্পরিক রূপান্তর করা সম্ভব।

ক. সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্য

যে-সে, যিনি-তিনি, যারা-তারা, যা-তা ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম এবং যদি-তবে, যেহেতু-সেহেতু, যখন-তখন, যত-তত, যেমন-তেমন ইত্যাদি সাপেক্ষ যোজক যুক্ত করে সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন –

সরল বাক্য: দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য।
জটিল বাক্য: যেসব লোক দুর্জন, তারা পরিত্যাজ্য।
সরল বাক্য: তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছ।
জটিল বাক্য: যেহেতু তুমি চেষ্টা করোনি, তাই ব্যর্থ হয়েছ।

খ. জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্য

জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তরের সময়ে সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজককে বাদ দিতে হয়। যেমন –

জটিল বাক্য: যারা পরিশ্রম করে, তারা জীবনে সফল হয়।
সরল বাক্য: পরিশ্রমীরা জীবনে সফল হয়।
জটিল বাক্য: যখন সে সুসংবাদটা পেল, তখন সে আনন্দিত হলো।
সরল বাক্য: সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হলো।

গ. সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য

যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এজন্য সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্য করতে সরল বাক্যের মাঝখানের অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করতে হয়। সরল বাক্যে একটিমাত্র ক্রিয়া থাকলে যৌগিক বাক্য গঠনের সময়ে আরেকটি ক্রিয়া তৈরি করে নিতে হয়। যেমন –

সরল বাক্য: তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছ।
যৌগিক বাক্য: তুমি চেষ্টা করোনি, তাই ব্যর্থ হয়েছ।
সরল বাক্য: ভিক্ষুককে টাকা দাও।
যৌগিক বাক্য: কিছু লোক ভিক্ষা করে, ওদের টাকা দাও।

ঘ. যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য

যৌগিক বাক্যে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে; অন্যদিকে সরল বাক্যে থাকে একটি সমাপিকা ক্রিয়া। তাই যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্যে রূপান্তরের সময়ে মাঝখানের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করে নিতে হয়। যেমন –

যৌগিক বাক্য: সে এখানে এল এবং সব কথা খুলে বলল।
সরল বাক্য: সে এখানে এসে সব কথা খুলে বলল।
যৌগিক বাক্য: লোকটি অশিক্ষিত, কিন্তু অভদ্র নয়।
সরল বাক্য: লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়।

ঙ. জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য

জটিল বাক্যের সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজক বাদ দিয়ে যৌগিক বাক্য তৈরি করতে হয়। যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। যেমন –

জটিল বাক্য: যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যৌগিক বাক্য: বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে।
জটিল বাক্য: যদি নিয়মিত সাঁতার কাটো, তবে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
যৌগিক বাক্য: নিয়মিত সাঁতার কাটো, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

চ. যৌগিক বাক্য থেকে জটিল বাক্য

যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করার সময়ে যৌগিক বাক্যের যোজক বাদ দিতে হয়। এর বদলে সাপেক্ষ সর্বনাম ও সাপেক্ষ যোজক যুক্ত হয়। যেমন –

যৌগিক বাক্য: ছেলেটির বয়স অল্প; কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান।
জটিল বাক্য: যদিও ছেলেটির বয়স অল্প, তবু বেশ বুদ্ধিমান।
যৌগিক বাক্য: দোষ করেছ; অতএব শাস্তি পাবে।
জটিল বাক্য: যেহেতু দোষ করেছ, সেহেতু শাস্তি পাবে।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. যে বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে কোন বাক্য বলে?
ক. সরল খ. যৌগিক গ. জটিল ঘ. অধীন

২. ‘তিনি ভাত খেয়ে চেয়ারে বসলেন’ – বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া কোনটি?
ক. ভাত খ. খেয়ে গ. চেয়ারে ঘ. বসলেন

৩. একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া কী দিয়ে যুক্ত হলে যৌগিক বাক্য হয়?
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ গ. যোজক ঘ. অনুসর্গ

৪. জটিল বাক্যের উদাহরণ কোনটি?
ক. যদি তুমি যাও, তবে তার দেখা পাবে।
খ. পাখিগুলো আকাশে উড়ছে।
গ. আমরা তিন ভাই এবং দুই বোন।
ঘ. আমার সমুদ্র দেখতে খুব ভাল লাগে।

৫. সময় বোঝাতে জটিল বাক্যে যোজকের কোন জোড় ব্যবহার করা হয়?
ক. যে-সে খ. যত-তত গ. যেটুকু-সেটুকু ঘ. যখন-তখন

৬. নিচের কোনটি সরল বাক্য?
ক. পরিশ্রমীরা জীবনে সাফল্য লাভ করে।
খ. সে এখানে এল এবং বসে পড়ল।
গ. লোকটি নিরক্ষর, কিন্তু অভদ্র নয়।
ঘ. বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে।

৭. 'দুর্জন লোক পরিত্যাজ্য' – বাক্যটিকে জটিল বাক্যে পরিণত করলে হবে –

ক. যেসব লোক দুর্জন, তারা পরিত্যাজ্য।

খ. যে দুর্জন সেই পরিত্যাজ্য।

গ. দুর্জন লোক মাত্রই পরিত্যাজ্য।

ঘ. দুর্জন লোককে সকলে পরিত্যাগ করে।

৮. 'সে এখানে এসেই বসে পড়ল' – বাক্যটির যৌগিক বাক্যরূপ কোনটি?

ক. সে এখানে এসে বসলো। খ. সে এখানে এসে বসে পড়ল।

গ. সে এখানে এসে বসেছে। ঘ. সে এখানে এল, তারপরে বসে পড়ল।

৯. 'যখন সে সুসংবাদ পেল, তখন সে আনন্দিত হলো' – বাক্যটির সরল বাক্যরূপ কোনটি?

ক. সে সুসংবাদ পেল এবং আনন্দিত হলো।

খ. সুসংবাদ পেয়ে সে আনন্দিত হলো।

গ. যেই সে সুসংবাদ পেল, সেই সে আনন্দিত হলো।

ঘ. যদি সুসংবাদ পাও, তবে আনন্দিত হও।

পরিচ্ছেদ ৩৫

কারক

মূলত ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্য ও সর্বনামের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে। কারক সম্পর্ক বোঝাতে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে সাধারণত বিভক্তি ও অনুসর্গ যুক্ত হয়ে থাকে।

কারক ছয় প্রকার: কর্তা কারক, কর্ম কারক, করণ কারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক ও সম্বন্ধ কারক।

কর্তা কারক

ক্রিয়া যার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাকে কর্তাকারক বলে। বাক্যের কর্তা বা উদ্দেশ্যই কর্তা কারক। কর্তা কারকে সাধারণত বিভক্তি যুক্ত হয় না। যেমন –

আমরা নদীর ঘাট থেকে রিকশা নিয়েছিলাম।
অনেকগুলো বন্য হাতি বাগান নষ্ট করে দিল।

কর্তা কারকে কখনো কখনো -এ বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন –

পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়।

কর্ম কারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্ম কারক বলে। বাক্যের মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম – উভয় ধরনের কর্মই কর্ম কারক হিসেবে গণ্য হয়। সাধারণত মুখ্য কর্ম কারকে বিভক্তি হয় না, তবে গৌণ কর্ম কারকে '-কে' বিভক্তি হয়। যেমন –

সে রোজ সকালে এক প্লেট ভাত খায়।
শিক্ষককে জানাও।
অসহায়কে সাহায্য করো।
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সমাজের নানা রকম অন্ধতা, গোঁড়ামি, ও কুসংস্কারকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে গেছেন।

কাব্যভাষায় কর্মকারকে 'রে' বিভক্তি হয়। যেমন –

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা।

করণ কারক

যার দ্বারা বা যে উপায়ে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণ কারক বলে। এই কারকে সাধারণত 'দ্বারা', 'দিয়ে', 'কর্তৃক' ইত্যাদি অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন –

ভেড়া দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয়।

চাষিরা ধারালো কাস্তে দিয়ে ধান কাটছে।

অপাদান কারক

যে কারকে ক্রিয়ার উৎস নির্দেশ করা হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। এই কারকে সাধারণত 'হতে', 'থেকে' ইত্যাদি অনুসর্গ শব্দের পরে বসে। যেমন –

জমি থেকে ফসল পাই।
কাপটা উঁচু টেবিল থেকে পড়ে ভেঙে গেল।

অধিকরণ কারক

যে কারকে স্থান, কাল, বিষয় ও ভাব নির্দেশিত হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। এই কারকে সাধারণত '-এ', '-য়', '-য়ে', '-তে' ইত্যাদি বিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন –

বাবা বাড়িতে আছেন।
বিকাল পাঁচটায় অফিস ছুটি হবে।
রাজীব বাংলা ব্যাকরণে ভালো।

সম্বন্ধ কারক

যে কারকে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের সম্পর্ক নির্দেশিত হয়, তাকে সম্বন্ধ কারক বলে। এই কারকে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পরোক্ষ। এই কারকে শব্দের সঙ্গে '-র', -এর', '-য়ের', '-কার', '-কের' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন –

ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না।
আমার জামার বোতামগুলো একটু অন্য রকম।
তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে চলতে হতো মাইলের পর মাইল।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে কোন পদের সম্পর্ককে কারক বলে?
ক. বিশেষ্য ও বিশেষণ খ. বিশেষ্য ও সর্বনাম
গ. বিশেষ্য ও অনুসর্গ ঘ. বিশেষণ ও আবেগ

২. ক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই, তেমন কারকের নাম কী?
ক. সম্বন্ধ খ. অপাদান গ. অধিকরণ ঘ. কর্তা

৩. বাংলা ভাষায় কারকের সংখ্যা কয়টি?
ক. তিন খ. চার গ. পাঁচ ঘ. ছয়

৪. 'আমরা নদীর ঘাট থেকে রিকশা নিয়েছিলাম' – বাক্যটিতে আমরা কোন কারক?
ক. কর্তা খ. কর্ম গ. করণ ঘ. অপাদান

৫. যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কোন কারক বলে?
ক. কর্তা খ. কর্ম গ. অধিকরণ ঘ. অপাদান

৬. 'শিক্ষককে জানাও' – এই বাক্যে 'শিক্ষককে' কোন কারক?
ক. অধিকরণ খ. অপাদান গ. কর্তা ঘ. কর্ম

৭. 'ভেড়া দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয়' – এই বাক্যে 'ভেড়া দিয়ে' কোন কারক?
ক. সম্বন্ধ খ. কর্ম গ. করণ ঘ. কর্তা

৮. 'জমি থেকে ফসল পাই' – বাক্যটিতে 'জমি থেকে' কোন কারক?
ক. করণ খ. কর্ম গ. অপাদান ঘ. অধিকরণ

৯. কোন কারকে মূলত ক্রিয়ার স্থান, সময় ইত্যাদি বোঝায়?
ক. অপাদান খ. অধিকরণ গ. সম্বন্ধ ঘ. কর্ম

১০. 'গাছের ফল পেকেছে' – এখানে কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে?
ক. -র খ. -এর গ. -য়ের ঘ. -এ

পরিচ্ছেদ ৩৬

বাচ্য

বাক্যের প্রকাশভঙ্গিকে বাচ্য বলে। বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার ভূমিকা বদলে গিয়ে একই বক্তব্যের প্রকাশভঙ্গি আলাদা হয়ে যায়। ক্রিয়া কখনো কর্তাকে অনুসরণ করে, ক্রিয়া কখনো কর্মকে অনুসরণ করে, আবার ক্রিয়াই কখনো বাক্যের মধ্যে মুখ্য হয়ে ওঠে। যেমন –

সে বাজারে যায়।
সাহসী ছেলেটিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।
কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

উপরের প্রথম বাক্যে 'যায়' ক্রিয়াটি 'সে' কর্তার অনুসারী। দ্বিতীয় বাক্যে 'করা হয়েছে' ক্রিয়াটি 'সাহসী ছেলেটিকে' কর্মের অনুসারী। তৃতীয় বাক্যে 'যাওয়া হচ্ছে' ক্রিয়াই মুখ্য। প্রকাশভঙ্গির এই ভিন্নতা অনুযায়ী বাচ্য তিন প্রকার: কর্তাবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

১. কর্তাবাচ্য

যে বাক্যের ক্রিয়া কর্তাকে অনুসরণ করে, তাকে কর্তাবাচ্য বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার রূপটি কর্তার পক্ষ অনুযায়ী হয়। যেমন –

ঝরনা ছবি আঁকে।
আমি আগামীকাল বাড়ি ফিরব।

অজীব বিশেষ্যও অনেক সময়ে কর্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন –

ফ্যানটা অনেক জোরে ঘুরছে।
শরতে শিউলি ফোটে।

২. কর্মবাচ্য

যে বাক্যের ক্রিয়া কর্মকে অনুসরণ করে, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন –

পুলিশ কর্তৃক ডাকাত ধৃত হয়েছে।
চিঠিটা পড়া হয়েছে।

৩. ভাববাচ্য

যে বাক্যের ক্রিয়া-বিশেষ্য বাক্যের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে ভাববাচ্য বলে। যেমন –

আমার যাওয়া হলো না।
কোথা থেকে আসা হলো।

এখানে 'যাওয়া', 'আসা' – এগুলো হলো ক্রিয়া-বিশেষ্য।

বাচ্য পরিবর্তন

বাচ্য পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. কর্তাবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য

কর্তাবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে কর্তার সঙ্গে দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক ইত্যাদি অনুসর্গ যোগ করতে হয় এবং ক্রিয়ারূপকে কর্মের অনুসারী করতে হয়। যেমন –

কর্তাবাচ্য: জাহানারা ইমাম *একাত্তরের দিনগুলি* রচনা করেছেন।

কর্মবাচ্য: জাহানারা ইমাম কর্তৃক *একাত্তরের দিনগুলি* রচিত হয়েছে।

কর্তাবাচ্য: তারা বাড়িটি তৈরি করেছে।

কর্মবাচ্য: তাদের দ্বারা বাড়িটি তৈরি হয়েছে।

২. কর্মবাচ্য থেকে কর্তাবাচ্য

কর্মবাচ্যের বাক্যকে কর্তাবাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে কর্তার সঙ্গে যুক্ত দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক প্রভৃতি অনুসর্গ বাদ দিতে হয় এবং ক্রিয়াকে কর্তার অনুসারী করতে হয়। যেমন –

কর্মবাচ্য: প্রধান শিক্ষক কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছে।

কর্তাবাচ্য: প্রধান শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন।

কর্মবাচ্য: আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

কর্তাবাচ্য: আমরা কঠোর পরিশ্রম করি।

৩. কর্তাবাচ্য থেকে ভাববাচ্য

কর্তাবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে একটি ক্রিয়াবিশেষ্যকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় নিয়ে আসতে হয়। যেমন –

কর্তাবাচ্য: তুমি কখন এলে?

ভাববাচ্য: কখন আসা হলো?

কর্তাবাচ্য: ওখানে কেন গেলে?

ভাববাচ্য: ওখানে কেন যাওয়া হলো?

৪. ভাববাচ্য থেকে কর্তাবাচ্য

ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তাবাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে ক্রিয়াকে কর্তার অনুসারী করতে হয়। যেমন –

ভাববাচ্য: একটু বাইরে বেড়িয়ে আসা যাক।

কর্তাবাচ্য: একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি।

ভাববাচ্য: এবার বাঁশিটি বাজানো হোক।

কর্তাবাচ্য: এবার বাঁশিটি বাজাও।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বাচ্য বলতে বোঝায় –

ক. বাক্যের অর্থ   খ. বাক্যের প্রকাশভঙ্গি   গ. বাক্যের ভাব   ঘ. বাক্যের প্রয়োগ

২. বাক্যের মধ্যে কিসের ভূমিকা বদলে গিয়ে একই বাক্যের প্রকাশভঙ্গি আলাদা হয়?

ক. যোজক   খ. অনুসর্গ   গ. আবেগ   ঘ. ক্রিয়া

৩. বাচ্য কত প্রকার?

ক. দুই   খ. তিন   গ. চার   ঘ. পাঁচ

৪. কর্তাবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে কোন পদকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়?

ক. বিশেষ্য   খ. বিশেষণ   গ. ক্রিয়া   ঘ. ক্রিয়া-বিশেষ্য

৫. 'আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়' কর্মবাচ্যের এই বাক্যটি কর্তাবাচ্যে কী হবে?

ক. আমরা কঠোর পরিশ্রম করি।

খ. আমার দ্বারা কঠোর পরিশ্রম হয়।

গ. আমাদের কঠোর পরিশ্রম করা লাগে।

ঘ. কঠোর পরিশ্রম আমাদের কাজ।

পরিচ্ছেদ ৩৭

উক্তি

বক্তার কথা উপস্থাপনের ধরনকে উক্তি বলে। উক্তি দুই প্রকার: প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি। যেমন –

ছেলেটি বলেছিল, "আজ আমি অনেক পড়েছি।" – এটি প্রত্যক্ষ উক্তি।

ছেলেটি বলেছিল যে, সেদিন সে অনেক পড়েছে। – এটি পরোক্ষ উক্তি।

যে উক্তিতে বক্তার কথা সরাসরি উদ্ধৃত করা হয়, তাকে বলে প্রত্যক্ষ উক্তি। আর যে উক্তিতে বক্তার কথা অন্যের দ্বারা বর্ণিত হয়, তাকে বলে পরোক্ষ উক্তি।

প্রত্যক্ষ উক্তি লেখার সময়ে উদ্ধারচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন –

রফিক হেসে বললো, "আমি আপনাকে লক্ষ করিনি।"

কালো চুলের মানুষটি বলল, "দশ পর্যন্ত গুনতে পারি। যোগ কী আমার ধারণা আছে। কিন্তু বিয়োগ করতে পারি না।"

উক্তি পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ উক্তির যেখান থেকে উদ্ধারচিহ্ন শুরু হয়, পরোক্ষ উক্তিতে সেখানে যোজক 'যে' বসে এবং উদ্ধারচিহ্ন উঠে যায়। যেমন –

প্রত্যক্ষ উক্তি: নেতা বললেন, "আমি জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে চাই।"

পরোক্ষ উক্তি: নেতা বললেন যে, তিনি জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে চান।

অর্থের সংগতি রাখার জন্য বাক্যে ব্যবহৃত সর্বনামের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। যেমন –

প্রত্যক্ষ উক্তি: রাজীব বললো, "আমি বাগান করা পছন্দ করি।"

পরোক্ষ উক্তি: রাজীব বললো যে, সে বাগান করা পছন্দ করে।

প্রত্যক্ষ উক্তি: মিহির বললো, "আমার জানামতে সবুজ এ বাসায় থাকে।"

পরোক্ষ উক্তি: মিহির বললো যে, তার জানামতে সবুজ সে বাসায় থাকতো।

পরোক্ষ উক্তিতে কর্তা অনুযায়ী ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন –

প্রত্যক্ষ উক্তি: লিপি বলল, "আমি এখনই বের হচ্ছি।"

পরোক্ষ উক্তি: লিপি বলল যে, সে তখনই বের হচ্ছে।

প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করার সময়ে কালবাচক ও স্থানবাচক শব্দের পরিবর্তন হয়। যেমন –

প্রত্যক্ষ উক্তি: লোকটি বললেন, "আমি আগামীকাল এখানে আবার আসব।"

পরোক্ষ উক্তি: লোকটি বললেন যে, তিনি পরদিন সেখানে আবার যাবেন।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়ার কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন –

প্রত্যক্ষ উক্তি: শিক্ষক বললেন, "চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।"
পরোক্ষ উক্তি: শিক্ষক বললেন যে, চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

প্রশ্ন, অনুজ্ঞা ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে ভাব অনুযায়ী ক্রিয়ার পরিবর্তন করতে হয়। যেমন –

প্রত্যক্ষ উক্তি: মা আমাকে বললেন, "তোমাদের স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি হবে কবে?"
পরোক্ষ উক্তি: মা আমার কাছে জানতে চাইলেন কবে আমাদের স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি হবে।
প্রত্যক্ষ উক্তি: লোকটি আমাকে বললেন, 'অনুগ্রহ করে আপনি সামনের আসনে বসুন।'
পরোক্ষ উক্তি: লোকটি আমাকে সামনের আসনে বসতে অনুরোধ করলেন।
প্রত্যক্ষ উক্তি: ছেলেটি বলে উঠলো, 'বাহ! কী সুন্দর বাড়ি।'
পরোক্ষ উক্তি: ছেলেটি আনন্দের সঙ্গে বললো যে, বাড়িটি খুব সুন্দর।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তনের সময়ে কী ধরনের শব্দের বদল হয়?
ক. কালবাচক খ. স্থানবাচক গ. ভাববাচক ঘ. কালবাচক ও স্থানবাচক

২. প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোন যতিচিহ্ন দিয়ে উক্তিকে আবদ্ধ করা হয়?
ক. সেমিকোলন খ. কোলন গ. ড্যাশ ঘ. উদ্ধারচিহ্ন

৩. অর্থের সংগতি রাখার জন্য উক্তি পরিবর্তনের সময়ে কোন পদের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়?
ক. সর্বনাম খ. বিশেষ্য গ. বিশেষণ ঘ. অনুসর্গ

৪. প্রত্যক্ষ উক্তিতে চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন হয় না –
ক. উদ্ধারচিহ্নের খ. ক্রিয়ার কালের গ. ভাব বিশেষ্যের ঘ. নামবিভক্তির

৫. পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন হয় কী অনুযায়ী?
ক. কর্তা খ. কর্ম গ. উদ্দেশ্য ঘ. বিধেয়

পরিচ্ছেদ ৩৮

যতিচিহ্ন

মুখের কথাকে লিখিত রূপ দেওয়ার সময়ে কম-বেশি থামা বোঝাতে যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে যতিচিহ্ন বলে। বক্তব্যকে স্পষ্ট করতেও কিছু চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যতিচিহ্নকে বিরামচিহ্ন বা বিরতিচিহ্নও বলা হয়।

বাংলা ভাষায় প্রচলিত যতিচিহ্নগুলো হলো: দাঁড়ি (।), কমা (,), সেমিকোলন (;), প্রশ্নচিহ্ন (?), বিস্ময়চিহ্ন (!), হাইফেন (-), ড্যাশ (—), কোলন (:), বিন্দু (.), ত্রিবিন্দু (...), উদ্ধারচিহ্ন (‘ - ’ , “ - ”), বন্ধনীচিহ্ন ((-)), ({-}), ([-]), বিকল্পচিহ্ন (/)।

১. দাঁড়ি (।)

দাঁড়ি সাধারণত বাক্যের সমাপ্তি নির্দেশ করে। যেমন –

প্রান্ত ফুটবল খেলা পছন্দ করে।
যথাযথ অনুসন্ধানের পর বলা যাবে কী ঘটেছিল।

২. কমা (,)

কমা সামান্য বিরতি নির্দেশ করে। শব্দ, বর্গ ও অধীন বাক্যকে আলাদা করতে কমার ব্যবহার হয়। যেমন –

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত – বাংলাদেশ এই ছয়টি ঋতুর দেশ।
নিবিড় অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম ও সময়নিষ্ঠ থাকলে সাফল্য আসবে।
সুজন, দেখ তো কে এসেছে।
কাল তুমি যাকে দেখেছ, তিনি আমার বাবা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “পাপকে ঠেকাবার জন্যে কিছু না করাই তো পাপ।”

৩. সেমিকোলন (;)

স্বাধীন অথচ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একাধিক বাক্যকে এক বাক্যে পরিণত করার কাজে অথবা একই ধরনের বর্গকে পাশাপাশি সাজাতে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন –

সোহাগ ক্রিকেট পছন্দ করে; আমি ফুটবল পছন্দ করি।
কোনো বইয়ের সমালোচনা করা সহজ; কিন্তু বই লেখা অত সহজ নয়।
তিনি পড়েছেন বিজ্ঞান; পেশা ব্যাংকার; আর নেশা সাহিত্যচর্চা।

৪. প্রশ্নচিহ্ন (?)

সাধারণত কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে প্রশ্নচিহ্ন বসে। যেমন –

তারা কখন এসেছে?

বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কী?

৫. বিস্ময়চিহ্ন (!)

সাধারণত বিস্ময়, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশের জন্য বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন –

মানে কী! সে আর চাকরি করবে না!

তার গানের কণ্ঠ দারুণ!

৬. হাইফেন (-)

বাক্যের মধ্যকার একাধিক পদকে সংযুক্ত করতে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন –

মা-বাবার কাছে সন্তানের গৌরব সবচেয়ে বড়ো গৌরব।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে।

৭. ড্যাশ (–)

সাধারণত দুটি বাক্যকে এক বাক্যে পরিণত করার কাজে এবং ব্যাখ্যাযোগ্য বাক্যাংশের আগে-পরে ড্যাশ ব্যবহৃত হয়। যেমন –

বাংলাদেশ দল জয়লাভ করেছে – বিজয়ের আনন্দে দেশের জনগণ উচ্ছ্বসিত।

ঐ লোকটি – যিনি গতকাল এসেছিলেন – তিনি আমার মামা।

৮. কোলন (:)

বাক্যের প্রথম অংশের কোনো উক্তিকে দ্বিতীয় অংশে ব্যাখ্যা করা এবং উদাহরণ উপস্থাপনের কাজে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন –

ভাষার দুটি রূপ: কথ্য ও লেখ্য।

সভার সিদ্ধান্ত হলো: প্রতি মাসে সব সদস্যকে দশ টাকা করে চাঁদা দিতে হবে।

৯. উদ্ধারচিহ্ন (‘ - ’), (“ - ”)

কোনো কিছু উদ্ধৃত করার কাজে উদ্ধারচিহ্নের ব্যবহার হয়। উদ্ধারচিহ্ন দুই রকম: একক ও দ্বৈত। যেমন –

‘সিরাজউদ্দৌলা’ একটি ঐতিহাসিক নাটক।

আমাদের কণ্ঠ শুনে প্রিয়ন্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এল, “ও আপনারা এসে গেছেন! বাসা চিনতে কোনো কষ্ট হয়নি তো?”

১০. বন্ধনী ( ), { }, [ ]

অতিরিক্ত তথ্য উপস্থাপন ও কালনির্দেশের ক্ষেত্রে বন্ধনীর ব্যবহার হয়। বন্ধনী তিন প্রকার: প্রথম বন্ধনী ( ), দ্বিতীয় বন্ধনী { } ও তৃতীয় বন্ধনী [ ]। যেমন –

তিনি বাংলা ভাষার বিবর্তন (চর্যাপদের সময় থেকে পরবর্তী) নিয়ে আলোচনা করবেন।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ‘বিদ্রোহী কবি’ হিসেবে পরিচিত।

১১. বিন্দু (.)

শব্দসংক্ষেপ, ক্রমনির্দেশ ইত্যাদি কাজে বিন্দু ব্যবহৃত হয়। যেমন –

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

ভাষার প্রধান উপাদান চারটি: ১. ধ্বনি, ২. শব্দ, ৩. বাক্য ও ৪. বাগর্থ।

১২. ত্রিবিন্দু (...)

কোনো অংশ বাদ দিতে চাইলে ত্রিবিন্দুর ব্যবহার হয়। যেমন –

তিনি রেগে গিয়ে বললেন, "তার মানে তুমি একটা ... ।"

আমাদের ঐক্য বাইরের। ... এ ঐক্য জড় অকর্মক, সজীব সকর্মক নয়।

১৩. বিকল্পচিহ্ন (/)

একটির বদলে অন্যটির সম্ভাবনা বোঝাতে বিকল্পচিহ্নের ব্যবহার হয়। যেমন –

শুদ্ধ/অশুদ্ধ চিহ্নিত করো।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. যতিচিহ্নের অপর নাম কী?

ক. বিরামচিহ্ন খ. বিরতিচিহ্ন গ. বিস্ময়চিহ্ন ঘ. ক ও খ উভয়ই

২. বাক্যের পূর্ণ সমাপ্তি বা পূর্ণ বিরতি নির্দেশ করতে কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?

ক. কমা খ. সেমিকোলন গ. বিকল্পচিহ্ন ঘ. দাঁড়ি

৩. শব্দ, বর্গ ও অধীন বাক্যকে আলাদা করতে ব্যবহৃত হয় –

ক. দাঁড়ি খ. কমা গ. সেমিকোলন ঘ. কোলন

৪. দুটি অধীন বাক্যের মধ্যে অর্থের ঘনিষ্ঠতা নির্দেশ করতে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?

ক. কমা খ. কোলন গ. সেমিকোলন ঘ. বিকল্পচিহ্ন

৫. প্রশ্ন বোঝাতে কোন যতিচিহ্নের ব্যবহার হয়?

ক. প্রশ্নচিহ্ন খ. বিস্ময়চিহ্ন গ. দাঁড়ি ঘ. উদ্ধারচিহ্ন

৬. শব্দসংক্ষেপ ও ক্রম নির্দেশ করতে কোন যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়?

ক. বিন্দু খ. ত্রিবিন্দু গ. বিকল্পচিহ্ন ঘ. কোলন

৭. লেখার সময়ে কোনো কথা অব্যক্ত রাখতে চাইলে কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহার করা হয়?

ক. বিন্দু খ. ত্রিবিন্দু গ. কমা ঘ. কোলন

পরিচ্ছেদ ৩৯

বাগর্থ

ভাষা ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য মনের ভাব প্রকাশ করা। মনের ভাব প্রকাশ করতে মানুষ শব্দ ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে। এগুলোর অর্থই মূলত বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সংযোগ ঘটায়। শব্দ ও শব্দগুচ্ছের অর্থকে বাগর্থ বলে।

অর্থের শ্রেণিবিভাগ

শব্দের অর্থ অন্তত দুই রকমের। কোথাও শব্দের গাঠনিক উপাদানগুলোর অর্থ প্রাধান্য পায়, আবার কোথাও গাঠনিক অর্থ ছাপিয়ে শব্দের ভিন্ন অর্থ তৈরি হয়। এই দুই ধরনের অর্থের নাম – বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ।

বাচ্যার্থ: একটি শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে যে ছবি বা বোধ জেগে ওঠে, সেটাই শব্দটির বাচ্যার্থ। অভিধানে অর্থ গ্রহণের বেলায় শব্দের বাচ্যার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। 'মাথা' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের যে ছবি মনে ভেসে ওঠে, তা-ই 'মাথা' শব্দের বাচ্যার্থ। বাচ্যার্থ হলো শব্দের মুখ্য অর্থ। এই অর্থকে আক্ষরিক অর্থও বলা হয়ে থাকে।

লক্ষ্যার্থ: একটি শব্দের বাচ্যার্থের বাইরেও আলাদা অর্থ তৈরি হতে পারে। এই আলাদা অর্থের নাম লক্ষ্যার্থ। যেমন: 'তিনি গ্রামের মাথা' – এখানে 'মাথা' শব্দ শোনার পরে শ্রোতার মনে শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের কোনো ছবি ভেসে ওঠে না, মাননীয় কোনো ব্যক্তির ছবি ভেসে ওঠে। লক্ষ্যার্থকে গৌণার্থ বা লাক্ষণিক অর্থ বলা হয়ে থাকে।

শব্দের অর্থ পরিবর্তন

ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় শব্দের অর্থ কখনো প্রসারিত হয়, কখনো সংকুচিত হয়; কখনো অর্থের উন্নতি ঘটে, কখনো অবনতি ঘটে; আবার শব্দ কখনো সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। অর্থের এসব পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

অর্থপ্রসার: একটি শব্দ পূর্বে যে অর্থ প্রকাশ করতো, তার থেকে আরো ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করলে বুঝতে হয় অর্থপ্রসার ঘটেছে। যেমন – 'অঞ্চল' শব্দের মূল অর্থ শাড়ির পাড়। অঞ্চল থেকে উদ্ভূত আঁচল শব্দটি এখনও তা

নির্দেশ করে। তবে অঞ্চল শব্দটি এখন শাড়ির পাড় নির্দেশের পাশাপাশি এলাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে 'বর্ষ' শব্দের পূর্ববর্তী অর্থ বর্ষাকাল, প্রসারিত অর্থ 'বছর' (ছয় ঋতু সংবলিত)।

অর্থসংকোচ: অর্থসংকোচের ফলে একটি শব্দের পূর্ববর্তী অর্থের ব্যাপ্তি কমে। যেমন এক সময়ে 'মৃগ' শব্দের দ্বারা সকল পশুকে বোঝানো হতো। এর উদাহরণ পাওয়া যায় 'মৃগয়া', 'মৃগরাজ' প্রভৃতি শব্দের অর্থে। শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে পশুশিকার ও পশুদের রাজা। কিন্তু অর্থ সংকোচনের ফলে 'মৃগ'র অর্থ দাঁড়িয়েছে কেবল হরিণ। আবার এক সময়ে 'অন্ন' বলতে বোঝানো হতো যে-কোনো খাদ্য (মিষ্টান্ন, পলান্ন)। কিন্তু এখন 'অন্ন' বলতে বোঝানো হয় ভাত।

অর্থের উন্নতি: একটি শব্দের অর্থ আগের চেয়ে ভালো অর্থ ধারণ করতে পারে। অর্থের এরূপ পরিবর্তনকে বলা হয় অর্থের উন্নতি। যেমন 'অপরূপ' শব্দটি পূর্বে নির্দেশ করত শ্রীহীনতাকে, এখন এটি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যকে নির্দেশ করে। কিংবা 'সাহস' শব্দের পূর্বতন অর্থ চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি কাজ কিন্তু বর্তমান অর্থ নির্ভীকতা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উদ্যম।

অর্থের অবনতি: ইতিবাচক অর্থের শব্দ নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হওয়াকে অর্থের অবনতি বলে। যেমন, দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ ছিল মিলন (দ্বন্দ্ব সমাস), এখন এর অর্থ বিরোধ। কিংবা 'জেঠামি' শব্দটি জেঠা-সংশ্লিষ্ট হয়ে সম্মানিত বোঝাতে পারত। কিন্তু তা ব্যবহৃত হয় 'পাকামি' অর্থে বা হেয়-অর্থে 'জ্যাঠার ভাব' বোঝাতে। বাংলাদেশে 'রাজাকার' শব্দটি এভাবে নেতিবাচক অর্থ লাভ করেছে।

অর্থ-বদল: অর্থের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে কখনো শব্দের অর্থটি এমন দূরবর্তী হয়ে ওঠে যে, তা থেকে শব্দটির মূল অর্থ উদ্ঘাটন করা কঠিন হয়ে পড়ে। 'পাষণ্ড' শব্দের অর্থ ছিল ধর্মসম্প্রদায়। তবে পরিবর্তিত হয়ে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে ধর্মদ্রোহী উৎপীড়ক কিংবা নিষ্ঠুর। আবার 'গবাক্ষ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গরুর চোখ। এখন 'গবাক্ষ' শব্দের অর্থ হয়েছে জানালা।

বাক্যে অর্থ পরিবর্তন

শব্দের অর্থগত পরিবর্তন কেবল রূপমূলের অর্থের মধ্যে সীমিত থাকে না। বাক্যে প্রয়োগভেদে শব্দের নানারকম অর্থ-বৈচিত্র্য তৈরি হতে পারে। তাছাড়া এমনিতেও একটি শব্দের দ্বি-অর্থবাচকতা বা বহু-অর্থবাচকতা থাকতে পারে। এমনকি বাকভঙ্গির কারণে অর্থ-ভিন্নতা পাওয়া যায়।

উদাহরণ:

১. (ক) সে মাথায় আঘাত পেয়েছে।
(খ) তিনি আমাদের গ্রামের মাথা।
(গ) সে রাস্তার মাথায় অপেক্ষা করছে।
(ঘ) আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে মাথায় তুলেছ!

২. (ক) সে আমাদের রক্ষাকর্তা।
(খ) হ্যাঁহ্, সে আমাদের রক্ষাকর্তা বটে!

দাগ-অঙ্কিত শব্দগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, উদাহরণ ১-এ 'মাথা' শব্দটি বাক্যের প্রেক্ষাপটে নানা রকম অর্থ তৈরি করেছে। উদাহরণ ২-এ বাকভঙ্গির কারণে এক বাক্যই ভিন্ন অর্থ উৎপাদন করছে। আসলে শব্দের অর্থ-বৈচিত্র্যের ব্যাপারটিকে সূত্র বা নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. একটি শব্দ শোনার সাথে সাথে আমাদের মনে যে ছবি বা বোধ জেগে ওঠে তাকে কী বলে?
ক. শব্দার্থ খ. লক্ষ্যার্থ গ. বাচ্যার্থ ঘ. বাগর্থ

২. 'বাচ্যার্থ' শব্দের কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ করে?
ক. মুখ্য খ. গৌণ গ. প্রত্যক্ষ ঘ. পরোক্ষ

৩. বক্তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাচ্যার্থকে উপেক্ষা করে শব্দের আলাদা অর্থ তৈরি করলে, তা হয় –
ক. লক্ষ্যার্থ খ. আক্ষরিক অর্থ গ. গাঠনিক অর্থ ঘ. বাগর্থ

৪. অঞ্চল শব্দটি শাড়ির পাড় না বুঝিয়ে এলাকা বোঝালে অর্থের কী ধরনের পরিবর্তন হয়?
ক. অর্থপ্রসার খ. অর্থসংকোচ গ. অর্থের উন্নতি ঘ. অর্থের অবনতি

৫. মৃগয়া শব্দের দ্বারা হরিণ বোঝালে অর্থের কী ধরনের পরিবর্তন হয়?
ক. অর্থপ্রসার খ. অর্থসংকোচ গ. অর্থ-বদল ঘ. অর্থের উন্নতি

পরিচ্ছেদ ৪০

বাগ্‌ধারা

বাক্যের বর্গ যখন বাচ্যার্থ বা আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে বাগ্‌ধারা বলে। বাগ্‌ধারার প্রয়োগে ভাষা প্রাণবন্ত হয় এবং বাক্য অধিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে। বাগ্‌ধারা যেহেতু আক্ষরিক অর্থ ধারণ করে না, সেহেতু বাগ্‌ধারা ঠিক কী অর্থ প্রকাশ করে ভাষা-ব্যবহারকারীকে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হয়। বাগ্‌ধারা এক অর্থে অতীত কালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার স্মারক।

নিচে প্রচলিত কিছু বাগ্‌ধারার প্রয়োগ-উদাহরণ দেওয়া হলো।

অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া): খারাপ লোকটা আরো আগেই অক্কা পেতে পারত।

অক্ষরে অক্ষরে (যথাযথ): দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চাই।

অদৃষ্টের পরিহাস (ভাগ্যের খেলা): যানজট অদৃষ্টের পরিহাস নয়, মানুষেরই তৈরি।

অনধিকার চর্চা (অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ): অনধিকার চর্চা তার রোগ, সব কিছুতেই কথা বলা চাই।

অন্ধকার দেখা (দিশেহারা হয়ে পড়া): কাজের চাপে চারদিকে অন্ধকার দেখছি।

অন্ধের যষ্টি (একমাত্র অবলম্বন): ছেলেটাই ছিল বিধবার অন্ধের যষ্টি।

অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ বস্তু): তোমার দেখাই পাই না আজকাল, একেবারে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলে!

অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল অনুনয়): কৃপণ লোকের কাছে কিছু চাওয়া আর অরণ্যে রোদন করা একই কথা।

অর্ধচন্দ্র (ঘাড় ধাক্কা দেয়া): চাইলাম চাঁদা, পেলাম অর্ধচন্দ্র!

আঁতে ঘা (খুব কষ্ট): তোমার প্রতিবেদনে ওইসব লোকের আঁতে ঘা লেগেছে।

আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা): অল্প বিনিয়োগে বেশি লাভের আশা! আকাশ কুসুম চিন্তা ছাড়া কিছু নয়।

আগুন নিয়ে খেলা (বিপজ্জনক ঘটনার আশঙ্কা তৈরি করা): তুমি আমার সাথে আগুন নিয়ে খেলতে এসো না।

আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়োলোক হওয়া): আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে তো, তাই কথাবার্তার ধরন বদলে গেছে।

আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রিতা): সাত দিনের মধ্যে ও করবে এই কাজ! ওর তো আঠারো মাসে বছর।

আদা-জল খেয়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা): এতদিন কাজটা ফেলে রেখেছিলে, এবার আদা-জল খেয়ে লেগে দেখো শেষ করতে পারো কিনা।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ): তার মতো আমড়া কাঠের ঢেঁকি লাখে একটা মেলে।

আষাঢ়ে গল্প (আজগুবি গল্প): বর্ষাকালে আষাঢ়ে গল্প না হলে কি আসর জমে?

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ব): ইঁচড়ে পাকা ছেলেমেয়েদের দিয়ে এমন কাজ করানো কঠিন।

ইতর বিশেষ (পার্থক্য): দুজনের কাজের মাঝে অনেক ইতর বিশেষ আছে।

উড়নচণ্ডী (বেহিসেবি): যেমন উড়নচণ্ডী মেয়ে তেমন উড়নচণ্ডী জামাই।

উড়ে এসে জুড়ে বসা (অপ্রত্যাশিতভাবে জায়গা দখল করা): উড়ে এসে জুড়ে বসা লোকের মুখে অনধিকার চর্চার উপদেশ মানায় না।

উড়োকথা (গুজব): উড়োকথায় কান দিয়ো না।

উড়োচিঠি (বেনামি চিঠি): এমন উড়োচিঠির উপর ভিত্তি করে তদন্ত করা ঠিক হবে না।

উত্তম-মধ্যম (বেদম প্রহার): সব চোরের কপালেই উত্তম-মধ্যম লেখা থাকে, তা থেকে রেহাই নেই।

উনিশ-বিশ (সামান্য পার্থক্য): বইটির প্রথম সংস্করণ আর দ্বিতীয় সংস্করণে পার্থক্য উনিশ-বিশ।

এককথার মানুষ (দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তি): আমি এককথার মানুষ; বলেছি যখন, করেই দেখাব।

এক ঢিলে দুই পাখি (এক প্রচেষ্টায় দুই ফল): বুঝেছি, তুমি এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাও।

এলাহি কাণ্ড (বিরাট আয়োজন): এমন এলাহি কাণ্ড করে বসেছ! অথচ কিনা সামান্য জন্মদিনের অনুষ্ঠান।

এসপার ওসপার (চূড়ান্ত মীমাংসা): আজ ওর সঙ্গে এসপার ওসপার করে তবেই ঘরে ফিরব।

ওজন বুঝে চলা (আত্মসম্মান রক্ষা করা): নিজের ওজন বুঝে চললে এরকম সম্মানহানি হতো না।

কচুকাটা করা (ধ্বংস করা): ওর সাথে লাগতে যেও না, কচুকাটা করে ছাড়বে।

কড়ায় গন্ডায় (চুলচেরা হিসাব): হিসাবের খাতায় সব লিখে রেখেছি, সময়মতো কড়ায় গন্ডায় আদায় করা যাবে।

কথার কথা (গুরুত্বহীন কথা): এটা একেবারেই কথার কথা, মানতেই হবে এমন নয়।

কপাল ফেরা (সৌভাগ্য লাভ): বহু কাল দুঃখে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত তার কপাল ফিরল।

কলমের এক খোঁচা (লিখিত আদেশ): কলমের এক খোঁচায় দুর্বৃত্তদের চাকরি চলে গেল।

কলুর বলদ (একটানা খাটুনি): মা সারাজীবন সংসারে কলুর বলদের মতো খেটেই গেলেন।

কাঁচা পয়সা (নগদ উপার্জন): উঠতি ধনীদের কাঁচা পয়সার গরমে বাজারে সব কিছুর দাম বাড়ছে।

কাগজে কলমে (লিখিতভাবে): কাগজে-কলমে সব প্রমাণ রয়েছে।

কাছাঢিলা (অসাবধান): এমন কাছাঢিলা লোক দিয়ে দারোয়ানের কাজ হবে না।

কাঠখোট্টা (নীরস ও অনমনীয়): এমন কাঠখোট্টা লোককে দিয়ে রাজনীতি হয় না।

কানকাটা (নির্লজ্জ): তার মতো কানকাটা লোক এমন মিষ্টি গালিতে অপমান বোধ করে না।

কান খাড়া করা (ওত পেতে থাকা): সাবধানে কথা বলো, আশেপাশে কেউ হয়তো কান খাড়া করে আছে।

কান ভাঙানো (কুপরামর্শ): ও নিশ্চয় আমার নামে কান ভাঙিয়েছে! আর তুমিও তা বিশ্বাস করে বসে আছ।

কিস্তিমাত করা (সফলতা লাভ): সবচেয়ে বড়ো পুরস্কারটা পেয়ে সে একেবারে কিস্তিমাত করেছে।

কুয়োর ব্যাঙ (সংকীর্ণমনা লোক): ও রকম কুয়োর ব্যাঙ দিয়ে নতুন কিছু করা যাবে না।

কৈ মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে না): শত প্রতিকূল পরিবেশেও এরা কৈ মাছের প্রাণ হয়ে বাঁচে।

কোমর বাঁধা (দৃঢ় সংকল্প): কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়ো, সফলতা আসবেই।

খয়ের খাঁ (চাটুকার): খয়ের খাঁ থেকে একটু সাবধান থেকো।

খেজুরে আলাপ (অকাজের কথা): কাজের সময়ে খেজুরে আলাপ করতে ভালো লাগে না।

গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ): গড্ডলিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে পথ চলতে শেখো।

গভীর জলের মাছ (খুব চালাক): ওর মতো গভীর জলের মাছকে নাগালে আনা কঠিন।

গরম গরম (তৎক্ষণাৎ): সাংবাদিকরা গরম গরম খবর পেলে খুব খুশি হয়।

গা ঢাকা দেওয়া (পলায়ন করা): কোম্পানির টাকা আত্মসাৎ করে এখন সে গা ঢাকা দিয়েছে।

গায়ে পড়া (অযাচিত): গায়ে পড়ে কোনো কাজ করতে যেও না বাপু।

গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো (ফাঁকির মনোভাব): গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো যার স্বভাব, তাকেও দলে রাখতে হলো।

গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য): ঝড়ের কারণে আম ব্যবসায়ীদের লাভের আশা এবার গুড়ে বালি।

গোঁফ খেঁজুরে (খুব অলস): গোঁফ খেঁজুরে লোককে দিয়ে এসব কাজ হবে না।

গোড়ায় গলদ (শুরুতেই ভুল): গোড়ায় গলদ করলে হিসাব মিলবে কী করে?

গোল্লায় যাওয়া (নষ্ট হওয়া): সৎ সঙ্গে মিশলে গোল্লায় যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া (মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা): দাপ্তরিক কাজে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যেয়ো না, বিপদে পড়বে।

ঘোড়ার ডিম (কিছুই না): আস্ফালন কোরো না, তুমি আমার ঘোড়ার ডিম করতে পারবে।

চশমখোর (বেহায়া): এমন চশমখোর লোকের সাথে আমি মিশি না।

চিনির বলদের মতো ঘানি টানা (ফল লাভে অংশীদার না হওয়া): সারাজীবন চিনির বলদের মতো ঘানি টানলে, বিনিময়ে কিছুই পেলে না।

চিনে জোঁক (নাছোড়বান্দা): লোকটি এ কাজ পাওয়ার জন্য একেবারে চিনে জোঁকের মতো লেগে আছে।

চুনোপুঁটি (সামান্য ব্যক্তি): সকলকে চুনোপুঁটি ভেবে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

চুলোয় যাওয়া (নষ্ট হওয়া): ছোট্ট একটা ভুলের জন্য এমন পরিশ্রমের কাজটা শেষ পর্যন্ত চুলোয় গেল।

চোখ পাকানো (রাগ দেখানো): আমার দিকে এমন চোখ পাকানোর কারণ কী?

চোখ বুঁজে থাকা (ভূমিকা না রাখা): প্রতিবেশীর বিপদে চোখ বুঁজে থাকতে নেই।

চোখে সরষে ফুল দেখা (বিপদে দিশেহারা হওয়া): পরীক্ষা সামনে, তাই চোখে সরষে ফুল তো দেখবেই।

ছা-পোষা (অত্যন্ত গরিব): ছা-পোষা লোক আমি, দেশ নিয়ে ভাবার সময় কোথায়?

ছেলের হাতের মোয়া (সহজলভ্য): সবকিছু ছেলের হাতের মোয়া ভেবো না।

জগাখিচুড়ি (বিশৃঙ্খল): সবকিছু জগাখিচুড়ি করে রেখেছ দেখছি!

জিলাপির প্যাঁচ (কূটবুদ্ধি): বাইরে থেকে দেখতে সরল হলেও লোকটির অন্তরে জিলাপির প্যাঁচ।

ঝোপ বুঝে কোপ মারা (অবস্থা বুঝে সুযোগ গ্রহণ): তিনি ঝোপ বুঝে কোপ মেরে সফল হয়েছেন।

টইটম্বুর (ভরপুর): বৃষ্টির পানিতে পুকুরটা একেবারে টইটম্বুর হয়ে আছে।

টনক নড়া (সজাগ হওয়া): আগে কথা বললে না, এতক্ষণে তোমার টনক নড়ল?

টাকার গরম (বিত্তের অহংকার): সব সময়ে টাকার গরম দেখানো ঠিক নয়।

ঠোঁট কাটা (বেহায়া): আজকাল ঠোঁটকাটা লোকের অভাব নেই।

ডান হাতের ব্যাপার (খাওয়া): আগে ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে নেই, পরে অন্য কথা।

ডুব মারা (পালিয়ে যাওয়া): যেই আমি বিপদে পড়লাম, অমনি তোমরা সবাই ডুব মারলে।

ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু): তুমি দেখি একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ!

তালকানা (কাণ্ডজ্ঞানহীন): এমন তালকানা লোকের সাথে চলা যায় না।

তালপাতার সেপাই (ছিপছিপে): শরীরের প্রতি যত্ন নাও, দিন দিন তুমি তো তালপাতার সেপাই হয়ে যাচ্ছ।

তাসের ঘর (স্বল্পস্থায়ী): বাবার চাকরি যাওয়ায় মায়ের সব স্বপ্ন তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল।

তিলকে তাল করা (ছোটোকে বড়ো করা): তিলকে তাল করা ওর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

তীর্থের কাক (সুযোগ সন্ধানী): শরণার্থীরা রিলিফের চালের জন্য তীর্থের কাকের মতো বসে আছে।

তেল মাখানো (তোশামোদ): সাহেবকে তেল মাখানোর লোকের অভাব নেই।

থতমত খাওয়া (অপ্রস্তুত হয়ে পড়া): ক্লাসে হঠাৎ নতুন শিক্ষক দেখে সবাই থতমত খেয়ে গেলাম।

দা-কুমড়া সম্পর্ক (শত্রুতা): বাপ-চাচাদের দা-কুমড়া সম্পর্ক এখন চাচাতো ভাইদের মধ্যে টিকে আছে।

দিবাস্বপ্ন (অলীক কল্পনা): দিবাস্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে না এমন লোক মেলা ভার।

দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু): সুযোগসন্ধানীরা সব সময়ে দুধের মাছির মতো ক্ষমতার আশপাশে ঘোরে।

ধরাকে সরা জ্ঞান (অহংকার করা): তুমি ধরাকে সরা জ্ঞান করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছ!

ননীর পুতুল (শ্রমবিমুখ): ছেলেটাকে একেবারে ননীর পুতুল বানিয়ে রেখেছে, কোনো কাজ করতে দেয় না।

নয়-ছয় (অপব্যবহার): তুমি নয়-ছয় করে টাকাগুলো শেষ কোরো না।

পটল তোলা (মারা যাওয়া): আজ বাদে কাল পটল তুলবে, অথচ তার মিথ্যাচার গেল না।

পুঁটি মাছের প্রাণ (ছোটো মন): পুঁটি মাছের প্রাণ নিয়ে নেতা হওয়া যায় না।

বইয়ের পোকা (সব সময়ে বই পড়ে এমন): পরিচিত লোকদের কাছে বইয়ের পোকা হিসেবে তার নাম আছে।

বর্ণচোরা (ভণ্ড): বর্ণচোরা লোকেরা খুব সহজেই অন্যদের বিপদে ফেলে।

বাঘের দুধ (অসম্ভব বস্তু): টাকায় কী না হয়? বাঘের দুধ মেলে।

বিনা মেঘে বজ্রপাত (অপ্রত্যাশিত বিপদ): সন্তানের মৃত্যুসংবাদ তার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো।

বুদ্ধির ঢেঁকি (নির্বোধ): তোমার বিবেচনার বলিহারি, অমন বুদ্ধির ঢেঁকির কাছে গেছ বুদ্ধি নিতে!

ভরাডুবি (সর্বনাশ): ব্যাবসা তো ভালোই গুছিয়েছিলে, এমন ভরাডুবি হলো কীভাবে?

ভিজে বিড়াল (কপট ব্যক্তি): সাবধান, আমাদের চারদিকে ভিজে বিড়ালের অভাব নেই।

ভিটায় ঘুঘু চরানো (নিঃস্ব করা): ও হুমকি দিয়ে বলেছে, আমার ভিটায় নাকি ঘুঘু চরাবে।

ভুঁইফোঁড় (নতুন আগমন): ভুঁইফোঁড় সাংবাদিকদের কারণে প্রকৃত সাংবাদিকের সম্মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

মগের মুল্লুক (অরাজকতা): দেশ তো আর মগের মুল্লুক হয়ে যায়নি যে, এমন দুর্নীতি করে পার পেয়ে যাবে।

মণিকাঞ্চন যোগ (উপযুক্ত মিলন): যেমন বর তেমন কনে – এ যেন মণিকাঞ্চন যোগ।

মানিক জোড় (গভীর সম্পর্ক): সহকর্মীদের এমন মানিক জোড় খুব কমই দেখা যায়।

লেফাফা দুরস্ত (বাইরে পরিপাটি): লোকটি লেফাফা দুরস্ত হলে কী হবে, আসলে মূর্খ।

সপ্তমে চড়া (প্রচণ্ড উত্তেজনা): এসব দুর্নীতি দেখে তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল।

সোনায় সোহাগা (উপযুক্ত মিলন): বর-কনেকে খুব সুন্দর মানিয়েছে, এ যেন সোনায় সোহাগা।

২০২৫

হাতটান (চুরির অভ্যাস): লোকটির হাতটানের অভ্যাস আছে, সাবধানে থেকো।
হাতেখড়ি (শিক্ষার শুরু): ওস্তাদ রবিউল ইসলামের কাছে তাঁর সংগীত চর্চার হাতেখড়ি হয়।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. বাক্যের বর্গ যখন বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে কী বলে?
ক. প্রত্যয় খ. বাগ্‌ধারা গ. সমাস ঘ. কারক

২. কী প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষা প্রাণবন্ত ও বাক্য অধিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে?
ক. বাগ্‌ধারা খ. প্রত্যয় গ. কারক ঘ. সমাস

৩. বাগ্‌ধারা ব্যবহারের সময়ে ভাষা ব্যবহারকারীকে কোন বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়?
ক. শব্দ খ. অর্থ গ. প্রয়োগ ঘ. বর্গ

৪. বাগ্‌ধারা অতীত কালের কোন ঘটনার স্মারক?
ক. সামাজিক-অর্থনৈতিক খ. সামাজিক-রাজনৈতিক
গ. সামাজিক-মানসিক ঘ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক

৫. নিচের কোনটি ‘অন্ধের যষ্টি’ অর্থ প্রকাশ করছে?
ক. ভাগ্যের খেলা খ. দুর্লভ বস্তু
গ. অসম্ভব কল্পনা ঘ. একমাত্র অবলম্বন

৬. ‘দৃঢ় সংকল্প’ অর্থ কোন বাগ্‌ধারার মধ্যে রয়েছে?
ক. একচোখা খ. এক কথার মানুষ
গ. উড়নচণ্ডী ঘ. কংস মামা

৭. নীচের কোন অর্থটি ‘কৈ মাছের প্রাণ’ বাগ্‌ধারার সঠিক অর্থ প্রকাশ করে?
ক. সংকীর্ণমনা লোক খ. খুব অলস
গ. খুব চালাক ঘ. যা সহজে মরে না

৮. ‘পটল তোলা’-এর সমার্থক বাগ্‌ধারা কোনটি?
ক. অক্কা পাওয়া খ. তালকানা
গ. ডুব মারা ঘ. ভরাডুবি

পরিচ্ছেদ ৪১
প্রতিশব্দ

যেসব শব্দের অর্থ অভিন্ন বা প্রায় সমান, সেসব শব্দকে প্রতিশব্দ বলে। যেমন 'ঘর' শব্দের প্রতিশব্দ 'গৃহ', 'নির্বাচন' শব্দের প্রতিশব্দ 'বাছাই', 'কথা' শব্দের প্রতিশব্দ 'বাণী' ইত্যাদি। বাক্যের প্রকাশকে সাবলীল ও বাক্যের অর্থকে সুস্পষ্ট করতে যথাযথ প্রতিশব্দ খুঁজে নিতে হয়। প্রতিশব্দ সব সময়ে প্রতিস্থাপনযোগ্য না-ও হতে পারে – প্রসঙ্গের উপরে প্রতিশব্দের ব্যবহার নির্ভর করে। যেমন 'গৃহহীন'-কে 'ভবনহীন' বলা যায় না, 'নির্বাচন কমিশন'-কে 'বাছাই কমিশন' বলা যায় না, কিংবা বক্তার মুখে 'কথার খই ফোটে' বলা গেলেও 'বাণীর খই ফোটে' বলা যায় না।

নিচে কিছু শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া হলো।

অকস্মাৎ : আচমকা, হঠাৎ, সহসা, অতর্কিত, দৈবাৎ।

অকাল : অসময়, অবেলা, দুর্দিন, অশুভ সময়, কুক্ষণ, দুঃসময়।

অক্ষয় : চিরন্তন, ক্ষয়হীন, অশেষ, অনন্ত, অনিঃশেষ, অন্তহীন, অন্তবিহীন, অবিনাশী।

অতিথি : মেহমান, অভ্যাগত, আগন্তুক, নিমন্ত্রিত, আমন্ত্রিত, কুটুম।

অদ্ভুত : উদ্ভট, আজব, আজগুবি, তাজ্জব, বিস্ময়কর, আশ্চর্য, অভিনব, অস্বাভাবিক।

অনেক : বেশি, বহু, প্রচুর, প্রভূত, পর্যাপ্ত, অধিক, অত্যন্ত, অতিশয়, অতিরিক্ত, অত্যধিক, বাড়তি, দেদার।

অন্ধকার : আঁধার, তিমির, তমসা।

অবকাশ : সময়, ফুরসত, অবসর, ছুটি, সুযোগ।

অভাব : অনটন, দারিদ্র্য, দৈন্য, দীনতা, দুরবস্থা, গরিবি, অসচ্ছলতা, অপ্রাচুর্য।

অলস : আলসে, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কর্মা, অকর্মা, শ্রমকাতর, অকেজো, অকর্মণ্য, শ্রমবিমুখ, নিরুদ্যম, জড়প্রকৃতি।

অশ্ব : ঘোড়া, ঘোটক, হয়, তুরগ, তুরঙ্গম।

আইন : বিধান, কানুন, ধারা, নিয়ম।

আকাশ : গগন, আসমান, খ, অম্বর, ব্যোম, নভ, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, নীলিমা।

আগুন : অগ্নি, অনল, বহ্নি, পাবক, হুতাশন।

আনন্দ : খুশি, আমোদ, মজা, পুলক, হর্ষ, আহ্লাদ, স্ফূর্তি, সন্তোষ, পরিতোষ, প্রমোদ, উল্লাস, উচ্ছ্বাস।

ইচ্ছা : আকাঙ্ক্ষা, আশা, অভিলাষ, প্রার্থনা, চাওয়া, স্পৃহা, অভিপ্রায়, সাধ, অভিরুচি, প্রবৃত্তি, মনোরথ, ঈপ্সা, অভীপ্সা, বাসনা, কামনা, বাঞ্ছা।

উত্তম : শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ, ভালো, উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট, সেরা, অতুলনীয়, প্রধান।

একতা : ঐক্য, মিলন, একত্ব, অভেদ, অভিন্নতা।

কঠিন : শক্ত, দৃঢ়, কঠোর, কড়া, জটিল, রুক্ষ।

কথা : উক্তি, বাক্য, বচন, কথন, বাণী, ভাষণ, বিবৃতি, জবান, বুলি, বোল, বাক।

কন্যা : মেয়ে, দুহিতা, আত্মজা, নন্দিনী, তনয়া, পুত্রী, ঝি।

কপাল : ললাট, বরাত, ভাল, অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি, নসিব।

কবুতর : কপোত, পায়রা, পারাবত, নোটন।

কষ্ট : যন্ত্রণা, দুঃখ, ক্লেশ, আয়াস, পরিশ্রম, মেহনত।

কান : কর্ণ, শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রবণেন্দ্রিয়।

কান্না : ক্রন্দন, কাঁদা, রোদন, অশ্রুপাত।

কিরণ : রশ্মি, শিখা, আলোকচ্ছটা, কর, প্রভা, দীপ্তি, জ্যোতি, অংশু।

কুল : বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, জাত, বর্ণ।

কূল : তীর, তট, বেলাভূমি, সৈকত, ধার, বালুকাবেলা, কিনারা, পুলিন, পাড়।

খবর : সংবাদ, বার্তা, তথ্য, সমাচার, বিবরণ, সন্ধান, বৃত্তান্ত, খোঁজখবর।

খাদ্য : খাবার, খানা, ভোজ্য, ভক্ষ্য, আহার্য, অন্ন, রসদ।

খারাপ : মন্দ, নিকৃষ্ট, দুষ্ট, নষ্ট, অভদ্র, অশ্লীল।

খোঁজ : সন্ধান, অন্বেষণ, অনুসন্ধান, খোঁজা, তালাশ।

গভীর : অগাধ, অতল, গহন, প্রগাঢ়, নিবিড়।

গৃহ : বাড়ি, ঘর, আলয়, ভবন, নিলয়, নিকেতন, সদন, আগার, আবাস, বাটি, কুটির।

চাঁদ : চন্দ্র, শশী, শশধর, শশাঙ্ক, বিধু, সোম, নিশাকর, সুধাংশু, সুধাকর, ইন্দু, সিতাংশু, হিমাংশু, মৃগাঙ্ক।

চুল : কেশ, অলক, চিকুর, কুন্তল, কবরী।

চোখ : চক্ষু, নয়ন, আঁখি, অক্ষি, নেত্র, লোচন।

জন্ম : উৎপত্তি, উদ্ভব, সৃষ্টি, ভূমিষ্ঠ, জনম, আবির্ভাব।

ঝড় : ঝঞ্ঝা, তুফান, সাইক্লোন, ঝটিকা, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়।

ঝোঁক : টান, প্রবণতা, আকর্ষণ।

ঠিক : যথাযথ, সত্য, সঠিক, যথার্থ, উপযুক্ত, নির্ভুল, ন্যায্য, ভালো।

ঠাট্টা : বিদ্রুপ, শ্লেষ, মশকরা, উপহাস, রসিকতা।

ঢেউ : তরঙ্গ, কল্লোল, ঊর্মি, বীচি, হিল্লোল, লহরী।

তৃষ্ণা : পিপাসা, তিয়াসা, তেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা।

তৈরি : গঠন, নির্মাণ, গড়া, বানানো, প্রস্তুত।

দয়া : অনুগ্রহ, করুণা, কৃপা, অনুকম্পা, মায়া।

দলিল : নথি, চুক্তিপত্র, কাগজপত্র, পাট্টা, দস্তাবেজ।

দিন : দিবস, দিবা, অহ, অহ্ন, বার, রোজ, বাসর, অষ্টপ্রহর।

দেহ : শরীর, গা, গাত্র, বপু, তনু, অঙ্গ, অবয়ব, কাঠামো, আকৃতি।

নতুন : নবীন, আনকোরা, আধুনিক, অধুনা, অর্বাচীন।

নদী : নদ, গাঙ, স্রোতস্বিনী, তটিনী, প্রবাহিনী, নির্ঝরিণী, কল্লোলিনী।

নারী : মানবী, মহিলা, স্ত্রী, স্ত্রীলোক, মেয়ে, ললনা, অঙ্গনা, বনিতা।

নিত্য : সতত, সর্বদা, প্রত্যহ, নিয়মিত, চির, চিরস্থায়ী, অক্ষয়, অনন্ত, রোজ।

পদ্ম : কমল, উৎপল, পঙ্কজ, কুমুদ, কুবলয়, শতদল, অরবিন্দ, রাজীব, নলিনী, সরোজ।

পর্বত : পাহাড়, অদ্রি, ভূধর, গিরি, শৈল, অচল।

পাখি : পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গ, খগ, খেচর, চিড়িয়া, পাখপাখালি।

পাথর : পাষাণ, প্রস্তর, শিলা, উপল, অশ্ম, কঙ্কর।

পানি : জল, সলিল, নীর, পয়ঃ, বারি, অপ, উদক, জীবন, অম্বু।

পুত্র : ছেলে, আত্মজ, নন্দন, দুলাল, সুত, তনয়, খোকা, কুমার।

পৃথিবী : জগৎ, ভুবন, সংসার, বিশ্ব, ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, বসুমতী, বসুন্ধরা, পৃথ্বী, দুনিয়া, ভূ, ভূমণ্ডল, মর্ত্য, বসুধা, অবনী, মহী, মেদিনী, ক্ষিতি।

বন : অরণ্য, জঙ্গল, কানন, বনানী, বনবাদাড়, কুঞ্জ, কান্তার, বিপিন, অটবী।

বাতাস : বায়ু, হাওয়া, পবন, সমীর, সমীরণ, অনিল, মরুৎ, প্রভঞ্জন।

বিদ্যুৎ : তড়িৎ, বিজলি, বিজুরি, অশনি, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, দামিনী, চপলা।

বিবাহ : বিয়ে, পরিণয়, পাণিগ্রহণ, উদ্বাহ, নিকা, শাদি।

বৃক্ষ : গাছ, তরু, দ্রুম, শাখী, পাদপ, মহীরুহ, উদ্ভিদ।

ব্যবধান : ফাঁক, ছিদ্র, অন্তর, তফাত, ভেদ, পার্থক্য।

মন : অন্তর, দিল, পরান, চিত্ত, হৃদয়, অন্তঃকরণ, প্রাণ, অন্তরাত্মা।

মা : জননী, মাতা, মাতৃ, মাতৃকা, আম্মা, গর্ভধারিণী, জন্মদাত্রী, প্রসূতি।

মৃত্যু : মরণ, ইন্তেকাল, বিনাশ, নিপাত, পরলোকগমন, লোকান্তর, চিরবিদায়, দেহত্যাগ, শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ, ইহলীলা-সংবরণ, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

মেঘ : জলদ, জলধর, নীরদ, বারিদ, ঘন, জীমূত, অভ্র, অম্বুবাহ।

যুদ্ধ : লড়াই, সংঘর্ষ, সংগ্রাম, সমর, যুদ্ধবিগ্রহ, রণ, সংঘাত।

রাজা : নৃপতি, নৃপ, সম্রাট, বাদশাহ্, নৃপেন্দ্র, নরপতি, ভূপতি, ভূপাল।

রাত : রাত্রি, রজনী, নিশি, নিশা, নিশীথ, নিশীথিনী, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী।

রানি : মহিষী, সম্রাজ্ঞী, বেগম, রাজ্ঞী, রাজপত্নী।

সমুদ্র : সাগর, সিন্ধু, সায়র, দরিয়া, জলধি, অকূল, পাথার, বারিধি, রত্নাকর, নীলাম্বু, পয়োধি, বারীন্দ্র, অর্ণব, পারাবার।

সাপ : সর্প, অহি, ফণী, নাগ, ভুজগ, ভুজঙ্গ, আশীবিষ, উরগ, বিষধর, পন্নগ।

সিংহ : কেশরী, পশুরাজ, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ।

সুন্দর : মনোরম, মনোহর, শোভন, সুদৃশ, চারু, রমণীয়, রম্য, কমনীয়, কান্তিমান, লাবণ্যময়, সুদর্শন, ললিত।

সূর্য : রবি, তপন, ভানু, ভাস্কর, আদিত্য, সবিতা, প্রভাকর, দিবাকর, বিভাবসু, দিনমণি, মার্তণ্ড, অংশুমালী, অরুণ।

স্ত্রী : পত্নী, ভার্যা, সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী, দারা, জায়া, বধূ, বউ, বিবি, বেগম, গৃহিণী।

স্বর্ণ : সোনা, সুবর্ণ, কাঞ্চন, কনক, হিরণ, হিরণ্য, হেম।

স্বামী : পতি, কান্ত, নাথ, বল্লভ, দয়িত।

হাত : হস্ত, কর, বাহু, ভুজ, পাণি।

হাতি : গজ, হস্তী, করী, দ্বিপ, বারণ, মাতঙ্গ, কুঞ্জর, দন্তী, দ্বিরদ, পিল।

হীন : নীচ, অধম, নিন্দনীয়, অবনত, গরিব, অক্ষম, শূন্য, ক্ষীণ।

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১ প্রতিশব্দ কী ?
ক. অভিন্ন শব্দ খ. ভিন্ন শব্দ গ. ভিন্নার্থক শব্দ ঘ. বিপরীত শব্দ

২. 'আইন' শব্দের প্রতিশব্দ নয় কোনটি?
ক. কানুন খ. নিয়ম গ. বিধান ঘ. শশী

৩. একটি শব্দের অনুরূপ, অবিকল ও নিকটবর্তী অর্থ প্রকাশকে কী বলে?
ক. প্রতিশব্দ খ. ভিন্নার্থক শব্দ গ. বিপরীত শব্দ ঘ. সমোচ্চারিত শব্দ

৪. নিচের কোনটি 'গৃহ' শব্দের প্রতিশব্দ নয়?
ক. নয়ন খ. আলয় গ. ঘর ঘ. বাড়ি

৫. 'পৃথিবী' শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ কোনটি?
ক. অবনী খ. জননী গ. নীর ঘ. জীবন

৬. আদিত্য, সবিতা, রবি, দিবাকর ইত্যাদি কোন শব্দের প্রতিশব্দ?
ক. অর্ণব খ. সূর্য গ. নৃপ ঘ. গিরি

পরিচ্ছেদ ৪২

বিপরীত শব্দ

যেসব শব্দ পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে বিপরীত শব্দ বলে। বিপরীত শব্দ একে অন্যের পরিপূরক। যেমন, বিবাহিত–অবিবাহিত; পুরুষ–নারী; জীবিত–মৃত; পিতা–মাতা ইত্যাদি। এসব শব্দযুগলের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোর একটিকে অস্বীকার করার মানে অন্যটিকে স্বীকার করে নেওয়া। যদি কারো সম্পর্কে বলা হয় তিনি 'বিবাহিত', তবে বোঝায় যে তিনি 'অবিবাহিত' নন। আবার যদি বলা হয় তিনি 'অবিবাহিত', তবে বোঝায় তিনি 'বিবাহিত' নন।

শব্দের পূর্বে অ, অন, অনা, অপ, অব, অবি, দূর, না, নি, নির প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত করে বিপরীত শব্দ তৈরি করা যায়। যেমন – চেনা থেকে অচেনা; আদর থেকে অনাদর; নশ্বর থেকে অবিনশ্বর। তবে এমন বহু শব্দ রয়েছে যেগুলোর বিপরীত শব্দ গঠনগতভাবে আলাদা। যেমন – ধনী-গরিব, আদি-অন্ত, নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি।

নিচে কিছু শব্দ এবং তার বিপরীত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ
অচল	সচল
অজ্ঞ	বিজ্ঞ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
অধম	উত্তম
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ
অনুকূল	প্রতিকূল
অনুরক্ত	বিরক্ত
অনুরাগ	বিরাগ
অন্তর	বাহির
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ
অপ্রতিভ	সপ্রতিভ
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ
অর্থ	অনর্থ
অল্প	অধিক
অস্তি	নাস্তি
আকর্ষণ	বিকর্ষণ
আচার	অনাচার

শব্দ	বিপরীত শব্দ
আত্মীয়	অনাত্মীয়
আদান	প্রদান
আপন	পর
আবশ্যক	অনাবশ্যক
আবির্ভাব	তিরোভাব
আমদানি	রপ্তানি
আয়	ব্যয়
আশা	নিরাশা
আশু	বিলম্ব
আস্তিক	নাস্তিক
আস্থা	অনাস্থা
ইস্তফা	যোগদান
ইহলোক	পরলোক
ইহা	উহা
উচ্চ	নীচ
উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উৎকণ্ঠা	শান্তি
উৎসাহ	নিরুৎসাহ

শব্দ	বিপরীত শব্দ
উত্তর	দক্ষিণ
উত্থান	পতন
উদয়	অস্ত
উদ্দিষ্ট	নিরুদ্দিষ্ট
উন্নতি	অবনতি
উপসর্গ	অনুসর্গ
উপস্থিত	অনুপস্থিত
উপশম	বৃদ্ধি
ঊর্ধ্ব	অধ
এলোমেলো	গোছানো
ওস্তাদ	সাগরেদ
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ
কৃত্রিম	স্বাভাবিক
কৃপণ	উদার
কেজো	অকেজো
কোমল	কর্কশ
খাঁটি	ভেজাল

খাতক	মহাজন
খানিক	অধিক
খুঁত	নিখুঁত
খুচরা	পাইকারি
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
গূঢ়	ব্যক্ত
গৃহী	সন্ন্যাসী
গ্রহণ	বর্জন
ঘাটতি	বাড়তি
ঘাত	প্রতিঘাত
ঘাতক	পালক
চেতন	অচেতন
জড়	চেতন
জয়	পরাজয়
জাগরণ	নিদ্রা
জোয়ার	ভাটা
জ্ঞানী	মূর্খ
জ্ঞেয়	অজ্ঞেয়
জ্বলন	নির্বাপণ
টাটকা	বাসি
ঠকা	জেতা
তফাত	কাছে
তিরস্কার	পুরস্কার
তেজী	নিস্তেজ
ত্বরিত	শ্লথ
দাতা	গ্রহীতা
দীর্ঘ	হ্রস্ব
দুর্মতি	সুমতি
দুষ্ট	শিষ্ট
দূর	নিকট
দোষী	নির্দোষ
ধনী	দরিদ্র
ধর্ম	অধর্ম
ধৃষ্ট	নম্র
নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট
নিদ্রিত	জাগ্রত
নিন্দা	প্রশংসা
পণ্ড	সফল
পথ	বিপথ

পাপী	নিষ্পাপ
পুষ্ট	ক্ষীণ
পূর্ব	পশ্চিম
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
প্রফুল্ল	বিমর্ষ
প্রবল	দুর্বল
প্রভু	ভৃত্য
প্রখরতা	স্নিগ্ধতা
প্রাচী	প্রতীচী
প্রাচ্য	প্রতীচ্য
বন্ধন	মুক্তি
বলবান	দুর্বল
বাউণ্ডুলে	সংসারী
বাচাল	স্বল্পভাষী
বাদী	বিবাদী
বিচ্ছেদ	সন্ধি
বিশেষ	সামান্য
ব্যর্থ	সার্থক
ভয়	সাহস
ভর্ৎসনা	প্রশংসা
ভিতর	বাহির
ভিতু	সাহসী
ভীরু	নির্ভীক
ভূত	ভবিষ্যৎ
ভোঁতা	ধারালো
মান	অপমান
মিলন	বিরহ
মুখ্য	গৌণ
মৃদু	প্রবল
মৌন	মুখর
যাচিত	অযাচিত
যুক্ত	বিযুক্ত
রত	বিরত
রদ	চালু
রসিক	বেরসিক
রিক্ত	পূর্ণ
রুগ্‌ণ	সুস্থ
রোগ	নীরোগ
লঘু	গুরু

লাভ	ক্ষতি
লেজ	মাথা
শিষ্ট	অশিষ্ট
শীঘ্র	বিলম্ব
সওয়াল	জবাব
সংহত	বিভক্ত
সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট
সজীব	নির্জীব
সঞ্চয়	অপচয়
সদয়	নির্দয়
সদ্ভাব	বিরোধ
সমস্ত	অংশ
সম্বল	নিঃসম্বল
সরব	নীরব
সরস	নীরস
সাকার	নিরাকার
সাচ্চা	ভুয়া
সার্থক	ব্যর্থ
সুকৃত	দুষ্কৃত
সুন্দর	কুৎসিত
সুবহ	দুর্বহ
সুরভি	নিন্দা
সুলভ	দুর্লভ
সুশীল	দুঃশীল
সুশ্রী	বিশ্রী
সৃষ্টি	ধ্বংস
স্থাবর	অস্থাবর
স্থির	চঞ্চল
স্বনামে	বেনামে
স্ববাস	প্রবাস
স্বমত	পরমত
স্মৃতি	বিস্মৃতি
হক	নাহক
হরণ	পূরণ
হরদম	হঠাৎ
হার	জিত
হাল	সাবেক
হালকা	ভারী
হ্রাস	বৃদ্ধি

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. সাধারণত কতটি শব্দ পরস্পর বিপরীত শব্দ হয়?
ক. একটি খ. দুটি গ. তিনটি ঘ. চারটি

২. বিপরীত শব্দ একে অন্যের কী?
ক. সমার্থক খ. পরিপূরক গ. ভিন্নার্থক ঘ. সদার্থক

৩. 'হ্রাস' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. বৃদ্ধি খ. বর্ধন গ. বেশি ঘ. অনেক

৪. 'অতিবৃষ্টি' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. ভারী বৃষ্টি খ. খুব বৃষ্টি গ. অল্প বৃষ্টি ঘ. অনাবৃষ্টি

৫. নিচের কোনটি 'ভূত' শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে?
ক. ভালো খ. পেতনি গ. ভবিষ্যৎ ঘ. ভীরু

৬. 'ভাটা' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. তেজ খ. জোয়ার গ. স্থাবর ঘ. ভারী

৭. 'চেতন' শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে নিচের কোন শব্দটি?
ক. সচেতন খ. অচেতন গ. অবচেতন ঘ. অসচেতন

পরিচ্ছেদ ৪৩

শব্দজোড়

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর উচ্চারণ এক অথবা প্রায় এক, কিন্তু অর্থ ভিন্ন; এমন যুগল শব্দকে শব্দজোড় বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের বানান ভিন্ন হয়, তবে উচ্চারণ এক হওয়ায় কানে শুনে এদের পার্থক্য করা যায় না। বাক্যে ব্যবহৃত হলে প্রসঙ্গ বিবেচনায় এসব শব্দের পার্থক্য বোঝা যায়।

নিচে কিছু শব্দজোড়ের উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

অকুল – নীচ বংশ **অকূল** – তীরহীন	**অবিহিত** – অন্যায় **অভিহিত** – কথিত	**ইস্ত্রি** – ধোপার যন্ত্র **স্ত্রী** – পত্নী
অণু – ক্ষুদ্রতম অংশ **অনু** – পশ্চাৎ	**অর্ঘ** – দাম **অর্ঘ্য** – পূজার উপকরণ	**উদ্যত** – প্রবৃত্ত **উদ্ধত** – অবিনীত
অনিষ্ট – ক্ষতি **অনিষ্ঠ** – নিষ্ঠাহীন	**অশক্ত** – অক্ষম **অসক্ত** – নির্লিপ্ত	**উপাদান** – উপকরণ **উপাধান** – বালিশ
অন্ত্য – শেষ **অন্তঃ** – ভিতর	**অশ্ব** – ঘোড়া **অশ্ম** – পাথর	**ওষধি** – একবার ফলা গাছ **ঔষধি** – ভেষজ উদ্ভিদ
অন্ন – ভাত **অন্য** – অপর	**আঁশ** – তন্তু **আঁষ** – আমিষ	**ওষ্ঠ** – ওপরের ঠোঁট **ওষ্ঠ্য** – ঠোঁট সম্পর্কিত
অন্যান্য – অপরাপর **অনন্য** – একক	**আদা** – মসলাবিশেষ **আধা** – অর্ধেক	**কটি** – কোমর **কোটি** – শত লক্ষ
অপচয় – ক্ষতি **অবচয়** – চয়ন	**আপণ** – দোকান **আপন** – নিজ	**কড়া** – আংটা **করা** – কৃত
অপত্য – সন্তান **অপথ্য** – যা পথ্য নয়	**আবরণ** – আচ্ছাদন **আভরণ** – অলংকার	**কতক** – কিছু **কথক** – বক্তা
অবগত – জানা **অপগত** – দূরীভূত	**আবৃতি** – আবরণ **আবৃত্তি** – কবিতাপাঠ	**কপাল** – ললাট **কপোল** – গাল
অবদান – কীর্তি **অবধান** – মনোযোগ	**আভাস** – ইঙ্গিত **আবাস** – বাসস্থান	**কমল** – পদ্ম **কোমল** – নরম
অবিনীত – উদ্ধত **অভিনীত** – অভিনয় করা	**আশা** – আকাঙ্ক্ষা **আসা** – আগমন	**করী** – হাতি **কড়ি** – অর্থ
অবিরাম – অনবরত **অভিরাম** – সুন্দর	**আসক্তি** – অনুরাগ **আসত্তি** – নৈকট্য	**কাঁচা** – অপক্ব **কাচা** – ধোয়া

কাঁচি – কাস্তে
কাছি – মোটা দড়ি

কাঁটা – কণ্টক
কাটা – কর্তন

কাঁদা – ক্রন্দন
কাদা – পাঁক

কাক – পাখিবিশেষ
কাঁখ – কাঁখাল

কি – ক্রিয়াবিশেষণ
কী – বিশেষণ/সর্বনাম

কিল – মুষ্টির আঘাত
কীল – খিল

কুজন – খারাপ লোক
কূজন – পাখির ডাক

কুট – পর্বত
কূট – জটিল

কুল – বংশ
কূল – তীর

কৃত – যা করা হয়েছে
ক্রীত – কেনা

কৃতজ্ঞ – উপকার স্বীকারকারী
কৃতঘ্ন – উপকারীর ক্ষতিকারী

কৃতি – কাজ
কৃতী – কর্মকুশল

ক্রোড় – কোল
ক্রোর – কোটি

খড় – তৃণ
খর – তীব্র

খদ্দর – কাপড়
খদ্দের – গ্রাহক

খরা – রৌদ্র
ক্ষরা – ক্ষরণ

খুর – পশুর পায়ের অংশ
ক্ষুর – কামানোর অস্ত্র

গর্ব – অহংকার
গর্ভ – পেট

গা – শরীর
গাঁ – গ্রাম

গাথা – কাহিনি
গাঁথা – গ্রন্থন

গাধা – গর্দভ
গাঁদা – ফুলবিশেষ

গোড়া – মূল অংশ
গোঁড়া – রক্ষণশীল

ঘড়া – বড় কলসি
গড়া – তৈরি করা

ঘর – বাসগৃহ
গড় – তৈরি করা

ঘোড়া – অশ্ব
ঘোরা – ঘূর্ণন

চড় – চপেটাঘাত
চর – ভূমিবিশেষ

চারা – ছোটো গাছ
চাড়া – জেগে ওঠা

চির – দীর্ঘ
চীর – ছিন্নবস্ত্র

চুর – নেশাগ্রস্ত
চূর – চূর্ণ

চূত – আম
চ্যুত – স্খলিত

ছাঁদ – আকৃতি
ছাদ – চাল

ছাড় – ত্যাগ
ছার – অধম

ছোঁড়া – বালক
ছোরা – ছুরি

জড় – অচেতন
জ্বর – রোগবিশেষ

জমক – সমারোহ
যমক – জোড়া

জলা – জলাশয়
জ্বলা – পোড়া

জাম – ফলবিশেষ
যাম – প্রহর

জাল – ফাঁদ
জ্বাল – অগ্নিশিখা

জালা – মাটির বড়ো পাত্র
জ্বালা – যন্ত্রণা

জিভ – জিহ্বা
জীব – প্রাণী

জোর – শক্তি
জোড় – জোড়া

জ্যেষ্ঠ – বড়ো
জ্যৈষ্ঠ – বাংলা দ্বিতীয় মাস

জ্যোতি – আলো
যতি – বিরাম

ঝানু – পাকা
জানু – হাঁটু

ঝুড়ি – চাঙাড়ি
ঝুরি – বটের শিকড়

টিকা – রোগ প্রতিরোধক
টীকা – ব্যাখা

ঠোকা – মৃদু আঘাত
ঠকা – প্রতারিত হওয়া

ডাকা – আহ্বান করা
ঢাকা – আবৃত

ডাল – শাখা
ঢাল – বর্ম

ডোল – ধান রাখার পাত্র
ঢোল – বাদ্যযন্ত্র

ঢাক – বাদ্যযন্ত্র
ডাক – যোগাযোগ ব্যবস্থা

তত্ত্ব – গূঢ় অর্থ
তথ্য – জ্ঞাতব্য বিষয়

তড়িৎ – বিদ্যুৎ
ত্বরিত – দ্রুত

২০২৫

তরণী – নৌকা
তরুণী – যুবতী

তারা – নক্ষত্র
তাড়া – তাড়না

তোড়া – গুচ্ছ
তোরা – তোমরা

দন্ত – দাঁত
দন্ত্য – দাঁত-বিষয়ক

দার – স্ত্রী
দ্বার – দরজা

দারা – স্ত্রী
দ্বারা – দিয়ে

দিন – দিবস
দীন – দরিদ্র

দীপ – প্রদীপ
দ্বীপ – জলবেষ্টিত ভূখণ্ড

দূতী – নারী সংবাদবাহক
দ্যুতি – আলো

দৃপ্ত – বলিষ্ঠ
দীপ্ত – উজ্জ্বল

দেশ – রাজ্য
দ্বেষ – হিংসা

ধরণ – ধরা
ধরন – প্রকার

ধাতৃ – বিধাতা
ধাত্রী – দাই

ধাপ – সিঁড়ির সোপান
দাপ – দাপট

ধুম – প্রাচুর্য
ধূম – ধোঁয়া

ধোয়া – ধৌত
ধোঁয়া – ধূম্র

নভ – আকাশ
নব – নতুন

নারী – স্ত্রীলোক
নাড়ি – শিরা

নিতি – রোজ
নীতি – নিয়ম

নিত্য – প্রতিদিন
নৃত্য – নাচ

নিবৃত – আবৃত
নিভৃত – গোপন

নিরস্ত্র – অস্ত্রহীন
নিরস্ত – ক্ষান্ত

নীড় – পাখির বাসা
নীর – পানি

পক্ষ – পাখা
পক্ষ্ম – চোখের পাতার লোম

পটল – অধ্যায়
পটোল – সবজিবিশেষ

পটাশ – রাসায়নিকবিশেষ
পটাস – ধ্বন্যাত্মক শব্দ

পদ্য – কবিতা
পদ্ম – কমল

পরা – পরিধান করা
পড়া – পাঠ

পরিচ্ছদ – পোশাক
পরিচ্ছেদ – অধ্যায়

পরিষদ – সভা
পারিষদ – সভাসদ

পাট – উদ্ভিদবিশেষ
পাঠ – পড়া

পানি – জল
পাণি – হাত

পার – তীর
পাড় – প্রান্ত

পারা – পারদ
পাড়া – মহল্লা

পারি – সমর্থ হই
পাড়ি – পারাপার

পিঠ – পৃষ্ঠ
পীঠ – স্থান

পিন – আলপিন
পীন – স্থূল

পুত – পুত্র
পূত – পবিত্র

পুরি – লুচি
পুরী – নিকেতন

পুরুষ – নর
পরুষ – কঠোর

পূর্বাভাষ – মুখবন্ধ
পূর্বাভাস – পূর্বসংকেত

প্রকার – রকম
প্রাকার – দেয়াল

প্রকৃত – যথার্থ
প্রাকৃত – স্বাভাবিক

প্রসাদ – অনুগ্রহ
প্রাসাদ – বড়ো দালান

ফোঁটা – বিন্দু
ফোটা – প্রস্ফুটিত

বর্ষা – ঋতু
বর্শা – অস্ত্রবিশেষ

বা – অথবা
বাঁ – বাম

বাক – কথা
বাঁক – বাঁকা

বাইশ – ২২ সংখ্যা
বাইস – ধারালো যন্ত্র

বাধা – বিঘ্ন
বাঁধা – বন্ধন

বাড়ি – ঘর
বারি – পানি

বাণ – শর
বান – বন্যা

বাণী – কথা
বানি – গয়নার মজুরি

বাদি – ফরিয়াদি
বাদী – মতাদর্শী

বাসি – টাটকা নয়
বাসী – বসবাসকারী

বিচি – বীজ
বীচি – ঢেউ

বিত্ত – ধন
বৃত্ত – গোলাকার

বিনা – ব্যতীত
বীণা – বাদ্যযন্ত্র বিশেষ

বিশ – ২০ সংখ্যা
বিষ – গরল

বিস্মিত – চমৎকৃত
বিস্মৃত – ভুলে যাওয়া

বৃন্ত – বোঁটা
বৃন্দ – সমূহ

বেশি – অনেক
বেশী – বেশধারী

বোঁজা – বন্ধ
বোঝা – ভার

ভজন – প্রার্থনা
ভোজন – আহার

ভাষ – কথা
ভাস – দীপ্তি

ভাষা – কথা
ভাসা – ভেসে থাকা

মতি – বুদ্ধি
মোতি – মুক্তা

মরা – মৃত
মড়া – মৃতদেহ

মাস – ৩০ দিন
মাষ – ডালবিশেষ

মুখ – বদন
মুক – বোবা

মুখপত্র – ভূমিকা
মুখপাত্র – প্রতিনিধি

মুর্খ – জ্ঞানহীন
মুখ্য – প্রধান

মোড়ক – আচ্ছাদনী
মড়ক – মহামারী

যজ্ঞ – উৎসব
যোগ্য – উপযুক্ত

যুগ – কাল
যোগ – মিলন

রতি – পরিমাণ
রথী – রথের আরোহী

লক্ষ – শত সহস্র
লক্ষ্য – উদ্দেশ্য

লণ্ঠন – বাতি
লুণ্ঠন – লুটতরাজ

লেশ – সামান্য
লেস – ফিতা

শক – জাতিবিশেষ
শখ – সাধ

শকল – আঁশ
সকল – সব

সন – বছর
স্বন – শব্দ

শব – লাশ
সব – সকল

শমন – যম
সমন – আদালতের আদেশ

শয্যা – বিছানা
সজ্জা – সাজ

শর – তির
স্বর – সুর

শরণ – আশ্রয়
স্মরণ – স্মৃতি

শশা – ফলবিশেষ
স্বসা – বোন

স্বাদ – আস্বাদ
সাধ – ইচ্ছা

শাদী – বিয়ে
সাদী – অশ্বারোহী

শান্ত – শিষ্ট
সান্ত – সসীম

শাপ – অভিশাপ
সাপ – সর্প

শারি – স্ত্রী শালিক
সারি – পঙ্‌ক্তি

শাল – গাছবিশেষ
সাল – বছর

শিকার – মৃগয়া
স্বীকার – অঙ্গীকার

শিল – পাথর
শীল – চরিত্র

শীষ – ধানের মঞ্জরি
শিস – ধ্বনিবিশেষ

শুচি – পবিত্র
সুচি – তালিকা

শোনা – শ্রবণ করা
সোনা – স্বর্ণ

শ্রবণ – কান
স্রবণ – ক্ষরণ

শ্বশ্রূ – শাশুড়ি
শ্মশ্রু – দাড়ি

সর্গ – অধ্যায়
স্বর্গ – বেহেশ্‌ত

সমর্থ – বলবান
সামর্থ্য – যোগ্যতা

সম্প্রতি – আজকাল
সম্প্রীতি – সদ্ভাব

সাক্ষর – অক্ষর সংবলিত
স্বাক্ষর – দস্তখত

সাধু – সৎ
স্বাদু – স্বাদযুক্ত

হাড় – অস্থি
হার – গলার মালা

অনুশীলনী

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. দুটি শব্দের উচ্চারণ এক বা প্রায় এক কিন্তু অর্থ আলাদা, সেগুলোকে কী বলে?
ক. বর্গ   খ. প্রবাদ   গ. শব্দজোড়   ঘ. শব্দদ্বৈত

২. শব্দজোড়ে শব্দের অর্থের পার্থক্য বোঝা যায় কীভাবে?
ক. প্রসঙ্গ বিবেচনায়   খ. সমাজ বিবেচনায়   গ. স্থান বিবেচনায়   ঘ. কাল বিবেচনায়

৩. 'অনু' এবং 'অণু' – এই শব্দ দুটির মধ্যে তফাত কোন ক্ষেত্রে?
ক. বানানে   খ. উচ্চারণে   গ. অর্থে   ঘ. বানানে ও অর্থে

৪. 'নিবৃত' ও 'নিভৃত' – শব্দজোড়ের মধ্যে মিল কোথায়?
ক. উচ্চারণে   খ. বানানে   গ. অর্থে   ঘ. শব্দশ্রেণিতে

পরিচ্ছেদ ৪৪
অনুচ্ছেদ

একাধিক বাক্য দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচিত হয়। আবার বহু অনুচ্ছেদের সমন্বয়ে তৈরি হয় প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি গদ্যরচনা। এদিক থেকে অনুচ্ছেদ হলো গদ্যরচনার একক। একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে বিশেষ একটি ভাবের প্রকাশ ঘটে কিংবা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের অবতারণা করা হয়। তাই অনুচ্ছেদের বাক্যগুলো ভাব বা বিষয়ের দিক দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে। ভালো অনুচ্ছেদের সমন্বয়ে একটি গদ্যরচনা আকর্ষণীয় হয়। শিক্ষার্থীকে তাই ভালোভাবে অনুচ্ছেদ লিখতে শেখা দরকার। অনুচ্ছেদ রচনার সময়ে যেসব বিষয় মনে রাখতে হয়, সেগুলো নিম্নরূপঃ

ক. অনুচ্ছেদে সব সময়ে একটি ভাব বা একটি বিষয় থাকে।
খ. একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একাধিক ভাব বা বিষয়ের অবতারণা করা ঠিক নয়।
গ. একটি বাক্য দিয়েও একটি অনুচ্ছেদ হয়। তবে দশ থেকে পনেরো বাক্যের অনুচ্ছেদই হলো আদর্শ অনুচ্ছেদ।
ঘ. অনেক সময়ে যৌক্তিক কারণে অনুচ্ছেদ দীর্ঘতর হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভাব বা বিষয়ের সূক্ষ্মতর বিভাজন বিবেচনায় নিয়ে একটি অনুচ্ছেদকে একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা যায়।
ঙ. অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যে মূল ভাব বা বিষয়ের উল্লেখ করা হয়।
চ. অনুচ্ছেদের পরের বাক্যগুলোতে প্রথম বাক্যে উল্লিখিত ভাব বা বিষয়ের বিস্তার ঘটানো হয়ে থাকে।
ছ. অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যে থাকে ভাব বা বিষয়ের সমাপ্তির ইঙ্গিত।

নিচে অনুচ্ছেদের কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হলো।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম-বরকত-রফিক-জব্বারসহ বেশ কয়েকজন। মাতৃভাষার জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। তখন থেকেই দিনটি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ২০০০ সাল থেকে সারা বিশ্বে দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে এভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভাষা-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলে। এর একটি নতুন মাত্রাও তৈরি হয়। পৃথিবীর মাতৃভাষাসমূহের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে এবং পৃথিবীর কোনো ভাষা যাতে হারিয়ে না যায় তা রোধ করতে এই দিবস অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়। 'শহিদ দিবস' বাংলাদেশের জাতীয় দিবস, যা সমগ্র বিশ্বের 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

২০২১

বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বহু বিদ্যা চর্চার প্রতিষ্ঠানকে বলে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিকে যেমন জ্ঞান বিতরণ করা হয়, অন্যদিকে তেমন নতুন জ্ঞান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিগুলোতে জ্ঞান বিতরণ করা হয় এবং যাঁরা নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করেন তাঁদের এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। যাঁরা জ্ঞান বিতরণের সঙ্গে জড়িত তাঁরা অধ্যাপক নামে এবং যাঁরা জ্ঞান সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত তাঁরা গবেষক নামে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশাখাগুলোকে সাধারণত মানবিক, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, আইন, চারুকলা, প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রভৃতি শৃঙ্খলা বা অনুষদে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রাচীন কালে উপমহাদেশে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল যার নাম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এর বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের সীমানার অদূরে। পৃথিবীর প্রাচীনতম যে বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনো চালু আছে তার নাম আল কারাওয়াইন বিশ্ববিদ্যালয়। এটি মরক্কোর ফেজ শহরে অবস্থিত। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দেড় শতাধিক। এগুলো বিভিন্ন শ্রেণিনামে পরিচিত: স্বায়ত্তশাসিত, সরকারি, বেসরকারি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, প্রকৌশল, মেডিকেল, বিশেষায়িত, কেন্দ্রীয়, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি। জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশ্বকে কল্যাণমূলক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বৈশাখী মেলা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে দেশের শহর ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলা বসে। এ মেলা অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই; কোথাও এক দিন, কোথাও এক সপ্তাহ, আবার কোথাও মাসব্যাপী বৈশাখী মেলা চলে। নতুন বছরে মানুষের আনন্দ-অনুভূতি প্রকাশের একটা উপলক্ষ এই বৈশাখী মেলা। মেলায় আগত পরিচিতজনেরা পরস্পরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লোক-উৎসবের মাধ্যমে এই মিলনমেলা আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। বলীখেলা, ঘোড়দৌড়, লাঠিখেলা, হাডুডু প্রভৃতি ক্রীড়ানুষ্ঠান বৈশাখী মেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। মেলা উপলক্ষে নানা ধরনের লোকগানের আসর বসে। সাধারণত গ্রামের হাটে, বাজারে, নদীর তীরে বা মন্দির প্রাঙ্গণে খোলা আকাশের নিচে বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় যেসব পণ্য বিক্রি হয়, এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের পরিমাণ বেশি। বৈশাখী মেলায় গিয়ে তালপাতায় তৈরি হাতপাখা কেনেন না এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক হালকা খাবার ও মিষ্টান্ন মেলার আকর্ষণ বাড়ায়। মেলায় বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রীর কেনা-বেচা হয় ঠিকই, তবে বিভিন্ন বয়সের নারীপুরুষের সমাবেশ বৈশাখী মেলার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ।

বইমেলা

বইমেলা হলো বইকে উপলক্ষ করে লেখক ও পাঠকের মিলনমেলা। আনন্দঘন পরিবেশে বই কেনা-বেচার সুযোগ ঘটে বইমেলায়। এই মেলাতে বইয়ের প্রকাশকগণ তাঁদের নতুন ও পুরনো বই নিয়ে দোকান সাজান, পাঠক সেখান থেকে তাঁর পছন্দের বই দেখেশুনে কিনতে পারেন। এটা বইমেলার সবচেয়ে বড়ো সুবিধা। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে বিশ্বের বৃহত্তম বইমেলার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে বইমেলার সূচনা হয় ১৯৭২ সালে মুক্তধারার প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহার উদ্যোগে। ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু হয় বাংলা একাডেমি 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এই মেলায় শুধু বই কেনাবেচাই নয়, নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও একাডেমিক কর্মকাণ্ড বাংলা একাডেমি গ্রহণ করে। ২০১৪ সাল থেকে বইমেলা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর এই মেলার উদ্বোধন করেন। বইমেলা মানুষের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; বিশেষভাবে শিশু-কিশোররা বাবা-মার সাথে বইমেলায় গিয়ে নিজেদের পছন্দের বইটি সংগ্রহ করতে পারে, নতুন নতুন বইয়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। বইমেলাকে কেন্দ্র করে অনেক লেখক তাঁদের নতুন বই প্রকাশ করেন; পাঠকও নতুন নতুন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন।

জাদুঘর

জাদুঘর বলতে এমন স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেখানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি সংরক্ষণ করা হয়। অতীত কালের গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করাই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত জাদুঘরগুলোর মধ্যে ফ্রান্সের ল্যুভর ও গিমে মিউজিয়াম, ব্রিটেনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইতালির উপিজি মিউজিয়াম, রাশিয়ার হার্মিটেজ মিউজিয়াম উল্লেখযোগ্য। ঢাকার শাহবাগে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো জাদুঘর অবস্থিত। এর নাম বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। সুদূর অতীত থেকে নিকট অতীত পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব ধরনের পুরাকীর্তি এখানে সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশে আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিজড়িত বাসভবনে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর ইত্যাদি। জাদুঘরের পুরাকীর্তিসমূহ নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকে। যে জাতির ঐতিহ্য যতো সমৃদ্ধ, সে জাতির জাদুঘরও ততো সমৃদ্ধ।

সুন্দরবন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত বিস্তৃত একটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন নামে পরিচিত। নানা ধরনের গাছপালায় পরিপূর্ণ এই সুন্দরবনে বিচিত্র বন্যপ্রাণী বাস করে। সুন্দরবনের মোট আয়তন প্রায় চার হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবন বিস্তৃত। প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে সুন্দরবন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখান থেকে সংগৃহীত হয় নানা ধরনের কাঠ, মধু, মোম ও মৎস্য। প্রায় চারশো নদী ও খাল এবং প্রায় দুইশো দ্বীপ রয়েছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনে যেসব গাছ জন্মে এর মধ্যে সুন্দরী, গোলপাতা, কেওড়া, গেওয়া, গরান, বাইন, ধুন্দুল, পশুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বনে বাস করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, বন্য শূকর, বানর, বনবিড়াল, সজারু ইত্যাদি বন্যপ্রাণী। বিচিত্র প্রজাতির পাখির কলকাকলিতে সুন্দরবন মুখর থাকে। ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

রেলগাড়ি

সমান্তরাল ধাতব পাতের উপরে চলা গাড়িকে রেলগাড়ি বলে। রেলগাড়িতে অনেকগুলো কামরা বা বগি সারিবদ্ধভাবে যুক্ত থাকে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবনের সূত্র ধরে রেলগাড়ির জন্ম। বর্তমান বিশ্বে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের কাজে এই গাড়ি অত্যন্ত জনপ্রিয়। জর্জ স্টিফেনসনের প্রচেষ্টায় ইংল্যান্ডে ১৮২৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর বিশ্বের প্রথম রেলগাড়ি চলাচল শুরু করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে রেলগাড়ির যাত্রা শুরু হয়। ১৮৬২ সালে দর্শনা থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত ৫৩.১১ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপন করা হয়। এটিই বাংলাদেশের প্রথম রেল পথ। বাংলাদেশে রেলগাড়ি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলাদেশ রেলওয়ে। এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। রেলপথ তিন ধরনের: ব্রডগেজ, মিটারগেজ ও ন্যারোগেজ। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্রডগেজ ও মিটারগেজ, এই দুই ধরনের রেলপথ চালু আছে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ জেলায় বর্তমানে রেলগাড়ি চলাচল করে, এছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গেও বাংলাদেশের রেলযোগাযোগ রয়েছে। রেলগাড়িতে ভ্রমণ আনন্দদায়ক ও নিরাপদ।

স্বাধীনতা দিবস

ছাব্বিশে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালে এই দিনের সূচনায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর এই ঘোষণায় হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে দেশকে মুক্ত করার আহ্বান জানান। শুরু হয় সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করলেও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে সামরিক সরকার ষড়যন্ত্র শুরু করে। ওই সামরিক সরকার নিয়ন্ত্রিত

হতো পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্বার্থে। পূর্ব বাংলার বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের সব প্রকার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের উপর গণহত্যা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হলেও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিলেন। ১৯৪৭ সাল থেকে চব্বিশ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি পূর্ব বাংলার উপরে যে নিপীড়ন ও শোষণ চালিয়েছে, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে তার অবসান ঘটে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়, তাই এই দিন হলো বাংলাদেশের বিজয় দিবস। অন্যদিকে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকেই এ দেশের মানুষ স্বাধীন, কেননা ঐ তারিখেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

জাতীয় পতাকা

জাতীয় পতাকা একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের আলাদা জাতীয় পতাকা রয়েছে। সাধারণত এক খণ্ড কাপড় দিয়ে জাতীয় পতাকা তৈরি করা হয়। এর আকার সুনির্দিষ্ট। আয়তাকার পতাকাই বেশি। যে দণ্ডের সঙ্গে পতাকাটি বেঁধে টাঙানো হয়, সেই দণ্ডকে বলে পতাকা-দণ্ড। সরকারি অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এছাড়া জাতীয় দিবসগুলোতে দেশের সর্বত্র জাতীয় পতাকা শোভা পায়। আন্তর্জাতিক খেলাধুলার সময়ে কোনো দেশের খেলোয়াড়দের সমর্থন করার সময়ে সমর্থকেরা সেই দেশের পতাকা উড়িয়ে থাকে। জাতীয় শোক দিবসে এবং সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী কোনো শোক পালন করার সময়ে জাতীয় পতাকাকে অর্ধনমিত করা হয়, অর্থাৎ পতাকা-দণ্ডের উপর দিকে পতাকার প্রস্থের সমান অংশ বাদ দিয়ে পতাকাটি টাঙানো হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। এর পাঁচটি পরিমাপ রয়েছে – ১০ ফুট : ৬ ফুট, ৫ ফুট : ৩ ফুট, ২.৫ ফুট : ১.৫ ফুট, ১৫ ইঞ্চি : ৯ ইঞ্চি, এবং ১০ ইঞ্চি : ৬ ইঞ্চি। 'প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত'। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সবুজ রং সবুজ প্রকৃতি ও তারুণ্যকে নির্দেশ করে এবং উদীয়মান সূর্যের মতো এর লাল বৃত্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারীদের নির্দেশ করে।

জাতীয় সংগীত

রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত দেশপ্রেমমূলক গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির সূচনায় বা জাতীয় দিবসসমূহ পালনের সময়ে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিদিন সকালের সমাবেশে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সময়ে সমবেত সকলকে উঠে দাঁড়াতে হয়। এটা দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সামিল। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খেলা শুরুর আগেও প্রতিযোগীরা নিজ নিজ দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম লাইন: 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' বাউল গানের সুরে গানটি রচনা করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে গানটিকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। গানটির কথায়

বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছে। এই ধরনের জাতীয় সংগীত দেশের মানুষকে নিজ দেশের প্রতি দায়বদ্ধ হতে শেখায়।

কম্পিউটার

কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন। কম্পিউটার শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'কম্পিউট' থেকে, যার অর্থ হিসাব বা গণনা করা। প্রথম দিকে কম্পিউটার শুধু হিসাব করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু কালক্রমে কম্পিউটারের এমন বিকাশ ঘটেছে যে, একুশ শতকের সূচনায় এসে কম্পিউটার মানুষের জীবনযাত্রার সকল কাজের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। অসংখ্য বিজ্ঞানীর বহু বছরের সাধনার ফলে কম্পিউটার প্রযুক্তির এই অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছে। দাপ্তরিক কাজ, লেখালেখি, শিক্ষকতা, প্রকাশনা, বাণিজ্য, যোগাযোগ, বিনোদনসহ সব ধরনের কাজ এখন পুরোপুরি কম্পিউটার-নির্ভর। নানা ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের কাজে শিক্ষার্থী ও গবেষককে কম্পিউটারের সাহায্য নিতে হয়। কম্পিউটারের বাহ্যিক যন্ত্রাংশকে বলে হার্ডওয়্যার বা যন্ত্রপাতি। হার্ডওয়্যারের মধ্যে থাকে কিবোর্ড, মাউস, র‍্যাম, মাদারবোর্ড, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি। যেসব প্রোগ্রাম দিয়ে কম্পিউটার কাজ করে সেগুলোকে বলে সফটওয়্যার। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করতে চায়; এর মানে কম্পিউটার প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা দেশের সব মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলা।

মোবাইল ফোন

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে বহন করা যায় এমন ফোনকে বলে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন আবিষ্কারের আগে দূরবর্তী কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে টেলিফোন নামক যন্ত্র রাখতে হতো। এর সংক্ষিপ্ত নাম ফোন। বিভিন্ন বাড়ি বা অফিসে তারের মাধ্যমে ফোনগুলো যুক্ত থাকত। অন্যদিকে মোবাইল ফোন তারবিহীন প্রযুক্তি হওয়ায় এটি যেখানে খুশি সেখানে বহন করা যায়। মোবাইল ফোনকে কখনো সেলুলার ফোন, হ্যান্ড ফোন বা মুঠোফোন নামে অভিহিত করা হয়। মোবাইল ফোনে আজকাল কথা বলার পাশাপাশি আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা ভোগ করা যায়। এই সুবিধা আছে যেসব মোবাইল ফোনে, সেগুলোকে বলে স্মার্ট ফোন। এই স্মার্ট ফোনে কথা বলা যায়, ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান করা যায়, ই-মেইল করা যায়, বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, গান শোনা যায়, নাটক দেখা যায়, রেডিও শোনা যায়, টিভি দেখা যায়। অপরাধী শনাক্ত করার কাজেও আজকাল মোবাইল ফোন গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয় ১৯৯৩ সালে। প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

পদ্মা নদী

পদ্মা বাংলাদেশের একটি প্রধান নদী। ভারতের গঙ্গা নদীর ধারা বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময়ে পদ্মা নাম গ্রহণ করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে চাঁদপুরের কাছে মেঘনা নদীতে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি পদ্মা নামে পরিচিত। উৎপত্তি ও প্রবাহ বিবেচনায় পদ্মা আন্তর্জাতিক একটি নদীর অংশবিশেষের নাম। মূল নদীটির নাম গঙ্গা। গঙ্গা নদীর উৎস হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ। বাংলাদেশে প্রবেশের সময়ে গঙ্গার দক্ষিণমুখী একটি শাখা ভাগীরথী নাম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে সাগরে মেশে। মূল ধারাটি পদ্মা নাম নিয়ে গোয়ালন্দের কাছে পৌঁছানোর পর সেখানে উত্তর দিক থেকে আসা যমুনা নদী তার সঙ্গে মেশে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর রাজশাহী পদ্মা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। পদ্মা নদীর সর্বোচ্চ গভীরতা দেড় হাজার ফুটের বেশি এবং গড় গভীরতা প্রায় এক হাজার ফুট। মালদহ জেলার ফারাক্কাবাদে পদ্মা নদীর সূচনায় একটি বাধ দিয়ে ভারত সরকার পদ্মা নদীর পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পদ্মা নদীর উপরে তৈরি হয়েছে একাধিক রেল ও সড়ক সেতু: একটি ঈশ্বরদীর কাছে এবং অন্যটি মাওয়ার কাছে। পদ্মা নদীর ইলিশের স্বাদ বিশ্বজোড়া। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাঙালির আত্মপরিচয়ের অন্যতম উপাদান হিসেবে পদ্মা নদীর নাম উচ্চারিত হতো।

জন্মদিনের সন্ধ্যা

প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রিয় তার জন্মদিন। এই দিনের সন্ধ্যায় তার প্রিয়জনেরা যদি আয়োজন করে জন্মদিনের অনুষ্ঠান, তাহলে এর চেয়ে আনন্দের আর কী থাকে! জন্মদিনের সন্ধ্যায় আমন্ত্রিতরা যখন একে একে হাজির হয়, শুভেচ্ছা জানায়, স্মারক হিসেবে কিছু না কিছু উপহার হাতে তুলে দেয়, তখন তা মনকে খুশিতে ভরিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে কেক কাটা হয়। জন্মদিনের গান আর করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ঘর। সকলের চোখেমুখে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেক কাটার পরে থাকে নৈশভোজ। নৈশভোজে থাকে ভালো ভালো খাবারের ব্যবস্থা। সবার জন্মদিনের সন্ধ্যা যে এমন আনন্দের সঙ্গে কাটে, তা নয়। যাদের প্রিয়জনেরা সচ্ছল নয়, তাদের জন্মদিনের সন্ধ্যা হয়তো কোনো রকম আয়োজন ছাড়াই শেষ হয়। তবে আয়োজন হোক বা না হোক, জন্মদিনের সন্ধ্যা মানে জীবন থেকে একটা বছর হারিয়ে যাওয়া আর নতুন একটা বছরের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

পরিচ্ছেদ ৪৫

সারাংশ ও সারমর্ম

সাধারণত গদ্যরচনার অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে সংক্ষেপে লেখার নাম সারাংশ, আর কাব্যভাষায় লেখা কোনো রচনার মূলভাবকে সংক্ষেপে লেখার নাম সারমর্ম। সারাংশকে সারসংক্ষেপ এবং সারমর্মকে মর্মার্থও বলা হয়ে থাকে। একটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা পেতে সারাংশ ও সারমর্ম বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সারাংশ ও সারমর্ম লেখা শিখতে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে পারে:

ক. প্রদত্ত রচনার বিবরণ ও ভাবকে অনুসরণ করে সারাংশ ও সারমর্ম লিখতে হয়।
খ. অনধিক চার বাক্য বা চল্লিশ শব্দের মধ্যে সারাংশ ও সারমর্ম সীমিত রাখা দরকার।
গ. প্রদত্ত রচনার মূল কথা যাতে সারাংশ ও সারমর্মে বাদ না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।
ঘ. সারমর্ম বা সারাংশ লেখার সময়ে উদাহরণ, উদ্ধৃতি, পরিসংখ্যান, তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদি পুরোপুরি বাদ দিতে হয়।
ঙ. সারাংশ ও সারমর্মের ভাষায় কোনো ধরনের কাব্যধর্মিতা রাখা যায় না। ভাষা হতে হয় দ্ব্যর্থহীন ও আবেগবর্জিত।
চ. সারাংশ ও সারমর্মে পুনরাবৃত্তি পুরোপুরি বর্জনীয়।
ছ. সারাংশ বা সারমর্ম লেখার সময়ে নিজস্ব বক্তব্য, মন্তব্য বা মত প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই।

নিচে সারাংশ ও সারমর্ম রচনার কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো:

সারাংশ

১

এ কথা নিশ্চিত যে, জনসংখ্যার ঊর্ধ্বগতি জাতীয় জীবনে উন্নয়নের গতিকে শ্লথ করে। সমাজ ও পরিবারের জীবনেও তা নানা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। অধিক জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ সমাজ তার সদস্যদের সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যেমন, শিক্ষালাভের অধিকার একটি সামাজিক অধিকার। কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যা এখনও শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই বিপুল জনসংখ্যার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে দেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়তে বাধ্য। দেশের নতুন প্রজন্মকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা মানে হলো সম্ভাবনাময় বিশাল জনশক্তির অপচয় ঘটানো।

সারাংশ: জনসংখ্যার অধিক বৃদ্ধি দেশের উন্নতির অন্তরায়। এতে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ শিক্ষার মতো সামাজিক অধিকার পায় না। ফলে দেশের বিপুল জনশক্তির অপচয় ঘটে।

২

বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্র তদপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান। অতএব কেবল বিদ্বান বলিয়াই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সর্পের মস্তকে মণি থাকে। মণি মূল্যবান পদার্থ বটে। কিন্তু তাই বলিয়া যেমন মণি লাভের নিমিত্ত বিষধর সর্পের সাহচর্য করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে, সেইরূপ বিদ্যা আদরণীয় বিষয় হইলেও বিদ্যালাভের নিমিত্ত বিদ্বান দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নহে।

সারাংশঃ বিদ্যা মূল্যবান বটে, তবে চরিত্রের মূল্য আরো বেশি। যার চরিত্র ভালো নয়, তার জ্ঞান দিয়ে কোনো ভালো ফল আশা করা যায় না। সাপের মাথায় মণি থাকলেও তা ভয়ংকর; চরিত্রহীন বিদ্বান হলেও তার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত।

৩

সমাজের কাজ কেবল মানুষকে টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। তারই চরণে তারা নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতির অহংকার ও ধর্মগত অহংকার – এ সবের লাল নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানব-প্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় তা আন্তরিকতাহীন ও উপলব্ধিহীন বুলি মাত্র।

সারাংশঃ সমাজ একটি সামবায়িক সংগঠন। সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও এখানে ভালো-মন্দ উভয় শ্রেণির মানুষের উপস্থিতি থাকে। অহংকারী ও স্বার্থপর মানুষ সমাজে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে না, বরং অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

৪

মাতৃস্নেহের তুলনা নাই; কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময়ে অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃস্নেহের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আসল শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না – দুর্বল, অসহায় পক্ষিশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বোঝে না – দুর্বলের প্রতি সে স্থিরলক্ষ্য, অসহায় সন্তানের প্রতি মমতার অন্ত নাই – অলসকে সে প্রাণপাত করিয়া সেবা করে – ভীরুতার দুর্দশার কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীরুকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হয়।

সারাংশঃ অতিরিক্ত মাতৃস্নেহ সন্তানের জন্য মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। অধিক স্নেহে সন্তানের মধ্যে স্বনির্ভরতা আসে না; সে অসহায় হয়ে পড়ে। অন্ধ মাতৃস্নেহ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়।

৫

অভ্যাস ভয়ানক জিনিস – একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন; মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সপ্তাহে অন্তত একদিন তুমি মিথ্যা বলবে না। ছয় মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলতে অভ্যাস কর। তারপর এক শুভ দিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কর, সপ্তাহে তুমি দুইদিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে তখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা কোরো না। তাহলে সব পণ্ড হবে।

সারাংশঃ মানুষ অভ্যাসের দাস। কোনো অভ্যাসকে একদিনে বদলানো যায় না। অভ্যাস বদলানোর জন্য নিয়মিত চেষ্টা করতে হয়। নিজেকে চরিত্রবান করতে চাইলে ধীরে ধীরে মিথ্যাচার ত্যাগ করার চেষ্টা করতে হবে।

৬

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

সারাংশঃ লাইব্রেরির সঙ্গে নীরব মহাসাগরের তুলনা করা যায়। যুগ যুগ ধরে অগণিত জ্ঞানী-গুণী মানুষের চিন্তা-ভাবনা বইয়ের পাতায় স্থায়িত্ব লাভ করে। মানুষের অর্জিত জ্ঞান এই বইয়ের মাধ্যমে লাইব্রেরিতে সঞ্চিত হয়ে আছে।

৭

মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মে। বস্তুত চরিত্রবলেই মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার আর কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক – এ কথার অর্থ এই নয় যে, তুমি লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করো, তুমি পরদুঃখকাতর ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় – চরিত্রবান মানে এই।

সারাংশঃ চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্ম মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ করে। চরিত্রগুণেই মানুষ অন্যের শ্রদ্ধা লাভ করতে পারে। যিনি সত্যবাদী, বিনয়ী, জ্ঞানী, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ, স্বাধীনতাপ্রিয় ও সজ্জন তিনিই চরিত্রবান।

৮

আজকাল বিজ্ঞানের দ্বারা যেসব অসাধ্য সাধন হইতেছে, তাহাও বহু লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে। মানুষ পূর্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মানুষ বর্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা মনেও করিতে পারি না। কে প্রথম আগুন জ্বালাইতে শিখিল, কে প্রথম ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এই মাত্র জানি যে, প্রথমে যাঁহারা নূতন কোনো প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে অনেক নির্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাতত মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। প্রবাল দ্বীপ যেরূপ একটু একটু করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয়, জ্ঞান রাজ্যও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে।

সারাংশঃ বর্তমান সভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির পিছনে রয়েছে অগণিত মানুষের নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টা। মানুষের কর্মপ্রচেষ্টায় যুগ যুগ ধরে নানা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে এই সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে।

৯

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আবার যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু! যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

সারাংশঃ সুবিধাবাদীদের উপস্থিতি সুসময়ে দেখা যায়। দুঃখের দিনে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের সময়ে এই সুসময়ের বন্ধুরা কোনো উপকারে আসে না।

১০

অভাব আছে বলিয়া জগৎ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। অভাব না থাকিলে জীব-সৃষ্টি বৃথা হইত। অভাব আছে বলিয়া অভাব-পূরণে এত উদ্যম, এত উদ্যোগ। সংসার অভাবক্ষেত্র বলিয়া কর্মক্ষেত্র। অভাব না থাকিলে সকলেই স্থাণু-স্থবির হইত, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইত। মহাজ্ঞানীগণ অপরের অভাব দূর করিতে সর্বদা ব্যস্ত। জগতে অভাব আছে বলিয়াই মানুষ সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সেবা মানবজীবনের পরম ধর্ম। সুতরাং অভাব

হইতেই সেবাধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। আর এই সেবাধর্মের দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্বসুলভ গুণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

সারাংশ: জীবনে অসম্পূর্ণতা আছে বলেই মানুষ পূর্ণতার খোঁজ করে। অভাব দূর করার জন্যই সে কর্মপ্রচেষ্টায় রত থাকে। আবার কিছু মানুষ অন্যের অভাব পূরণের মধ্য দিয়ে মহান হয়ে ওঠে।

সারমর্ম

১

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?

সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম,
ফল চাহে, – সেও অতি নির্বোধ, অধম।
খেয়া-তরী চ'লে গেলে বসে এসে তীরে,
কিসে পার হবে, তরী না আসিলে ফিরে?

সারমর্ম: নৈতিকতা শেখার যথার্থ সময় শিশুকাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে না পারলে জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমনকি অসময়ে অতিশ্রমেও কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব হয় না।

২

কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর!
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।

সারমর্ম: স্বর্গ ও নরক প্রাপ্তি ঘটে পরকালে – এমনটিই প্রচলিত ধারণা। কিন্তু পৃথিবীতেই স্বর্গ কিংবা নরক রচনা করা সম্ভব। প্রীতি ও প্রেমেই স্বর্গীয় সুখ আসে; হিংসা ও কুপ্রবৃত্তি দেয় নরক-যন্ত্রণা।

৩

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে।
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব – তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি –
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সারমর্মঃ নতুনকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পুরাতনকে চলে যেতে হয়। বর্তমান পৃথিবী নানা সংকটে জর্জরিত। নতুন প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সুখকর ও বাসযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব পুরাতন প্রজন্মের।

৪

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

সারমর্মঃ শ্রমজীবী মানুষের কঠোর শ্রম ও ত্যাগে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। ধনিকশ্রেণির দ্বারা নিপীড়িত হলেও তারা সত্যিকারের মহৎ মানুষ। একদিন তাদের নবজাগরণের মধ্য দিয়ে এ বিশ্বে নতুন দিনের সূচনা ঘটবে।

৫

বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস –
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

সারমর্মঃ শস্যসম্পদ অর্জন করা কষ্টসাধ্য। তাই মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও শ্রমের এত মূল্য। অন্যের করুণার উপরে নির্ভরশীল হলে মানুষের মর্যাদা বাড়ে না। কষ্ট করে পাওয়া ফলের মধ্যে মানুষের গৌরব নিহিত।

৬

ধন্য আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি!
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়!
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি!
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানব-সকল
ঘুরিতেছে কর্মক্ষেত্রে বর্তুল আকার;
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ; পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায়! অনিবার।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমনি তুমি অর্বাচীন নরে।

সারমর্মঃ আশা জীবন-সংসারের অদৃশ্য চালিকাশক্তি। আশা না থাকলে মানবজীবন স্থবির ও জড়তায় পর্যবসিত হতো। আশা আছে বলেই এর মন্ত্র-মায়ায় মানুষ সামনে এগিয়ে চলে, সমৃদ্ধির লক্ষ্যে জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

৭

নিখিলের এত শোভা, এত রূপ, এত হাসি-গান,
ছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন-প্রাণ
এ বিশ্বের সব আমি প্রাণ দিয়ে বাসিয়াছি ভালো –
আকাশ বাতাস জল, রবি-শশী, তারকার আলো।
সকলেরই সাথে মোর হয়ে গেছে বহু জানা-শোনা,
কত কি-যে মাখামাখি, কত কি-যে মায়া-মন্ত্র বোনা।
বাতাস আমারে ঘিরে খেলা করে মোর চারিপাশ,
অনন্তের কত কথা কহে নিতি নীলিমা আকাশ।
চাঁদের মধুর হাসি, বিশ্বমুখে পুলক চুম্বন,
মিটিমিটি চেয়ে থাকা তারকার করুণ নয়ন,
বসন্ত নিদাঘ-শোভা, বিকশিত কুসুমের হাসি,
দিকে দিকে শুধু গান, শুধু প্রেম-ভালবাসাবাসি।

সারমর্মঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পৃথিবীকে অপরূপ করেছে। প্রকৃতি মানুষের মনকে পুলকিত করে; আবার প্রকৃতির প্রেমে মানুষের মন বাঁধা পড়ে। এই মায়া ত্যাগ করে কেউই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে চায় না।

৮

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

সারমর্মঃ নবীনের কর্মচঞ্চলতায় পৃথিবী নতুন রূপে সাজে। যারা পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখে, তারা নতুন পরিবর্তনকে ভয় পায়। তারুণ্যের প্রাণশক্তিতে সবাইকে উজ্জীবিত হতে হবে।

৯

দৈন্য যদি আসে, আসুক, লজ্জা কিবা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে,
ঊর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস।

সারমর্মঃ বিপদ ও দুঃখে কাতর হলে চলবে না। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়। সংগ্রাম ছাড়া জীবনে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

১০

তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাইয়ের রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে,
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে ব'লে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে ব'লে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের উপর।

সারমর্মঃ অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। শত্রুবাহিনীর চরম আক্রোশ ও নির্মমতার শিকার হয়েছে নারী, শিশুসহ আপামর জনসাধারণ। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীনতাকে কোনো মূল্য দিয়ে মাপা যায় না।

পরিচ্ছেদ ৪৬
ভাব-সম্প্রসারণ

কোনো কবিতা বা গদ্যরচনার অংশকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করাকে ভাব-সম্প্রসারণ বলে। কবিতার বেলায় সেইসব পঙ্‌ক্তির ভাব-সম্প্রসারণ দরকার হয়, যেগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য বা তত্ত্ব থাকে। অন্যদিকে গদ্যরচনার সেইসব বাক্য ভাব-সম্প্রসারণের জন্য ঠিক করা হয়, সাধারণত যা প্রবাদ বা প্রবচনের মর্যাদায় উন্নীত। ভাব-সম্প্রসারণ করার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা যেতে পারে:

ক. ভাব-সম্প্রসারণকে প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়: প্রথম অংশে ভাবের অর্থ, দ্বিতীয় অংশে ভাবের ব্যাখ্যা এবং তৃতীয় অংশে ভাবের তাৎপর্য।
খ. ভাব-সম্প্রসারণের এই অংশগুলোকে আলাদা তিনটি অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা যায়।
গ. ভাবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুক্তি দেখাতে হয়, উদাহরণ দিতে হয়, তুলনা করতে হয়।
ঘ. ভাব-সম্প্রসারণের বাক্যগুলো যাতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার।
ঙ. প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
চ. ভাব-সম্প্রসারণে আলাদা কোনো শিরোনামের দরকার হয় না।
ছ. মূল ভাবটি রূপক বা প্রতীকের আড়ালে থাকলে তাকে স্পষ্ট করতে হয়।
জ. ভাব-সম্প্রসারণ করার সময়ে প্রদত্ত অংশের রচয়িতার নাম উল্লেখ করতে হয় না।
ঝ. কমবেশি ২০০ শব্দ অথবা অনধিক ২০টি বাক্যের মধ্যে ভাব-সম্প্রসারণ সীমিত থাকা উচিত।

নিচে ভাব-সম্প্রসারণের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো।

১.

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

ভাব-সম্প্রসারণ: যে অন্যায় করে এবং যে সেই অন্যায় সহ্য করে, তারা উভয়ে সমান অপরাধী – উভয়ে সমান ঘৃণার পাত্র।

আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়কারীকে অপরাধী মনে করা হয়। তাই তার জন্য শাস্তির বিধান থাকে। আবার অনেক মানুষ আছে তারা সরাসরি অন্যায় করে না, কিন্তু পেছনে থেকে অন্যায়কারীকে সহায়তা করে বা অন্যায় করতে উৎসাহিত করে। আইনের আওতায় এরাও কখনো কখনো অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। আবার, এমনও লোক থাকে – যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যায় করে না, অন্যায় ঘটার সময়ে শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। আইনের চোখে তাদের অপরাধী বলা যায় না। আইনের চোখে অপরাধী না হলেও এই নীরব দর্শকেরাও এক অর্থে অন্যায় ঘটাতে সহযোগিতা করে। কেননা, অন্যায় সংঘটিত হওয়ার সময়ে ওইসব দর্শক যদি সরব প্রতিবাদীর ভূমিকা পালন করত, তাহলে অন্যায় ঘটত না। আইনের চোখে এরা হয়তো অপরাধী নয়, কিন্তু বিবেকের দায় থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া যায় না। সমাজ থেকে অন্যায়কে দূর করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিবেকের দায়সম্পন্ন সচেতন মানুষের উপস্থিতিও জরুরি, যারা অন্যায়ের প্রতিবাদে সব সময়ে সোচ্চার হবে, সরব হবে। অপরাধী যাতে অপরাধ করার সুযোগ না পায়, সবাইকে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

অন্যায়কারীকে যথাযথভাবে শাস্তি দিলে অন্যায় প্রশ্রয় পায় না। আবার অন্যায় করতে না দিলে অন্যায়ের ঘটনা ঘটে না। তাতে সমাজ থেকে অন্যায় চিরতরে দূর হয়। তাই অন্যায়কারী এবং অন্যায়-সহ্যকারী উভয়ই সমাজে নিন্দনীয়।

২.

আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে।

ভাব-সম্প্রসারণ: ব্যক্তির জীবনাচরণের মধ্যে যা নেই, তা অন্যকে উপদেশ আকারে দেওয়া যায় না। অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে তা পালন করে দেখাতে হয়। এর ফলে যাকে উপদেশ দেওয়া হয়, সে তা পালন করতে আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়।

কাউকে উপদেশ দেওয়া যত সহজ, উপদেশ পালন করা তার চেয়ে অনেক কঠিন। যে উপদেশ দেয়, সে যদি নিজে তা পালন না করে, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে এর গুরুত্ব থাকে না। অন্যদিকে উপদেশ দানকারী যদি সেই উপদেশের পালনীয় দিক নিজ জীবনে পালন করে দেখান, তাহলে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশ পালনের দৃষ্টান্ত পেয়ে যান, যা তার জীবনাচরণে সক্রিয় প্রভাব ফেলে। সাধারণত ধর্মপ্রবর্তক, ধর্মপ্রচারক, জ্ঞানী ব্যক্তি বা জীবনে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তদের তরফ থেকে উপদেশ-বাণী বর্ষিত হয়ে থাকে। এঁদের দেওয়া উপদেশ মানুষ পালন করতে দ্বিধা করে না। তবে উপদেশ হিসেবে বর্ষিত কথাটুকু তাঁরা নিজেদের জীবনেও অনুসরণ করেন কি-না – এ বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক থাকতে হয়। সমাজে অনেক মানুষ থাকে, যারা উপদেশ দিতে খুব পটু, কিন্তু ওইসব উপদেশ তারা নিজেরাই পালন করতে অভ্যস্ত নয়। তখন উপদেশগুলো উপদেশ-গ্রহণকারীর কাছে সেইভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একজন লোক নিয়মিত ধূমপান করে, আবার সে যদি অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করে, তাহলে তা হাস্যকর উপদেশে পরিণত হয়। তাই কোনো একটা ভালো কাজ করতে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার আগে উপদেশদাতাকেই ভালো কাজটি করতে অভ্যস্ত হতে হবে। তাতে উপদেশ-গ্রহণকারী উপদেশের পাশাপাশি উপদেশ পালনের নজিরও গ্রহণ করতে পারে।

কাউকে উপদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ভালো মানুষ সাজার ভান করা খুব সহজ, কিন্তু উপদেশ পালন করা খুব কঠিন কাজ। তবে সেই উপদেশদাতাই সর্বোত্তম, যিনি নিজে যা পালন করেন, অন্যকেও তা পালন করতে বলেন।

৩.

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

ভাব-সম্প্রসারণ: ক্ষুধার্ত মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুন্নিবৃত্তি। সব কিছুর মধ্যেই সে ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা ভাবে। তখন কোনো কিছু সুন্দর কি অসুন্দর, তা তাকে ভাবায় না।

প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হলো এর মধ্যে প্রধান মৌলিক চাহিদা। খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের শরীরে তৈরি হওয়া এই খাদ্যের চাহিদারই অপর নাম ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। মানুষ যে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তার পেছনে এই ক্ষুন্নিবৃত্তিই মূল চালিকাশক্তি। ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার পরেই মানুষ অন্যান্য মৌলিক চাহিদার কথা ভাবে। বাসস্থানের কথা ভাবে, পোশাকের কথা ভাবে, স্বাস্থ্যের কথা ভাবে। সুন্দর-অসুন্দরের কথা ভাবে একেবারে শেষ পর্যায়ে। তাই ক্ষুধা যখন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সৌন্দর্যের মূল্য তার কাছে থাকে না। একজন সুখী মানুষের কাছে পৃথিবীকে সুন্দর মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে তা নাও হতে পারে। অতীতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যেত। সামান্য দুটো রুটির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে সারাদিন পরিশ্রম করতে হতো। সেই দুর্ভিক্ষে একজন শ্রমজীবীর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ বড়ো জোর একখানা ঝলসানো রুটির মতো মনে হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৃথিবীর সৌন্দর্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তার সবচেয়ে আগে দরকার খাদ্য। গদ্যের কাঠিন্যটুকু সে ভালো উপলব্ধি করতে পারে; কাব্যের কোমলতা তার কাছে অর্থহীন।

৪.

গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন,
নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন।

ভাব-সম্প্রসারণঃ ধন-সম্পদ যদি নিজের নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবে দরকারের সময়ে তা কোনো কাজে আসে না। একইভাবে জ্ঞান যদি শুধু বইয়ের পাতায় আটকে থাকে, সে-বিদ্যা ব্যক্তি তার নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারে না।

মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রমাণ-লব্ধ জ্ঞান বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। বই পাঠ করলে পৃথিবীর সব ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। কেউ যদি নিয়মিত বই পড়ে তাহলে সে ধীরে ধীরে নিজেকে জ্ঞানী করে তুলতে পারবে। বই থেকে অর্জিত এই জ্ঞান দিয়ে সে নিজের বা অন্যের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। বই থেকে আহরিত জ্ঞান থেকে সে নিজে যেমন আলোকিত হতে পারে, অন্যকেও আলোকিত করতে পারে। কিন্তু জ্ঞান যদি বইয়ের মধ্যেই শুধু আবদ্ধ থাকে, তাহলে তা কারো কোনো কাজে আসে না। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হাজার হাজার বই কিনলেন আর তা দিয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলেন। লাইব্রেরির তাকে তাকে বইগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলেন। কিন্তু জ্ঞানের কোনো বিষয়ে কেউ যদি তাঁকে প্রশ্ন করে, তিনি তার যথাযোগ্য জবাব দিতে ব্যর্থ হবেন। আবার বইয়ের বিদ্যা না বুঝে কেবল ঠোঁটস্থ বা মুখস্থ করলেই হবে না। এই বিদ্যার প্রায়োগিক দিকটিও উপলব্ধি করতে হবে। অনেকটা জায়গা-জমি বা অর্থের

মতো। নিজের সম্পদ-সম্পত্তি অন্যের হাতে থাকলে তা ভোগ করা যায় না। অন্যের কাছে থাকা অর্থ আর বইয়ের পাতার সীমাবদ্ধ জ্ঞান এভাবে সমার্থক হয়ে যায়।

বইকে শুধু পরীক্ষা পাশের উপকরণ মনে করলে চলবে না। বইয়ের জ্ঞানকে জীবনে কাজে লাগাতে পারলে তবেই সার্থকতা।

৫.

জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো।

ভাব-সম্প্রসারণঃ কর্মের দ্বারাই মানুষ পৃথিবীর বুকে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পায়। কোনো মানুষের জন্ম যে বংশেই হোক না কেন, কাজই তার পরিচয় নির্ধারণ করে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। তখন পিছনে পড়ে থাকে তার ভালো-মন্দ সব ধরনের কাজ। কাজ ভালো হলে বহু কাল যাবৎ মানুষ তা মনে রাখে। আর কাজ খারাপ হলে যুগ যুগ ধরে সকলে তার নিন্দা করে। বংশমর্যাদার উপরে এইসব সুনাম বা দুর্নাম নির্ভর করে না। বংশে কেউ একজন সুনাম করলে সেই বংশের মর্যাদা বাড়ে। তবে তার অর্থ এই নয় যে, এই মর্যাদা চিরস্থায়ী। কেননা, একই বংশে কোনো কুলাঙ্গার জন্ম নিলে সেই মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে পারে। আবার, অনেকে খুব সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়েও নিজ নিজ কৃতিত্বের জন্য পৃথিবীতে অমর হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, আবার কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন দরিদ্র পরিবারে। এ দুজন ব্যক্তি বংশ পরিচয়ে নয়, বরং কর্ম দ্বারা মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছেন।

মানুষের পরিচয় কখনোই তার বংশ বা পরিবারের মর্যাদা-অমর্যাদার উপর নির্ভর করে না – নির্ভর করে তার নিজ নিজ কর্ম ও সুকৃতির উপর। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, মানবসেবা – পছন্দসই যে কোনো ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করে অমর হতে পারে।

৬.

দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

ভাব-সম্প্রসারণঃ দুর্জন মানে খারাপ লোক। খারাপ লোক যতই শিক্ষিত হোক না কেন, তার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।

সাধারণত মিথ্যাবাদী, দুর্নীতিপরায়ণ ও চরিত্রহীন লোককে এককথায় দুর্জন বলা হয়। যারা খারাপ লোক, তাদের কথায় ও আচরণে খারাপ স্বভাব প্রকাশ পায়। খারাপ লোক শিক্ষিত হতে পারে, উচ্চশিক্ষিত হতে পারে; আবার নিরক্ষরও হতে পারে। অর্থাৎ কারো খারাপ হওয়ার সঙ্গে শিক্ষিত হওয়া বা না-হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। যারা খারাপ লোকের সঙ্গে মেশে, তাদের সবাই খারাপ লোক মনে করে। এজন্য খারাপ লোকের সঙ্গ ত্যাগ করতে হয় এবং তেমন লোকের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়। একসময়ে এই বিশ্বাস করা হতো – কোনো কোনো বিষধর সাপের মাথায় মণি আছে। কিন্তু মণি আছে বলে সাপের সঙ্গে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তেমনি দুর্জন লোক শিক্ষিত হলেও তার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। দুর্জন লোক অপরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কখনো পায় না। তার কাছ থেকে সঙ্গীর কিছু শেখার নেই। এমনকি, দুর্জনের কারণে সঙ্গীর বিপদও হতে পারে। বিপরীতভাবে, ভালো লোক নিরক্ষর হলেও তার সঙ্গ প্রীতিকর হয়। ভালো লোকের কাছ থেকে তার সঙ্গীর বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে না।

সচ্চরিত্র গঠন করা বিদ্যা অর্জন করার চেয়েও কঠিন কাজ। তাই যিনি চরিত্রবান, তার বিদ্যা থাক বা না-থাক, তার সঙ্গ প্রত্যাশিত। অন্যদিকে চরিত্রহীন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা ক্ষতিকর।

৭.
প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

ভাব-সম্প্রসারণ: খাদ্য গ্রহণ করে, শারীরিকভাবে বাড়ে আর বংশ বৃদ্ধি করে – মোটামুটি এসব বৈশিষ্ট্য থাকলে কোনো কিছুর প্রাণ আছে বলে মনে করা হয়। মানুষেরও প্রাণ আছে, কিন্তু মানুষের থাকে এর অতিরিক্ত আর একটি সত্তা, তা হলো মন।

মানুষকে বলা হয় সৃষ্টির সেরা জীব – সেরা প্রাণী। মূল কারণ তার মন আছে। এই মনের মাধ্যমে মানুষ তার চারপাশের জগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। তার মধ্যে ভালো-মন্দের ধারণা সৃষ্টি করে, নৈতিকতার জন্ম দেয়। এমনকি এই মন দিয়ে সে গড়ে তোলে তার নিজস্ব সংস্কৃতি। এই সাংস্কৃতিক বোধ থেকে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে এইসব উপাদান থাকে না। ইতর প্রাণীর মন থাকে না বলে তার সংস্কৃতি নেই, তার ভালো-মন্দের বোধ নেই, তার নৈতিকতার বালাই নেই। মানুষের মন এভাবে অন্যান্য প্রাণী থেকে তাকে আলাদা করে। মনকে আবার অনেক সময়ে ভালো কিছুর কেন্দ্র হিসেবেও ভাবা হয়। যেমন, যখন কোনো ব্যক্তির দানশীলতার কথা বলা হয়, তখন বলা হয়, তাঁর মন আছে। আবার কোনো লোককে যখন চরম স্বার্থপর ও কৃপণ হিসেবে চিত্রিত করার দরকার হয়, তখন বলা হয়, লোকটার মন ছোটো। এদিক দিয়ে মন হলো মানুষের ভালো-মন্দ পরিমাপের এক ধরনের মাপকাঠি।

মানুষের মন আছে বলেই সে মানবিক গুণের অধিকারী। আর যার মন নেই, অবশ্যই সে ইতর প্রাণীর সঙ্গে তুলনীয়। সেই ইতর প্রাণী হতে পারে চরমভাবে হিংস্র অথবা একান্তই গোবেচারা কোনো পশু, পাখি বা মাছ।

৮.
বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।

ভাব-সম্প্রসারণঃ জ্ঞান আহরণ করার আশা নিয়ে মানুষ বই কেনে। আর এই বই কেনার জন্য যে অর্থ-ব্যয় হয়, অর্জিত জ্ঞানের তুলনায় তা খুব নগণ্য।

বই মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়ে মনের জগৎকে প্রসারিত করে। কূপমণ্ডূকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের সূচনায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দার্শনিকগণ বলেছিলেন, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। তাঁদের ধারণা অনুযায়ী জ্ঞানের সীমানা বাড়াতে, বুদ্ধিকে বন্ধনহীন করতে, আর মানুষের মুক্তি আনতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। সব মানুষই খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করে। মৌলিক চাহিদা পূরণের পর অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করার আরো অনেক উপায় আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো উপায় – বই কেনা। বই কিনে কেউ নিঃস্ব হয় না। কারণ, একটা বইয়ের অর্থমূল্য বেশি নয়। বরং একটি বই কিনতে যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ অনেকে অন্যান্য কাজে ব্যয় করে থাকে। ব্যক্তিকে আলোকিত করতে একটি বই যেভাবে ভূমিকা রাখে, তাতে বই কেনার ব্যাপারে কার্পণ্য করা বোকামি। একটা বই অনেক সময়ে মানুষের জীবনকে পর্যন্ত বদলে দিতে পারে।

বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তাই নিজেকে সমৃদ্ধ করতে বই কেনার ও তা পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

৯.
বার্ধক্য তাহাই – যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

ভাব-সম্প্রসারণঃ কেবল বয়সের মাপকাঠিতে তারুণ্য বা বার্ধক্যকে বিচার করা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও কর্মস্পৃহার তারতম্য মানুষকে তরুণ ও বৃদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে।

মানুষ শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। এ বার্ধক্য ব্যক্তির নানা ধরনের শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সবাইকে মানসিকভাবে জরাগ্রস্ত করতে পারে না। এদের কর্মশক্তি ও মানসিক-শক্তি অনেক তরুণকে হার মানায়। পক্ষান্তরে, এমন অনেক তরুণ রয়েছে – যারা নতুনকে গ্রহণ করতে পারে না, অন্ধবিশ্বাস ও গতানুগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, সত্যকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়। তারা আসলে তারুণ্যের খোলসে বার্ধক্যকে লালন করে। আর যেসব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়, ইতিবাচক ভাবনায় জীবনকে পরিচালিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে তারুণ্যের অমিতশক্তি ধারণ করে। তরুণরা সব সময়ে আলোর পথের যাত্রী। কঠিন সত্যকে মেনে নিয়ে তারা নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারে। যুক্তির আলোয় কুসংস্কারকে বাতিল করে তারা প্রতিষ্ঠা করে নতুন সত্য। তারা ধ্বংস ও মৃত্যুকে পিছনে ফেলে সৃষ্টির আনন্দে এগিয়ে যায়। তারুণ্যের এই বোধ ও অনুভূতি যে কোনো বয়সের মানুষের মধ্যে থাকতে পারে। প্রকৃত বৃদ্ধ তারা, যারা তারুণ্যের দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিতে চায় না, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনকে অস্বীকার করে, নতুন সূর্যের আলোয় অস্বস্তিবোধ করে। তারা তারুণ্যের অগ্রযাত্রায় অংশ নেওয়ার পরিবর্তে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

বার্ধক্যের পরিচয় বয়সে নয়, পশ্চাদ্‌মুখী দৃষ্টিভঙ্গিতে।

২০২৫

১০.
বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।

ভাব-সম্প্রসারণ: বিদ্যা মানুষের জীবনকে উন্নত করে। তাই বিদ্যা অর্জন অত্যাবশ্যক। তবে যে বিদ্যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো সংযোগ নেই, সে বিদ্যা অকার্যকর।

মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিদ্যাচর্চা করতে হয়। প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তি জীবনকে মহীয়ান করে গড়ে তোলেন। তিনি নিজে যেমন আলোকিত হন, তেমনি আলোকিত করেন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে। অপরদিকে বিদ্যাহীন মানুষ সমাজের বোঝাস্বরূপ। সে অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে থাকে। একমাত্র বিদ্যাই পারে সেই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে তাকে মুক্ত করতে। একজন প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ জীবনের বাস্তবতাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বিদ্যা তাকে জ্ঞানী করে, বিদ্যাই তার চিন্তা-ভাবনা ও আচার-ব্যবহারকে পরিশীলিত করে। এমনকি সংস্কৃতিবান ও উদার দৃষ্টির মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতেও বিদ্যার কোনো বিকল্প নেই। তবে কিছু বিদ্যা মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এসব বিদ্যা অর্জন করা অর্থহীন। মুখস্থ বিদ্যা আর গ্রন্থগত বিদ্যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কোনো কাজে আসে না। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায় না, কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করে না, এমনকি জীবনকে এগিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে দেয়। এমন বিদ্যা অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত নয়।

প্রকৃত শিক্ষা জীবনের সব দিককে আলোকিত করে। সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয় ব্যক্তি ও সমাজ। অন্যদিকে যে বিদ্যা জীবনকে ইতিবাচক পথে চালিত করতে পারে না, সে বিদ্যা মূল্যহীন।

১১.
মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।

ভাব-সম্প্রসারণ: দীর্ঘ জীবন নয়, বরং মহৎ কর্মের মধ্যে মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত। কর্মগুণে মানুষ অন্যের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়।

মানুষ অনন্তকাল বেঁচে থাকে না। একেক মানুষ একেক রকম আয়ু ভোগ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এমন অনেক মানুষ আছে, যারা দীর্ঘকাল পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্যদের কাছে বিস্মৃত হয়ে যায়। কারণ, তাদের জীবন বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে উল্লেখ করার মতো হয় না। জীবদ্দশায় তারা এমন কোনো কাজ করে যেতে পারে না, যার কারণে মানুষ তাদের স্মরণ করবে। তাই দীর্ঘায়ুর অধিকারী হয়েও সেসব ব্যক্তি জীবনকে গৌরবান্বিত করতে পারে না। পক্ষান্তরে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা স্বল্প আয়ুর জীবনে নিজেকে স্মরণীয় করে গেছেন। যুগ যুগ ধরে তাঁদের নাম উচ্চারিত হয়। পৃথিবীতে মহৎ হৃদয়ের মানুষ

মানবতার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন, দেশ ও জাতির স্বার্থে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। একুশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে গভীর জীবনবোধ ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। ভাষা আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, সেই রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার, তাঁরা সকলেই ছিলেন বয়সের দিক দিয়ে একেবারে তরুণ। অর্থাৎ স্মরণীয়-বরণীয় হওয়ার জন্য বয়স গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জীবনটা বেশি দিনের কি কম দিনের, সেটা মোটেই বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হলো মহৎ কর্ম করে বেঁচে থাকা। মহৎ কর্মের মাধ্যমে যাঁরা জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারেন, প্রকৃত অর্থে তাঁরাই দীর্ঘজীবী বা চিরজীবী।

১২.

মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে,
হারা শশীর হারা হাসি, অন্ধকারেই ফিরে আসে।

ভাব-সম্প্রসারণ: মানুষের জীবনে সুখ বা দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। সুখের পরে দুঃখ আসে, আবার দুঃখের পরে সুখ আসে। এজন্য সুখে যেমন অতিরিক্ত আত্মহারা হতে নেই, তেমনি বিপদেও ধৈর্যহারা হওয়া ঠিক নয়।

আকাশ যখন মেঘে আচ্ছন্ন হয়, সূর্য বা চাঁদের আলো তখন ঠিকমতো পৃথিবীতে পৌঁছায় না। ফলে দিনের বেলায় সূর্য দেখা যায় না, রাতের বেলায় চাঁদ দেখা যায় না। কিন্তু এমন ঘটনা খুবই সাময়িক। দিনের অধিকাংশ সময়ে সূর্য দেখা যায়। একইভাবে মেঘও চাঁদকে বেশিক্ষণ আড়াল করে রাখতে পারে না। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের হাসি তাই সবারই দেখার সুযোগ হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে মেঘের আড়াল যেমন সত্য, মেঘহীন আকাশও সত্য। একইভাবে মানুষের জীবনেও কখনো কখনো দুঃখ-দুর্দশার কালো মেঘ হাজির হয়। মনে হয়, এই দুর্দশা যেন আর কাটবে না। দুর্বলচিত্তের মানুষ তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা ভুলে যায়, মানুষের জীবনে কোনো কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নয়। জীবন-আকাশের এই কালো মেঘও বাস্তব মেঘের মতো সাময়িক। এজন্য বিপদে ভেঙে না পড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তা মোকাবিলা করতে হয়।

মানুষের জীবনে কোনো দুঃসময়ই চিরস্থায়ী বা অনিবার্য নয়। ধৈর্য ধরে দুঃসময়কে অতিক্রম করতে পারলেই সুখ-সূর্য বা সুখ-চাঁদের দেখা মেলে। জীবন তখন পুনরায় সুন্দর ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

১৩.

ভোগে নয়, ত্যাগেই মনুষ্যত্বের বিকাশ।

ভাব-সম্প্রসারণ: ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় ব্যক্তির লোভ-লালসা। তাই ভোগ নয়, ত্যাগের চর্চাই মানুষের সুন্দর গুণাবলিকে উৎকর্ষ দান করে।

ভোগ ও ত্যাগ দুটি বিপরীত বিষয়। মানুষ ইন্দ্রিয় সুখের আশায় ভোগে মত্ত হয়; অন্যদিকে মানসিক তৃপ্তির আশায় ত্যাগ স্বীকার করে। ভোগ সাময়িক সুখ আনতে পারে। তবে যিনি ত্যাগে কুণ্ঠিত হন না, তিনি অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। ভোগের নিমিত্তে মানুষ জড়িয়ে যায় পঙ্কিলতায় – হিংসা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে আপন করে নেয়। ভোগবাদী মানুষ তাদের সম্পদ কখনো পরার্থে ব্যয় করে না, পরের দুঃখে কাতর হয় না; বরং হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সুযোগের সন্ধান করে। মানবিকতা ও পরার্থপরতা তাদের কাছে অর্থহীন। তাই সমাজের মানুষের কাছেও তাদের কোনো মর্যাদা থাকে না। তারা জন্মগতভাবে মানুষ হলেও তাদের মনুষ্যত্ব আসলে বিকশিত হয় না। আবার কিছু মানুষ ভোগের চেয়ে ত্যাগকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মানুষের বিপদে তাঁরা ছুটে যান, নিজের সুবিধার কথা না ভেবে বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভাবেন, দুঃখীজনের দুঃখ দূর করতে নিজের সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পান। ভোগবাদী মানুষের ভ্রান্ত ধারণা – ভোগের মধ্যেই সকল সুখ। তাই তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়। তারা ভোগের মাধ্যমে সুখী হতে চায় বটে, তবে তারা প্রকৃত সুখের সন্ধান পায় না। বরং যেসব মানুষ নির্দ্বিধায় অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন, তাঁদের দ্বারা সমাজ যেমন উপকৃত হয়, তাঁরা নিজেরাও এসব কাজের মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ লাভ করেন।

ত্যাগের মহীমা অসীম। মনুষ্যত্ব বিকাশে ত্যাগের চর্চার কোনো বিকল্প নেই। ভোগ মনুষ্যত্বকে লজ্জা ও হীনতায় ডুবিয়ে রাখে।

১৪.

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

ভাব-সম্প্রসারণ: গতিশীলতা প্রাণের ধর্ম। যেখানে গতি নেই, চঞ্চলতা নেই, সেখানে স্থবিরতা জেঁকে বসে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় – সকল ক্ষেত্রেই স্থবিরতা যাবতীয় অর্জন ধ্বংস করে দেয়। তাই কৃতিত্ব, সাফল্য ও সমৃদ্ধির জন্য গতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই।

নদীর ধর্ম বয়ে চলা। স্রোতই তার গৌরব। স্রোত না থাকলে নদী ধীরে ধীরে মরে যায়। স্রোতের টানে বিশাল জলরাশি পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে ধেয়ে চলে। এই স্রোতই নদীকে প্রাণের স্পন্দনে জাগিয়ে রাখে, দুই পাড়ে জন্ম দেয় নতুন নতুন সভ্যতার। তার গতিচাঞ্চল্যে ফুটে ওঠে জীবনের বলিষ্ঠ প্রকাশ। সব জঞ্জাল ভাসিয়ে নিয়ে সব রকমের পঙ্কিলতা থেকে নদীকে মুক্ত রাখে স্রোত। তবে কখনো যদি এই স্রোত থেমে যায়, রুদ্ধ হয় কোনো গণ্ডির সীমায়, তবে নদী তার গৌরব হারায়। নদীর বুকে জন্ম নেয় অসংখ্য জলজ উদ্ভিদ, আবর্জনায় ঢেকে যায় টলমলে জলের ধারা। গতিচাঞ্চল্য, ছন্দময়তা আর জলকল্লোল হারিয়ে নদীটি নির্জীব

হয়ে পড়ে। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি নদীর মতো – গতিময়তায় তার প্রাণ; গতিহীনতায় তার মৃত্যু। আধুনিকতা, উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি – প্রতিটি ধারণার সঙ্গে উদ্যম, গতিময়তা ও পরিবর্তনশীলতার যোগ রয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা সমাজ যদি প্রাচীনতাকে আঁকড়ে ধরে নতুন সময়ে টিকে থাকতে চায়, তবে ওই ব্যক্তি বা সমাজ নতুন সময়ের দাবিকে উপেক্ষা করল। অযৌক্তিক বিশ্বাস, মিথ্যা ও সংকীর্ণ সংস্কার আর অচল ভাবনার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে যে জাতি পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে না, তারা স্রোতহীন নদীর মতো স্থবির হয়ে পড়ে। তাতে যুক্ত হয় মিথ্যা সংস্কারের নতুন নতুন জঞ্জাল। রুদ্ধ হয় সম্ভাবনার সকল দ্বার। আর যে জাতি একটি স্বাভাবিক চলনধর্ম মেনে নতুনকে স্বাগত জানায়, নিঃসঙ্কোচে আলিঙ্গন করে নতুন সভ্যতাকে, সংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করে নতুন জ্ঞানকে গ্রহণ করে, সে জাতিকে কখনো স্থবিরতা পেয়ে বসে না।

পরিবর্তন আর অগ্রগতির প্রধান শর্ত গতিশীলতা। সবকিছু স্থবির থাকলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার এতখানি অগ্রসরতা ঘটতো না।

১৫.

যে সহে, সে রহে।

ভাব-সম্প্রসারণ: এ সংসারে দুঃসময়ে যে ধৈর্য ধরে, ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সুসময়ের অপেক্ষা করে, সে কখনো পরাজিত হয় না। ধৈর্যশীলরাই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়।

পৃথিবীতে জীবন একদিকে যেমন পরম উপভোগ্য, অন্যদিকে পরাজয়, লাঞ্ছনা, হতাশা ও দুর্দশার কশাঘাতে জর্জরিত। রোগ-শোক ও অভাব-অভিযোগ সংসারের নিত্যদিনের চিত্র। তাই পীড়িত মানুষ যন্ত্রণায় অসহায়বোধ করে, আঘাতে-অপমানে জর্জরিত হয়, পরাজয়ের গ্লানিতে নিমগ্ন হয়ে হতাশায় মুষড়ে পড়ে। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না। খারাপ সময়কে মোকাবেলা করতে হবে। জীবনে পরাজয় থাকে। সে পরাজয় মেনে নিয়ে পরবর্তী যুদ্ধজয়ের সংকল্পে ব্রতী হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এজন্য দরকার অটল ধৈর্য, স্থির সংকল্প এবং যথাযথ পরিকল্পনা। এমন কিছু আঘাত আছে, যার বিপরীতে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে ধৈর্য ধরলেই ভালো ফল পাওয়া যায়। কারণ, সময় সবচেয়ে বড়ো চিকিৎসক। নিজের করা ভুলেও সব পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে, অযোগ্যতার দায়ে ভোগ করতে হতে পারে কঠিন দণ্ড। তখন ভেঙে না পড়ে ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে সবকিছু শুরু করতে হবে। তাহলেই মোচন করা সম্ভব হবে পূর্বের গ্লানি। বিপদে অসহায়ত্বকে বরণ করে হাত-পা গুটিয়ে থাকার মধ্যে নয়, তাকে মোকাবিলা করার মধ্যেই মানুষের সংগ্রামশীলতার পরিচয়।

জীবনে যত প্রতিকূলতাই আসুক না কেন, তাকে ধৈর্যের সঙ্গে ইতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে মোকাবেলা করতে হয়। কারণ, জীবনে দুঃসময় না এলে লড়াই করা শেখা যায় না।

পরিচ্ছেদ ৪৭
চিঠিপত্র

বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষকে চিঠিপত্র লিখতে হয়। ব্যক্তিগত সংবাদ জানাতে বা জানতে, প্রাতিষ্ঠানিক রীতি বা নিয়ম মান্য করতে, আনুষ্ঠানিক বক্তব্য জ্ঞাপনে, ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য – এ রকম নানা কারণে পত্র লেখা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্রের নমুনা এই পরিচ্ছেদে দেখানো হলো।

ব্যক্তিগত পত্র

আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিত-অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে লিখিত যোগাযোগের উপায় হিসেবে ব্যক্তিগত পত্রের জন্ম। ইন্টারনেট প্রযুক্তির যুগেও ব্যক্তিগত পত্রের কদর কমেনি, বরং ধরন বদলেছে। পূর্বে প্রধানত ডাক বিভাগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পত্রের আদান-প্রদান হতো। বর্তমানে ডাকের পাশাপাশি ই-মেইল আকারেও ব্যক্তিগত পত্রের আদান-প্রদান হয়। ব্যক্তিগত পত্রে মানুষের শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, রুচি ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। ব্যক্তিগত পত্রের গঠনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতেও দেখা যায়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নপত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপান-যাত্রী' ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত চিঠি লেখার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখতে হয়। পত্রের শুরুতে পত্ররচনার তারিখ ও স্থানের নাম উল্লেখ করতে হয়। যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে, তার সঙ্গে পত্রলেখকের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে তাকে কীভাবে সম্বোধন করা হবে। সাধারণত গুরুজনকে শ্রদ্ধেয়, মাননীয় ইত্যাদি সম্বোধন করা হয়। বয়সে ছোটো কাউকে পত্র লিখলে স্নেহের, কল্যাণীয় ইত্যাদি সম্বোধন করা হয়। বন্ধু বা প্রিয়জনের ক্ষেত্রে প্রিয়, প্রীতিভাজনেষু দিয়ে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। অপরিচিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নাম বা পদবির আগে প্রিয় বা জনাব লিখে সম্বোধনের কাজ সারা যায়। পত্রের মূল বক্তব্যে যাবার আগে সৌজন্য প্রকাশক কথাবার্তা লেখা হয়ে থাকে। সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী করে লেখার উপরই চিঠির সার্থকতা নির্ভর করে। চিঠির পূর্বাপর বক্তব্যের সামঞ্জস্য, সংগতি ও ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। পত্রের শেষে 'ইতি' লেখার একটি রেওয়াজ বাংলায় প্রচলিত আছে। এরপর সম্পর্ক অনুযায়ী বিদায় সম্ভাষণ লিখে চিঠির শেষে নাম লিখতে হয়। লিখিত চিঠিটি ডাকযোগে গেলে খামের উপরে নাম-ঠিকানা লিখতে হয়, ই-মেইল আকারে পাঠালে নির্দিষ্ট জায়গায় ই-মেইল ঠিকানা ও চিঠির বিষয় লিখতে হয়।

এখানে কয়েকটি ব্যক্তিগত পত্রের নমুনা উল্লেখ করা হলো।

১. মাতার কাছে পুত্রের চিঠি

২ সেপ্টেম্বর ২০১৯
মতিঝিল, ঢাকা

শ্রদ্ধেয় মা

আমার সালাম নিয়ো। আশা করি ভালো আছ।

আমি নিরাপদে ছাত্রাবাসে পৌঁছেছি। যদিও আসার পথে বাড়ির কথা ভেবে আমার মন খারাপ লাগছিল। প্রতিবারই বাড়ি থেকে আসার সময়ে আমার এ রকম হয়। এসেই জানতে পারলাম আগামী ১০ই নভেম্বর থেকে আমাদের প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষা শুরু হবে। তাই পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমার জন্য আশীর্বাদ কোরো। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ায় খানিকটা ছেদ পড়েছিল। তাই এখন বেশি পরিশ্রম করে লেখাপড়ার সাময়িক ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছি। মা, আমি তোমাকে আমার জীবনের লক্ষ্যের কথা জানিয়েছি। আমি সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করার চেষ্টা করব। আসার সময়ে মেহরাবকে কিছুটা অসুস্থ দেখে এসেছি। এখন ও কেমন আছে, জানিয়ো। বাবাকে শরীরের প্রতি যত্ন নিতে বোলো। আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি এখন ভালো আছি। ইতি

তোমার স্নেহের
মাহের

ডাকে পাঠানোর জন্য খামঃ

প্রেরক মাহের আবদুল্লাহ ২৪ আরামবাগ মতিঝিল ঢাকা ১০০০	ডাকটিকিট প্রাপক ফারজানা রাহমান প্রযত্নেঃ আবদুল্লাহ আল মামুন গ্রামঃ কামরানির চর ডাকঘরঃ পাঁচগাঁও উপজেলাঃ আড়াইহাজার জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ

২. কন্যার কাছে পিতার চিঠি

২৩ নভেম্বর ২০১৯
তেজগাঁও, ঢাকা

স্নেহের প্রাপ্তি

আমার আশীর্বাদ নিয়ো। আশা করি ভালো আছ।

গত চিঠিতে তোমার প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল জেনেছি। প্রায় সবগুলো বিষয়ে ভালো করেছ। গণিতে খানিকটা কম নম্বর পেয়েছ। এতে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। গণিতের কোন বিষয়গুলো বুঝতে এখনও সমস্যা হচ্ছে, তা আগে শনাক্ত করো। প্রয়োজনে তোমার ক্লাসের গণিত শিক্ষকের সহযোগিতা নাও। মুখস্থ না করে বুঝে পড়ার চেষ্টা কোরো। সামনে তোমার নির্বাচনী পরীক্ষা এবং এসএসসি পরীক্ষারও খুব বেশি দেরি নেই। তাই এই সময়টা খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে। জীবনে প্রতিটি মুহূর্তকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে হবে। পরীক্ষা শিক্ষাজীবনের একটি অংশ। তাই পরীক্ষাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই সময়ে কীভাবে সুস্থ থেকে নিয়মানুযায়ী পড়াশোনা করা যায়, সেদিকে খেয়াল রেখো। বেশি রাত জেগো না, যথাসময়ে খাবার খেয়ো। আমরা বাসার সবাই ভালো আছি। ইতি

তোমার বাবা
অনিরুদ্ধ রায়

ই-মেইলে পাঠানোর জন্য ঠিকানা ও বিষয়:

প্রেরক: aniruddharay@gmail.com
প্রতি: praptiray@gmail.com
বিষয়: উপদেশ

৩. ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি

৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
সোবহানবাগ, ঢাকা

প্রিয় মতি

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করিস। অনেকদিন হলো তোর কোনো চিঠি পাচ্ছি না। ক্যাডেট কলেজের বন্ধুদের পেয়ে আমার কথা কি ভুলে গেছিস? আজ তোকে লিখতে বসেছি এক ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা জানাতে। গত মাঘী পূর্ণিমার ছুটিতে আমি আর সীমান্ত গিয়েছিলাম ঐতিহাসিক স্থাপত্য নিদর্শন

লালবাগ কেল্লা দেখতে। ইতিহাসের বইয়ে শায়েস্তা খাঁর কথা পড়েছি। সেই শায়েস্তা খাঁর আমলে নির্মিত ঢাকার প্রায় চারশো বছরের পুরানো স্থাপনা এই লালবাগ কেল্লা। এর প্রাকৃতিক শোভা, প্রাচীন স্থাপত্য-সৌন্দর্যের কথা চিঠিতে লিখে পুরোপুরি তোকে বোঝাতে পারব না।

আমরা সেদিন সকালেই লালবাগের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম। পুরান ঢাকার লালবাগে এর অবস্থান। দর্শনার্থীদের জন্য ঢোকার প্রবেশ পথে টিকিট কাউন্টার। সেখানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটলাম। ভিতরে প্রবেশ করার পর কয়েকজন বিদেশি দর্শনার্থীকে দেখলাম। ফটকের ভিতরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক নয়নাভিরাম সৌন্দর্য। মুঘল স্থাপত্য, মসজিদ, উন্মুক্ত মাঠ, সুসজ্জিত ফুলের বাগান দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু ১৬৭৮ সালে। তৎকালীন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র সুবেদার আজম শাহ এই কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে এর মূল নির্মাণ সম্পন্ন হয়। লালবাগ কেল্লা মোঘল আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন। এটি তৈরিতে একই সাথে ব্যবহার করা হয়েছে কষ্টি পাথর, মার্বেল পাথর এবং রং-বেরঙের টালি। লালবাগ কেল্লার তিনটি বিশাল দরজার মধ্যে যে দরজাটি বর্তমানে জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া আছে, সেই দরজা দিয়ে ঢুকলে বরাবর সোজা চোখে পড়ে পরি বিবির সমাধি। পরি বিবি ছিলেন শায়েস্তা খাঁর অকালপ্রয়াত কন্যা। কেল্লার চত্বরে আরো রয়েছে কেন্দ্রস্থলের দরবার হল ও হাম্মামখানা, উত্তর-পশ্চিমাংশের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট শাহি মসজিদ ও একটি জাদুঘর। দর্শনার্থীদের জন্য বসার জায়গা আছে। স্থাপনাগুলো ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের খুব ভালো লেগেছে। সময় পেলে তুইও একবার দেখে আসিস বাংলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লালবাগ কেল্লা। ভালো থাকিস। ইতি

তোর বন্ধু
দীপ্র

ডাকে পাঠানোর জন্য খামঃ

প্রেরক দীপ্র সরকার ১৯ সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার সোবহানবাগ ঢাকা	ডাকটিকিট প্রাপক মতিউর রহমান নজরুল হাউস, কক্ষ নম্বরঃ ৩০ মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ডাকঘরঃ মির্জাপুর টাঙ্গাইল

৪. লেখকের কাছে পাঠকের চিঠি

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
মিরাবাজার, সিলেট

জনাব আহমদ সাদিক

আমার শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আমি আপনার পূর্বপরিচিত নই। আমি আপনার বইয়ের একজন পাঠক। এবারের একুশের বইমেলায় প্রকাশিত আপনার ‘বাংলাদেশের প্রান্তিক-উৎসব’ বইটি আমি পড়েছি। বইটি বইমেলা থেকেই সংগ্রহ করেছি। প্রত্যাশা ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আপনার স্বাক্ষর সংবলিত বইটি পাব। কিন্তু সেদিন আপনি স্টলে আসেননি। আমাকেও পরদিন সিলেটে ফিরতে হয়েছে।

‘বাংলাদেশের প্রান্তিক-উৎসব’ বইটি পড়ে আমি খুব উপকৃত হয়েছি। মূলধারার উৎসবের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলে যে কত উৎসব আছে, তা আপনার বই পড়ার আগে জানতে পারিনি। আপনি একজন নিষ্ঠাবান গবেষক হিসেবে অনেক আগে থেকেই পরিচিত। এই বই রচনায় আপনার সেই যোগ্যতার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে। আমি বেশি খুশি হয়েছি এই জন্য যে, সিলেট অঞ্চলের মণিপুরি, খাসিয়া ও চা শ্রমিকদের উৎসবের কথা আপনার বইয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। বইটির ভাষা ও অধ্যায়-বিভাজন আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। ৩১২ পৃষ্ঠার বইটি আমি দুই দিনে পড়ে শেষ করেছি।

আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রত্যাশা রইল। যদি কখনও সিলেটে আসেন, আমাকে জানালে ও আমাদের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করলে খুশি হব। আপনার জন্য শুভ কামনা। ইতি

আতিকুল ইসলাম

ই-মেইলে পাঠানোর জন্য ঠিকানা ও বিষয়:

প্রেরক: atikulislam@gmail.com
প্রতি: ahmadsadik@gmail.com
বিষয়: শুভেচ্ছা বার্তা

আমন্ত্রণপত্র

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানোর পত্রকে আমন্ত্রণপত্র বলে। বিভিন্ন জাতীয় দিবস, জন্মবার্ষিকী, বিবাহ, মৃত্যুবার্ষিকী, সাহিত্যসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বইমেলা, নাগরিক সংবর্ধনা, নাট্য-উৎসব, লোক-উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র রচনা করা হয়। আমন্ত্রণপত্র সাধারণত মুদ্রিত হয়। অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট তারিখের কিছুদিন পূর্বে আমন্ত্রিতদের মধ্যে আমন্ত্রণপত্র বিতরণ করা হয়। অনেক সময়ে আমন্ত্রণপত্রের উপরের দিকে অনুষ্ঠানের শিরোনাম লেখা থাকতে পারে। এখানে দুটি আমন্ত্রণপত্রের নমুনা উল্লেখ করা হলো:

১. রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র

রবীন্দ্র জয়ন্তী ১৪২৮

সুধী

আগামী ২৫শে বৈশাখ ১৪২৮ শনিবার ৮ই মে ২০২১ সকাল ১০টায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জামালপুর জিলা স্কুলের সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে স্কুল-মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন জামালপুর জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব আখতার জামান। 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন সরকারি বিনোদ বিহারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. আয়াজ মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আউয়াল ফয়সাল।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কামনা করি।

মুশফিক রোহান
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
জামালপুর জিলা স্কুল ছাত্রসংসদ

অনুষ্ঠানসূচি

১০:০০	:	অতিথিদের আসন গ্রহণ
১০:০৫	:	'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ
১০:৩০	:	প্রধান অতিথির ভাষণ
১০:৪৫	:	সভাপতির ভাষণ
১১:০০	:	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: সংগীত-নৃত্য-আবৃত্তি
১১:৩০	:	নাটক 'চিরকুমার সভা'
১২:০০	:	অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

২. নাগরিক সংবর্ধনা উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র

সুধী

আগামী ১৯শে মার্চ ২০২১ শুক্রবার বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে কুমিল্লা টাউন হল মিলনায়তনে অধ্যাপক-গবেষক নুরুল আলমের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আকতার হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন কথাসাহিত্যিক নোমান রায়হান।

অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করছি।

বিপুল বর্মণ
আহ্বায়ক
নুরুল আলম সংবর্ধনা পরিষদ

অনুষ্ঠানসূচি

৪:৩০	:	অতিথিদের আসন গ্রহণ
৪:৩৫	:	সূচনা সংগীত
৪:৫০	:	স্বাগত বক্তব্য
৫:০০	:	সংবর্ধনা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন
৫:১০	:	উত্তরীয় পরিধান ও ক্রেস্ট প্রদান
৫:১৫	:	বিশেষ অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য
৫:৪৫	:	প্রধান অতিথির বক্তব্য
৫:৫৫	:	অধ্যাপক নুরুল আলমের প্রতিক্রিয়া
৬:১০	:	সভাপতির বক্তব্য
৬:৩০	:	সমাপ্তি ঘোষণা

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য চিঠি

স্থানীয় বা জাতীয় কোনো সমস্যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলামে এক ধরনের পত্র মুদ্রিত হয়। এসব পত্রের একটি শিরোনাম থাকে। এতে সাধারণত কোনো সম্বোধন থাকে না। তবে পত্রলেখকের নাম ও পরিচয় মুদ্রিত হয়। পত্রিকায় এই ধরনের পত্র পাঠাতে পত্রিকা-সম্পাদকের বরাবর আলাদা একটি চিঠি লিখতে হয়।

নিচে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে দুটি চিঠির নমুনা উল্লেখ করা হলো।

১. স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুর্দশার কথা জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য চিঠি

৩ জুন ২০২১

সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২১৫

বিষয়: 'চিঠিপত্র' কলামে প্রকাশের জন্য পত্র।

মহোদয়
আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিকে সংযুক্ত পত্রটি প্রকাশ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাই।

বিনীত
জান্নাতুল মাওয়া
জুলগাঁও, শ্রীবর্দী, শেরপুর।

<u>জুলগাঁও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে নজর দিন</u>

শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী উপজেলার জুলগাঁও একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম। দুই দশক আগে কমিউনিটি স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় পাহাড়-টিলা-বন পরিবেষ্টিত দুর্গম এ-অঞ্চলের সাধারণ মানুষের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আশেপাশের ছয়টি গ্রামের দশ হাজার মানুষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এখানকার চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য অন্তত পাঁচ জন চিকিৎসক থাকার কথা, আছেন তিন জন; তাঁরাও নিয়মিত আসেন না। ভবনটিও সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। নিয়মিত ওষুধের সরবরাহ নেই। সাধারণ মানুষ যথাযথ চিকিৎসা না পেয়েই ফিরে যাচ্ছে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা হয়তো জেলাশহরে বা ঢাকায় গিয়ে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা পেতে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।

এলাকাবাসীর দাবি, এই করুণ অবস্থা থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে রক্ষা করা হোক। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার। যথাযথ কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে জুলগাঁও স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির নিয়মিত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জুলগাঁও গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রত্যাশা করে।

জান্নাতুল মাওয়া
জুলগাঁও, শেরপুর।

প্রেরক	প্রাপক (ডাকটিকিট)
----------------	----------------
----------------	----------------

২. সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিকারের দাবি জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী চিঠি

২৫ এপ্রিল ২০১৯

সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো
১৯ কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫

বিষয়: 'চিঠিপত্র' কলামে প্রকাশের জন্য পত্র।

মহোদয়
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সড়ক-দুর্ঘটনার প্রতিকার সংক্রান্ত একটি পত্র এইসঙ্গে যুক্ত করা হলো। পত্রটি ছাপা হলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে।

২০২৫

বিনীত
লিটন রোজারিও
নীলক্ষেত, ঢাকা।

<u>সড়ক দুর্ঘটনার অবসান চাই</u>

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান সমস্যা ও আতঙ্কের নাম সড়ক দুর্ঘটনা। প্রায়ই টেলিভিশনের পর্দায় ও পত্রিকার পাতায় চোখে পড়ে সড়ক দুর্ঘটনার মর্মান্তিক খবর। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন অনেক মানুষ আহত ও নিহত হচ্ছে। একটি পত্রিকার তথ্য মতে, ২০২০ সালে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার সড়ক দুর্ঘটনায় সাত হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। মৃত্যুর মিছিল যেন থামছে না। আহত অনেকে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। এই ধরনের মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটি এখন জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এর প্রতিকার জরুরি। প্রতিটি মানুষের প্রাণ মহামূল্যবান। তাই আমরা চাই না, সড়ক দুর্ঘটনায় আর একটি প্রাণও ঝরে পড়ুক। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। আমাদের দেশে সাধারণত কয়েকটি কারণে সড়ক দুর্ঘটনা হয়ে থাকে; যেমন – অনুপযোগী রাস্তা, ত্রুটিযুক্ত গাড়ি, অনভিজ্ঞ চালক, ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পণ্য পরিবহণ, ওভারটেকিং, ট্রাফিক আইন অমান্য করা ইত্যাদি। পথচারীদের ফুটপাত, জেব্রা ক্রসিং, ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করার ফলেও অনেক সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে। সমস্যা যেহেতু চিহ্নিত, সেহেতু এর থেকে মুক্তির পথ বের করা আমাদের জন্য মোটেই কঠিন হবে না। রাস্তাগুলোকে নিয়মিত সংস্কার করার পাশাপাশি প্রয়োজনে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। আমরা আশা করি, সমস্যা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

লিটন রোজারিও
নীলক্ষেত, ঢাকা।

প্রেরক	প্রাপক (ডাকটিকিট)
----------------	----------------
----------------	----------------

মানপত্র

আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টিকে বরণ করা, বিদায় দেওয়া, সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানানোর জন্য যে পত্র রচনা করা হয়, তাকে মানপত্র বলে। মানপত্র সাধারণত বহু দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতিতে পাঠ করা হয়। এ ধরনের পত্রের ভাষা খানিকটা অলংকারমণ্ডিত হতে পারে। তবে এর আয়তন সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাঁর বা যাঁদের উদ্দেশে মানপত্র পড়া হয়, মানপত্রে তাঁর বা তাঁদের দক্ষতা, যোগ্যতা, কৃতিত্ব প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়ে থাকে। মানপত্র সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে অথবা ছাপিয়ে বাঁধাই করা যেতে পারে।

নিচে দুটি মানপত্রের নমুনা দেখানো হলো।

১. এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে মানপত্র

বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের
২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে
মানপত্র

হে বিদায়ী অগ্রজবৃন্দ
যেপথ একদিন তোমাদের নিয়ে এসেছিল এই বিদ্যালয়ের সবুজ আঙিনায়, আজ সেই পথই আবার তোমাদের ডাক দিয়েছে: 'কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত!' হৃদয়-বীণায় তাই আজ বাজছে বিদায়ের করুণ সুর। শুভ হোক তোমাদের ভবিষ্যতের পথচলা। তোমরা আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করো।

হে অগ্রজ সতীর্থবৃন্দ
এই বিদ্যালয়ে তোমাদের কেটেছে স্মৃতিময়, প্রীতিময় অনেক দিন। তোমাদের প্রাণোচ্ছল পদভারে এই বিদ্যালয়ের আঙিনা ছিল মুখরিত। তোমাদের সাহচর্যে আমরাও নানাভাবে উপকৃত হয়েছি, সমৃদ্ধ হয়েছি। তোমাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহসিক্ত প্রীতিময় বন্ধন যেন অটুট থাকে আজীবন। এই বিদায় আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। একবার এই বিদ্যাময়ীর স্নেহতলে আশ্রয় নিলে তিনি কখনও কাউকে মন থেকে বিদায় দেন না। তোমরা শিক্ষাজীবনের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উন্নীত হতে যাচ্ছ, যে জন্য তোমাদের অভিনন্দন। আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় তোমাদের সাফল্য কামনা করি।

হে অগ্রপথিকবৃন্দ
নবজীবনের আহ্বানে, আলোকিত জীবনের সন্ধানে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ নবদিগন্তের দিকে। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই বাংলাদেশের দুঃখ, দারিদ্র্য ও অন্ধকার ঘুচিয়ে তোমরা গড়ে তুলবে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ – এ আমাদের প্রত্যাশা। তোমরাই আনবে সোনালি উষার আলোকিত দিন।

তোমাদের নতুন অভিযাত্রা সফল হোক।

তারিখ: ২৩ জানুয়ারি ২০২১

তোমাদের প্রীতিধন্য অনুজবৃন্দ
বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

২. খ্যাতিমান কবি বা সাহিত্যিকের আগমন উপলক্ষে অভিনন্দনপত্র

রাজশাহী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে
নন্দিত কথাসাহিত্যিক জনাব আহমদের আগমনে
শ্রদ্ধার্ঘ্য

হে বরেণ্য অতিথি
বরেন্দ্রভূমি নামে খ্যাত রাজশাহী আজ আপনার পদধূলিতে ধন্য। রবীন্দ্র-স্মৃতিধন্য এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনার শুভাগমনে আমরা আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। আপনার সাহচর্য পেয়ে আমরা উৎসাহিত ও উজ্জীবিত। আপনি আমাদের প্রাণঢালা শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করুন।

হে নন্দিত কথাশিল্পী
বাংলাদেশের সমকালীন কথাসাহিত্যে আপনার অবদান অনন্য। নিম্নবিত্ত মানুষ ও মধ্যবিত্ত জীবন রূপায়ণে আপনার শৈল্পিক দক্ষতা বিস্ময়কর ও চূড়াস্পর্শী। কথাশিল্পী হিসেবে আপনার উন্নত জীবনবোধ, শৈল্পিক চৈতন্য পাঠকদের মুগ্ধ করে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে আপনার রয়েছে বিপুল জনপ্রিয়তা। আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা মুগ্ধ ও অভিভূত।

হে ভবিষ্যতের দিশারি
আপনার লেখা আমাদের নতুন পথের দিশারী। নতুন প্রজন্মকে আলোকিত মানুষ করে তুলতে আপনার লেখনী কাজ করে চলেছে নীরবে, নিভৃতে। আমাদের বিদ্যালয়ে আপনার আগমন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক। আপনি দীর্ঘজীবী হোন। বাংলাদেশের সাহিত্যের আকাশে আপনার সাহিত্যকর্ম চির-উজ্জ্বল সূর্যের মতো আলো ছড়াক। এই আমাদের একান্ত কামনা।

তারিখ: ১২ ডিসেম্বর ২০২১

শ্রদ্ধাসহ,
আপনার গুণমুগ্ধ শিক্ষার্থীবৃন্দ
রাজশাহী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

আবেদনপত্র

স্কুল-কলেজে কিংবা বিভিন্ন অফিসে বা সংস্থায় প্রতিষ্ঠান-প্রধান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখার প্রয়োজন হয়। এ ধরনের পত্রকে দরখাস্ত বা আবেদনপত্র বলে। আবেদনপত্রের আকার সাধারণত সংক্ষিপ্ত হয়। সেখানে মূল প্রসঙ্গটি যথাযথভাবে উপস্থাপন করাটাই লক্ষ্য। এ ধরনের পত্রে অনেক সময়ে প্রমাণ স্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করা হয়।

নিচে তিনটি আবেদনপত্রের নমুনা দেখানো হলো।

১. ছুটির জন্য আবেদন

১২ জুলাই ২০২১

প্রধান শিক্ষক
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা

মাধ্যম: শ্রেণিশিক্ষক, নবম শ্রেণি

বিষয়: অনুপস্থিতির কারণে ছুটি প্রদানের আবেদন।

মহোদয়

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির একজন নিয়মিত শিক্ষার্থী। জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে গত ১৬ই মে ২০২১ থেকে ১৮ই মে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) দিন আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারিনি।

আমার অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিত ওই ৩ দিনের ছুটি মঞ্জুর করতে আপনার সদয় মর্জি কামনা করছি।

বিনীত
মৌমিতা শবনম
শ্রেণি: নবম
রোল নং: ১২

সংযুক্তি:
১. চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র

২. পাঠাগার স্থাপনের জন্যে আবেদন

৪ জুলাই ২০২১

চেয়ারম্যান
ফুলঝুড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
বরগুনা সদর উপজেলা
বরগুনা

বিষয়ঃ পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

মহোদয়

আমরা বরগুনা জেলার সদর উপজেলার ফুলঝুড়ি ইউনিয়ন পরিষদের বাসিন্দা। আমাদের ইউনিয়নের বাসিন্দাদের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক। তাদের অনেকেই বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকুরিসহ নানা পেশায় যুক্ত। বর্তমানে এই ইউনিয়নে যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত অভূতপূর্ব উন্নয়নের কারণে নানা প্রকার সহশিক্ষাক্রম কর্মকাণ্ড এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই ইউনিয়নে অব্যাহত শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোনো পাঠাগার নেই। যেজন্য এই অঞ্চলের জনগণ নিয়মিতভাবে বই পাঠ করার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই অবস্থায় ফুলঝুড়ি ইউনিয়নে একটি পাঠাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
ফুলঝুড়ি ইউনিয়নবাসীর পক্ষে
মোঃ হাবিবুর রহমান
গ্রামঃ ফুলঝুড়ি, ডাকঘরঃ ফুলঝুড়ি, জেলাঃ বরগুনা।

৩. সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন

১০ অক্টোবর ২০২১

প্রধান শিক্ষক
কুলকান্দি শামসুন্নাহার উচ্চ বিদ্যালয়
কুলকান্দি, ইসলামপুর
জামালপুর

বিষয়: বাংলা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন।

মহোদয়
সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম, আপনার বিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী। আমার ব্যক্তিগত তথ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপ:

১. নাম : রেখা আক্তার
২. মাতার নাম : খোদেজা বেগম
৩. পিতার নাম : একরামুল হক
৪. বর্তমান ঠিকানা : ৩৩ পশ্চিম নয়াপাড়া, জামালপুর সদর উপজেলা
জেলা: জামালপুর
৫. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: হরিণধরা, ডাকঘর: কুলকান্দি
ইউনিয়ন: কুলকান্দি, উপজেলা: ইসলামপুর
জেলা: জামালপুর
৬. জন্ম তারিখ : ২৫ জুন ১৯৯৪
৭. জাতীয়তা : বাংলাদেশি
৮. ধর্ম : ইসলাম
৯. শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষা	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**	**বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়**	**পাশের বছর**	**বিভাগ**	**ফলাফল**
এসএসসি	শহিদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়	ঢাকা	২০১১	মানবিক	জিপিএ ৪.০০

এইচএসসি	ইসলামপুর ডিগ্রি কলেজ	ঢাকা	২০১৩	মানবিক	জিপিএ ৪.৫০
বিএ (সম্মান)	জাহেদা শফির মহিলা কলেজ	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	২০১৭	বাংলা	সিজিপিএ ৩.০০

আমার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

নিবেদক

(স্বাক্ষর)
রেখা আক্তার
৩৩ পশ্চিম নয়াপাড়া
জামালপুর সদর উপজেলা
জেলাঃ জামালপুর

সংযুক্তিঃ
ক. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের অনুলিপি
খ. জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি
গ. দুই কপি ছবি
ঘ. তিনশো টাকার পে-অর্ডার

২০২৫

ব্যাবসায়িক পত্র

নিজের প্রয়োজনে বা ব্যবসার কাজে অনেক সময়ে বিভিন্ন ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পত্র-বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের পত্রকে ব্যাবসায়িক পত্র বলে। এসব পত্রের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক থাকে।

নিচে দুটি ব্যাবসায়িক পত্রের নমুনা দেখানো হলো।

১. ডাকযোগে পুস্তক পাঠানোর আবেদন

৭ জানুয়ারি ২০২১

বিক্রয় কর্মকর্তা
অজন্তা প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০

বিষয়: ভিপি হিসেবে ডাকযোগে পুস্তক পাঠানোর আবেদন।

প্রিয় মহোদয়

আপনাদের প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত নিচের তালিকাভুক্ত বইগুলোর একটি করে কপি নিচের ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি। ভিপি হিসেবে ডাকযোগে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলে বইগুলো গ্রহণের সময়ে আমি যাবতীয় অর্থ পরিশোধ করতে পারব। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে অগ্রিম ধন্যবাদ জানাই।

আপনার বিশ্বস্ত

(স্বাক্ষর)
মকবুল হোসেন
৪৯ পাঁচুড়িয়া, গোপালগঞ্জ

বইয়ের তালিকা:
১. ইকবাল সিরাজ, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*
২. নাজমুল হক, *সঠিক নিয়মে লেখাপড়া*
৩. মাহফুজা আক্তার, *ঘুরে এলাম বাগেরহাট*

২. ব্যাংক ঋণের জন্যে আবেদন

৩০ আগস্ট ২০২১

ব্যবস্থাপক
সোনালী ব্যাংক লি.
কালীগঞ্জ শাখা, ঝিনাইদহ

বিষয়: ব্যাবসায়িক ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন।

প্রিয় মহোদয়

আপনার ব্যাংকে আমাদের সঞ্চয়ী ও চলতি উভয় প্রকার হিসাব খোলা আছে। আপনি হয়তো অবগত যে, আমাদের ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান মেসার্স জননী ট্রেডার্স দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের ব্যাংকে সুনামের সাথে লেনদেন পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি আমরা আমাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামে আনুমানিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। উক্ত ঋণের মূলধন এবং সুদের অর্থ আমরা মোট ৩৬ কিস্তিতে ৩ বছরে পরিশোধ করতে চাই। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের ব্যাংকের সকল শর্ত মেনে চলব। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে আমরা আপনাদের ব্যাংক থেকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ঋণ নিই এবং তা যথাসময়ে পরিশোধ করি।

আমাদের চাহিদা মাফিক ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

আপনার বিশ্বস্ত

(স্বাক্ষর)
অনীক রহমান
স্বত্বাধিকারী, মেসার্স জননী ট্রেডার্স
কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ
সোনালী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব নং: ১১৭৭১৮
চলতি হিসাব নং: ১২৫২০১

সংযুক্তি:
১. ব্যবসা সম্প্রসারণের কর্মপরিকল্পনা
২. পূর্বের ঋণ পরিশোধের প্রমাণপত্র

পরিচ্ছেদ ৪৮

সংবাদ প্রতিবেদন

প্রচারমাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত বিবরণীকে সংবাদ প্রতিবেদন বলে। যিনি এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন, তাঁর নাম প্রতিবেদক। প্রতিবেদককে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হয় এবং ঘটনার পক্ষপাতহীন বিবরণ তৈরি করতে হয়।

সংবাদ প্রতিবেদনের শুরুতে একটি শিরোনাম থাকে। এরপর প্রতিবেদকের নাম, ঘটনার স্থান ও তারিখ উল্লেখ করতে হয়।

নিচে কয়েকটি প্রতিবেদনের নমুনা দেওয়া হলো।

১. বিদ্যালয়ের নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ প্রতিবেদন

<u>বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত</u>

মনীষা তঞ্চঙ্গ্যা, বান্দরবান, ২৯ জানুয়ারি ২০২১ ॥ বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ২৮শে জানুয়ারি ২০২১ রবিবার বিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য নবীনবরণ এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালুটিলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি উদয় কুমার চাকমা। তিনি বলেন, এই এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিদ্যালয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নবীন শিক্ষার্থীদের তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করার আহ্বান জানান এবং ২০২১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করেন।

এ বছর বিদ্যালয়টির মানবিক শাখা থেকে পঞ্চাশ জন, বিজ্ঞান শাখা থেকে চল্লিশ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে পঁচিশ জনসহ সর্বমোট একশ পনেরো জন পরীক্ষার্থী আগামী ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। বালুটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজয় ত্রিপুরা এই নবীনবরণ ও বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ললিত সরকার, বালুটিলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুহিতুল আলম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অনেক শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে এ দিনের সাড়ম্বর আয়োজন সমাপ্ত হয়।

২. এলাকার সড়কের দুরবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন

<u>সড়কের বেহাল দশাঃ যাত্রীদের দুর্ভোগ</u>

হাসিবুল আলম, চাটখিল (নোয়াখালী), ২২ জুলাই ২০২১ ॥ নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার জয়াগ বাজার থেকে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ পর্যন্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধা একরামুল হক সড়কটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে সড়কটির কোনো সংস্কার কাজ হয়নি। সড়কের এ বেহাল দশায় যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, বারো কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির পুরোটাই বড়ো বড়ো গর্ত ও খানাখন্দে ভরা। জয়াগ বাজার থেকে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের নগরপাড়া সেতু পর্যন্ত দুই কিলোমিটার অংশে দুই পাশের মাটি সরে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে নোয়াখালীর চাটখিল ও সোনাইমুড়ি, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম এবং চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার হাজার হাজার বাসিন্দা চলাচল করে। এছাড়া কমপক্ষে ত্রিশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পথে যাতায়াত করে থাকে। এলাকাবাসী জানান, সড়কটির তিন কিলোমিটার সোনাইমুড়ি এবং বাকি নয় কিলোমিটার চাটখিল উপজেলায় পড়েছে। বিগত ২০১৯ সালের বন্যায় সড়কটির সুরকির স্তর দেবে গিয়ে বালু বের হয়ে আসে এবং সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। এরপর প্রতি বর্ষায় বৃষ্টিপাতে পানি ও কাদায় সড়কটি একাকার হয়ে যায়, যা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত বুধবার একটি পিকআপ ভ্যান ভাওরকোট গ্রামের কাছে রাস্তার গর্তে পড়ে যায়, এতে চালকসহ তিন জন যাত্রী আহত হন।

চাটখিল ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মানুষ মনে করে, সড়কটি নিয়ে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ দীর্ঘদিনের। অথচ এর সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। এটি মেরামতের জন্য স্থানীয় লোকজন সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে একাধিকবার আবেদন করলেও কোনো প্রতিকার পায়নি। এলাকাবাসীর দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি দ্রুত সংস্কার করে জনদুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৩. বিদ্যালয়ে 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপন সম্পর্কিত সংবাদ প্রতিবেদন

<u>রূপনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপিত</u>

জবেদ হোসেন, মিরপুর, ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ॥ 'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে রূপনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গতকাল ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা প্রভাতফেরির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময়ে সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে একুশের গান – 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। ভাষা-শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিদের নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করে। আবৃত্তি শেষে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক দল। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল আলোচনা-সভা। 'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর উপরে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক আবেদুর রহমান। তিনি বলেন, 'মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনা বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধিকার আন্দোলনে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তা প্রেরণার উৎস।' এরপর আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজিজুর রহমান।

৪. বৃক্ষরোপণ বিষয়ক সংবাদ প্রতিবেদন

<u>রৌমারীতে বৃক্ষরোপণ উৎসব</u>

পিয়াস বাড়ৈ, রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ২২ জুলাই ২০২১ ॥ রৌমারী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল ২১শে জুলাই বুধবার রৌমারী উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে রৌমারী উচ্চ বিদ্যালয়সহ উপজেলার দশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় পাঁচ শত শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের মধ্যে একটি ফলদ ও একটি বনজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়। এর আগে রৌমারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রৌমারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আমীন। এ সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে মোহাম্মদ আমীন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্বের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন হতে বলেন। প্রতি বছর প্রত্যেকের বাড়ির ফাঁকা জায়গায় অন্তত দুইটি গাছের চারা রোপণের পরামর্শ দেন। এরপর বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উত্তর প্রান্তে একশো মেহগনি, শিশু ও সেগুন গাছের চারা রোপণ করা হয়।

৫. সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা বিষয়ক সংবাদ প্রতিবেদন

চারুকলায় সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ॥ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। সকাল নয়টায় অনুষদ প্রাঙ্গণের বকুলতলায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নির্দিষ্ট রচনা থেকে লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। দুটি বিভাগে ছিল এ আয়োজন – বাংলা ও ইংরেজি। বিকালে ছিল পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বিভাগে তিন জন করে মোট ছয় জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন এই চারুকলা অনুষদের শিক্ষক অধ্যাপক মুকুল কুমার মিত্র, ড. আয়শা সুলতানা ও ড. আফজাল হোসেন খান। জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্কৃতিকর্মী জনাব ফজলুল হক। এরপর চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পর্ব উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক ও অতিথিবৃন্দ।

পরিচ্ছেদ ৪৯
প্রবন্ধ

প্রবন্ধ এক প্রকার গদ্য রচনা। কোনো বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে প্রবন্ধ রচিত হয়। সব ধরনের প্রবন্ধকে অন্তত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা – বর্ণনামূলক প্রবন্ধ, চিন্তামূলক প্রবন্ধ ও ব্যক্তি অনুভূতিমূলক প্রবন্ধ। পরবর্তী নমুনা অংশের 'বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প' বা 'ভাষা আন্দোলন' প্রবন্ধকে বলা যায় বর্ণনামূলক প্রবন্ধ, 'সময়ানুবর্তিতা' বা 'মাদকাসক্তি' প্রবন্ধকে বলা যায় চিন্তামূলক প্রবন্ধ, এবং 'লঞ্চ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা' বা 'কোনো ঘটনার স্মৃতি' প্রবন্ধকে বলা যায় ব্যক্তি অনুভূতিমূলক প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ লেখার কিছু সাধারণ নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক. ভূমিকা হলো প্রবন্ধের প্রবেশক অংশ। এটি সাধারণত এক অনুচ্ছেদের হয়। এই অংশে প্রায়ই মূল আলোচনার ইঙ্গিত থাকে।

খ. উপসংহার হলো প্রবন্ধের সমাপ্তি অংশ। প্রবন্ধের প্রকৃতি অনুযায়ী এখানে সাধারণত ফলাফল, সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি স্থান পায়।

গ. প্রবন্ধের মূল অংশ একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত হয়ে থাকে। অনুচ্ছেদগুলো যাতে সমরূপ থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। যুক্তি বা কালের অনুক্রম মনে রেখে অনুচ্ছেদগুলোর সমরূপতা ঠিক করা যেতে পারে।

ঘ. বিশেষভাবে বর্ণনামূলক ও চিন্তামূলক প্রবন্ধের বেলায় অনুচ্ছেদগুলোর আলাদা শিরোনাম থাকে। এগুলোর নাম অনুচ্ছেদ-শিরোনাম। এসব শিরোনামের পরে কোলন যতি (:) দিয়ে লেখা শুরু করা যায়।

ঙ. প্রবন্ধের ভাষা হওয়া উচিত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।

চ. প্রবন্ধের প্রতিটি অনুচ্ছেদ লেখার সময়ে প্রবন্ধের শিরোনামের কথা মনে রাখতে হয়, তাতে প্রবন্ধের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রবেশ করতে পারে না।

ছ. উদ্ধৃতি ব্যবহারে সতর্ক হওয়া উচিত। অপরিহার্য না হলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা ঠিক নয়। বিশেষভাবে বাংলা প্রবন্ধের মধ্যে অন্য কোনো ভাষার উদ্ধৃতি বর্জনীয়।

জ. প্রবন্ধের নির্দিষ্ট কোনো আয়তন নেই। এমনকি এর অনুচ্ছেদসংখ্যাও নির্দিষ্ট করা যায় না। তবে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা কমবেশি এক হাজার হতে পারে।

প্রবন্ধের কয়েকটি নমুনা নিচে দেখানো হলো।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

ভূমিকা: মানুষ ভ্রমণ করতে পছন্দ করে। এই পছন্দকে কাজে লাগিয়ে ভ্রমণ-বান্ধব এক ধরনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যার নাম পর্যটন শিল্প। এই শিল্পের কাজ হলো কোনো অঞ্চলের দর্শনীয় স্থানগুলোর তথ্য ভ্রমণপিপাসু মানুষের কাছে তুলে ধরা, ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত করা এবং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা। বাংলাদেশের একাধিক বনাঞ্চল, পাহাড়-নদী-ঝরনা, শস্যশোভিত মাঠ ও সবুজ প্রকৃতি, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র-সৈকত, নান্দনিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা ও নিদর্শন প্রভৃতি দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

তাই বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর। এগুলোর টানে বিপুল সংখ্যক বিদেশি পর্যটকের বাংলাদেশে আসার সুযোগ রয়েছে। এভাবে বাংলাদেশ পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রথমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন-কেন্দ্রসমূহের দিকে তাকানো যাক।

সুন্দরবন: বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ৬ হাজার বর্গকিলোমিটারের অধিক জায়গা জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও বরগুনা জেলায় এর অবস্থান। সুন্দরী বৃক্ষ, গোলপাতাসহ নানা জাতের উদ্ভিদ এবং চিত্রল হরিণ, বাঘ, বানর, হনুমানসহ নানা জাতের পশুপাখির আবাস এই সুন্দরবন। অভ্যন্তরে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য খালে রয়েছে কুমির। রোমাঞ্চপ্রিয় পর্যটকগণ নৌযানে করে সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে যেতে পারেন। ভয় ও ভালো-লাগার অপূর্ব মিশেলের কারণে সুন্দরবন ভ্রমণ যে-কোনো পর্যটকের স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে থাকে।

সিলেটের রাতারগুল: সিলেট জেলার গোয়াইনঘাটে অবস্থিত রাতারগুল জলাবন বাংলাদেশের একমাত্র মিঠাপানির বন। এর আয়তন ৩ হাজার ৩২৫ একর। ১০ ফুট গভীর পানির উপর বনের গাছপালা জেগে থাকে। বর্ষাকালে পানির গভীরতা হয় ২০-৩০ ফুট পর্যন্ত। পর্যটকগণকে নৌকায় করে বনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এখানে উপভোগ করার মতো আছে কদম, হিজল, অর্জুন, ছাতিম প্রভৃতি গাছের সৌন্দর্য। বেড়াতে বেড়াতে দেখা হয়ে যায় বানর, বেজি, গুঁইসাপ, কিংবা সাদা বক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি প্রভৃতি প্রাণী ও পাখির সঙ্গে।

সমুদ্র সৈকত: কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম (১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ) প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত। সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকরা ভিড় করেন কক্সবাজারে। সমুদ্র ছাড়াও কক্সবাজার জেলায় রয়েছে একাধিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ধর্মীয় উপাসনালয় ও বুদ্ধ মূর্তি। স্থাপত্যশিল্পের বিচারে এগুলো অমূল্য। এছাড়া চট্টগ্রামের পতেঙ্গা, কক্সবাজারের ইনানি, পটুয়াখালীর কুয়াকাটা, সুন্দরবনের কটকা প্রভৃতি সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণপিপাসুরা বেড়াতে যান। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। সমস্ত দ্বীপ জুড়ে রয়েছে নারিকেল গাছ। দ্বীপ থেকে সমুদ্রের নীল জলরাশির সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং নানা রকমের প্রবাল দেখতে পর্যটকরা সেন্টমার্টিন দ্বীপে ভ্রমণ করেন।

পার্বত্য অঞ্চল: বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহ অর্থাৎ রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র। একদিকে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মেঘ ছোঁয়ার আনন্দ, অন্যদিকে প্রাকৃতিক জলের উৎস ঝরনাধারা পর্যটকদের অভিভূত করে। রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদে নৌকায় ভেসে বেড়ানো যায়। হ্রদের উপরে একটি সুদৃশ্য ঝুলন্ত সেতু রয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলার অন্তর্গত আলুটিলা পাহাড়, রিসাং ঝরনা, মায়াবিনী লেক

২০২১

প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের হাতছানি পর্যটকরা অগ্রাহ্য করতে পারে না। সিলেটের জাফলং-এর পিয়াইন নদীতে মনোমুগ্ধকর পাথুরে জলের ধারা, মৌলভীবাজারের মাধবকুণ্ড ঝরনা; হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল ও পঞ্চগড়ের চা বাগান; শ্রীমঙ্গলের ইকোপার্ক প্রভৃতি স্থান প্রায় সারাবছরই পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত থাকে। এ অঞ্চলসমূহে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের বর্ণিল জীবনাচারও পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের একমাত্র পার্বত্য দ্বীপ মহেশখালী। বিখ্যাত আদিনাথ মন্দির ও বড়ো রাখাইনপাড়া বৌদ্ধ মন্দির এই দ্বীপেই অবস্থিত।

পুরাকীর্তি: বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। পুরান ঢাকার লালবাগে অবস্থিত মুঘল স্থাপত্য লালবাগ কেল্লা, বুড়িগঙ্গার তীরে নির্মিত আহসান মঞ্জিল, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও-এ গড়ে ওঠা অনুপম স্থাপত্য শৈলীবিশিষ্ট পানাম নগর, কুমিল্লায় আবিষ্কৃত প্রাচীন নগর ময়নামতী, বগুড়ার প্রাচীন পুরাকীর্তি মহাস্থানগড়, নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার অন্তর্গত আড়াই হাজার বছর পূর্বের প্রত্ননিদর্শন সংবলিত উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রাম, নওগাঁ জেলায় আবিষ্কৃত পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বৌদ্ধবিহার পাহাড়পুর, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে প্রাচীন ও আধুনিক স্থাপত্যকলার বহু নিদর্শন।

ঐতিহাসিক স্থাপনা: আরেক শ্রেণির স্থাপত্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল প্রাঙ্গণে স্থাপিত কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদদের প্রতি নিবেদিত ও ঢাকার সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ, ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত জাতীয় জাদুঘর, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ, ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ঢাকার মিরপুরে নির্মিত বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এবং এই উদ্যানে স্থাপিত স্বাধীনতা জাদুঘর ইতিহাসপ্রেমী পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অবস্থা: পর্যটন বিশ্বব্যাপী একটি সম্ভবনাময় খাত। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে জানা যায়, বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের সম্মিলিত বার্ষিক ভ্রমণ-ব্যয় ৫০ হাজার কোটি টাকা। এমন অনেক দেশ রয়েছে, যার প্রধান আয়ের উৎস পর্যটন। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প দিনে দিনে বিকাশ লাভ করছে। একদিকে বিদেশি পর্যটকদের আগমন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলছে, অন্যদিকে দেশীয় পর্যটকদের ভ্রমণ সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রতি বছর ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ দেশীয় পর্যটক বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে। এদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। এই বিপুল সংখ্যক পর্যটক বিভিন্ন স্থানে চলাচল করায় পর্যটনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনীতি গতি লাভ করে। পরিবহণ, আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ, পোশাক, অলংকার প্রভৃতি ব্যবসায় পর্যটন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে জড়িত। পর্যটনের বিকাশে অসংখ্য মানুষের জীবিকারও সংস্থান হয়। বর্তমানে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, পর্যটন শিল্প থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত জিডিপি অর্জন করা সম্ভব।

পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব: একটি দেশের পর্যটন শিল্প বিকশিত হলে সেই দেশের সংস্কৃতিও সমৃদ্ধ হয়। পর্যটন এলাকায় অধিবাসীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। পর্যটকদের আগ্রহ রয়েছে এমন স্থান, স্থাপনা বা বিষয়ের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদেরও শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। তারা নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় তাগিদ অনুভব করে। এছাড়া পর্যটনের সূত্রে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের মেলবন্ধন একটি মানবিক বিশ্ব তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

পর্যটন শিল্পের বিকাশে করণীয়: পৃথিবী ব্যাপী পর্যটন শিল্প এখন দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। বাংলাদেশে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি নজর দিলে পর্যটন এলাকাগুলোতে পর্যটকদের যাতায়াত বাড়বে। প্রথমেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত যাতায়াত ব্যবস্থার দিকে। উন্নত পথ ও যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকলে পর্যটকরা নিরুৎসাহিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলসহ বেশকিছু পর্যটনকেন্দ্রে পৌঁছানোর সহজ পথ ও যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি। পর্যটকরা যাতে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে ভ্রমণ করতে পারে, তার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অতিরিক্ত ভ্রমণ-ব্যয় পর্যটকদের ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করে। তাই, যাতায়াত এবং থাকা-খাওয়াসহ সংশ্লিষ্ট ব্যয় যাতে সীমার মধ্যে থাকে তা বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

উপসংহার: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্থাপত্যকলা, স্থানীয় অধিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও সংস্কৃতি পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট। তবে পর্যটনকে একটি শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ও স্থায়ী রূপ দিতে দরকার রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও এর প্রয়োগ। স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি পর্যটনকেন্দ্রের অধিবাসীদেরও পর্যটকদের সহযোগিতায় সম্পৃক্ত করা উচিত। পর্যটকদের যথাযথ নিরাপত্তা ও সহযোগিতা দেওয়া গেলে ভ্রমণের প্রতি তাদের উৎসাহ আরো বাড়বে। এর ফলে একদিকে যেমন বাংলাদেশের মানবিক সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিচয় বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতির চাকা আরো গতিশীল হবে।

বাংলাদেশের উৎসব

ভূমিকা: উৎসব সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মধ্যে নিহিত থাকে একটি জনপদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কিংবদন্তী এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস ও ভালো-মন্দ লাগার উপাদান। কোনো দেশ বা সমাজের উৎসব সম্পর্কে জানা থাকলে সেই দেশ বা সমাজের মানুষকেও অনেকখানি জানা হয়ে যায়। উৎসব হতে পারে কোনো জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক, আবার হতে পারে জনপদ বা ভূখণ্ডকেন্দ্রিক। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের উৎসবের প্রচলন রয়েছে। তবে অধিকাংশ উৎসবই কোনো না কোনো ঋতু বা মাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এসব উৎসব মানুষের মনে কেবল আনন্দেরই সঞ্চার করে না বরং এর মধ্য দিয়ে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্রটি ফুটে ওঠে।

বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি উৎসব সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

বাংলা বর্ষবরণ: বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সর্বজনীন উৎসব বাংলা বর্ষবরণ। পুরানো দিনের দুঃখ, ব্যথা, ক্লান্তি, গ্লানি ভুলে নতুনকে বরণ করে নেওয়ার উৎসব এটি। এই উৎসব বাংলাদেশের সর্বত্র পালিত হয়। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল শ্রেণি-পেশা-বয়সের মানুষ এই উৎসব পালন করে। এ উপলক্ষে মেলা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ব্যবসায়ীরা এই দিনে হালখাতা নামে হিসাবের নতুন খাতা খোলেন এবং বকেয়া আদায় উপলক্ষে গ্রাহকদের নিমন্ত্রণ করে মিষ্টিমুখ করান। বৈশাখের প্রথম দিনটিতে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে সামর্থ্য অনুযায়ী মজাদার খাবারের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক আড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয় বাংলা নববর্ষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে বের করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। নতুন বছরের সূর্যোদয়ের মুহূর্তে রমনার বটমূলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বৈসাবি: বাংলাদেশে তিনটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বর্ষবরণ উৎসব 'বৈসাবি'। শব্দটি বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু – এই তিন নামের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত। বৈসু, সাংগ্রাই ও বিজু যথাক্রমে ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমাদের বর্ষবরণ উৎসব। সাধারণত বছরের শেষ দুই দিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিন বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বৈসাবি উদ্‌যাপিত হয়।

নবান্ন: নবান্ন হলো নতুন ধানের উৎসব। হেমন্ত কালে ঘরে ঘরে নতুন ধান ওঠে। এ সময়ে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়। আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে ঘরে ঘরে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে।

একুশে ফেব্রুয়ারি: একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির দীর্ঘ দিনের সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের ইতিহাস। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মিছিলকারীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। তাদের উপর তৎকালীন সরকারের নির্দেশে পুলিশ গুলি চালায়। এতে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেকে শহিদ হন। এই আত্মত্যাগ এবং দীর্ঘ সংগ্রামের ফলস্বরূপ ১৯৫৪ সালে বাংলা পায় রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি। শহিদদের স্মৃতিকে স্মরণ করতে ও শ্রদ্ধা জানাতে পরের বছর থেকেই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। নগ্ন পায়ে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ, শহিদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, আলোচনা সভা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে সারা দেশে দিবসটি পালিত হয়। শহিদদের আত্মদান ও পৃথিবীর সকল মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়। পরের বছর অর্থাৎ ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দিবসটির এই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসঃ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি নানা উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়ে থাকে। অফিসে, বাড়িতে, সড়কে, যানবাহনে সর্বত্র বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা শোভা পায়। এদিন জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ সারা দেশের স্মৃতিসৌধগুলোতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। একই সঙ্গে শিশুকিশোরসহ বিভিন্ন বাহিনীর কুচকাওয়াজ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়।

বিজয় দিবসঃ ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানি দখলদারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে ১৯৭১ সালের এই দিনে মুক্তিযোদ্ধারা বিজয় অর্জন করে। দিনটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের। তাই ডিসেম্বর এলেই সমগ্র দেশ লাল-সবুজে সেজে ওঠে। ১৬ই ডিসেম্বর জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ সারা দেশের স্মৃতিসৌধগুলোতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক উৎসব, ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও বই মেলার আয়োজন করা হয়।

বইমেলাঃ বইমেলা বাংলাদেশের আরেকটি প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বইমেলা – ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা। এই বইমেলা পরিণত হয় পাঠক ও লেখকের মিলনমেলায়। বইমেলায় অনেক লেখক তাঁদের নতুন বই যেমন প্রকাশ করেন, তেমনি পূর্বে প্রকাশিত বইও মেলায় পাওয়া যায়। বইমেলা এখন আর কেবল বই কেনাবেচার মেলা নয়, এটি পরিণত হয়েছে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক উৎসবে।

ঈদঃ ঈদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব। ঈদ মানে আনন্দ, খুশি। ঈদ আসে আনন্দ আর মিলনের বার্তা নিয়ে। এই দিনে ধনী-নির্ধন ভেদাভেদ ভুলে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেয়। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে সাড়ম্বরে ঈদ উৎসব পালিত হয়। বছরে দুটি ঈদ। প্রথমে আসে ঈদ-উল ফিতর এবং পরে ঈদ-উল আজহা। রমজান মাসের শেষে হিজরি শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে ঈদ-উল ফিতর উদ্‌যাপিত হয়। জিলহজ মাসের দশম দিনে পালিত হয় ঈদ-উল আজহা। ঈদ-উল আজহায় পশু কোরবানি করা হয়। একে বলা হয় আত্মত্যাগের ঈদ। দুটি ঈদেই মুসলমানরা নতুন পোশাক পরে, ধনীরা গরিবদের দান করে। ঈদগাহে ঈদের নামাজের আয়োজন করা হয়। নামাজের পর একে অন্যের সঙ্গে কোলাকুলি করে। বাড়িতে ভালো খাবারের আয়োজন করা হয়। নিজে খেয়ে এবং অন্যকে খাইয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়।

দুর্গা পূজা: হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা। শরৎকালে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তমী অষ্টমী নবমী এই তিন দিন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সপ্তমীর আগের দিন ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধন অনুষ্ঠান হয়। নবমীর পরদিন দশমীর উৎসবকে বলা হয় বিজয়া দশমী। বোধন থেকে বিসর্জনের দিনগুলো বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনকে আন্দোলিত করে। পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হয় পূজা মণ্ডপ, থাকে প্রসাদের আয়োজন। বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় মেলা। দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব হলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আনন্দ নিয়ে পূজামণ্ডপে ঘুরতে যায়। অষ্টমীর দিন আনন্দ আর জাঁকজমক থাকে বেশি। রাতে হয় আরতি। দশমীর দিন দেবী-বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা।

বুদ্ধ পূর্ণিমা: বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উদ্‌যাপিত হয় বলে এর অন্য নাম বৈশাখী পূর্ণিমা। এই দিনের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জন্ম, তিরোধান ও বোধিলাভের স্মৃতি জড়িত। প্রার্থনা ও দান-দক্ষিণার মাধ্যমে এবং ফানুশ উড়িয়ে এই উৎসব পালন করা হয়।

বড়ো দিন: বাংলাদেশের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা পালন করে বড়ো দিন। যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে তারা এ উৎসব পালন করে। প্রতি বছর ২৫শে ডিসেম্বর বড়ো দিনের উৎসব পালিত হয়। গির্জায় প্রার্থনা করে, কেক কেটে, চকলেট বিতরণ করে, গান গেয়ে এই উৎসব পালন করা হয়।

অন্যান্য উৎসব: এছাড়া সারা বছরই বাংলাদেশে কোনো না কোনো উৎসব পালিত হয়। যেমন: রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, লালন-উৎসব, মধুমেলা, মহররম, ঈদ-ই মিলাদুন নবি, সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মী পূজা, প্রবারণা পূর্ণিমা, ইস্টার সানডে ইত্যাদি।

উপসংহার: মানুষের জীবনে উৎসবের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। উৎসব মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী গড়ে তোলে। আনন্দমুখর উৎসব-প্রাঙ্গণে ঘুচে যায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। উৎসব ছাড়া সকল শ্রেণির মানুষের মিলনমেলার চিত্র কল্পনাই করা যায় না। জাতীয় উৎসবগুলো মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমকে জাগ্রত করে। উৎসবের মধ্যে যে মূল্যবোধের বীজ আছে তাকে জাগ্রত করতে পারলে নিজস্ব সংস্কৃতি যেমন রক্ষা পাবে, তেমনি মানুষের মধ্যে গড়ে উঠবে প্রীতি ও সৌহার্দ্য।

জগদীশচন্দ্র বসু

ভূমিকা: যাঁদের অবদানে আধুনিক বিজ্ঞান এমন উৎকর্ষের শীর্ষে আরোহণ করেছে, তাঁদের মধ্যে বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর নাম সর্বজনস্বীকৃত। উপমহাদেশে তিনি ছিলেন প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া বিজ্ঞানী। বর্তমান বিশ্বে যোগাযোগ প্রযুক্তির যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে, তার পিছনে জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান ছিল প্রারম্ভিক। তিনিই প্রথম বিনা তারে শব্দ প্রেরণের প্রযুক্তি বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন। উদ্ভিদের প্রাণ আছে, এই ধারণা আবিষ্কার করে তিনি পৃথিবীর পরিবেশবিদ্যাতেও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন। একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানী হিসেবে তিনি বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চার অহংকার।

জন্ম ও বাল্যকাল: জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। জগদীশচন্দ্র বসুর পূর্বপুরুষ বাস করতেন মুন্সীগঞ্জ জেলার রাড়িখাল গ্রামে। তাঁর বাবার নাম ভগবানচন্দ্র বসু। তিনি পেশায় ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। জগদীশের লেখাপড়া শুরু হয় ফরিদপুরের গ্রামীণ বিদ্যালয়ে। পরে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৮৮০ সালে বিএ পাশ করার পর তিনি ইংল্যান্ডে যান। এরপর ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৮৫ সালে মাতৃভূমিতে ফিরে এসে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন।

অধ্যাপনা জীবন: প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর অধ্যাপনা জীবন খুব সুখের ছিল না। নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। যেমন এখানে ব্রিটিশ ও দেশীয় অধ্যাপকদের মধ্যে বেতনের বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এর প্রতিবাদে তিনি এক নাগাড়ে তিন বছর পর্যন্ত বেতন গ্রহণ করেননি। এখানে গবেষণার করার মতো পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাও ছিল না। ছোটো একটি কক্ষকে গবেষণাগার বানিয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি তাঁর গবেষণার কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

পদার্থবিদ্যায় অবদান: পদার্থবিদ্যায় গবেষণায় জগদীশচন্দ্র বসুর মৌলিক আবিষ্কার হলো, বিনা তারে রেডিও সংকেত পাঠানোর যন্ত্র তৈরি করা। সে সময়ে তারের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শব্দ পাঠানো যেত। ১৮৯৫ সালে তিনি প্রথমবারের মতো বিনা তারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শব্দ পাঠাতে সক্ষম হন। মাইক্রোওয়েভ গবেষণার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান আছে। তিনিই প্রথম বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে মিলিমিটার পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। তিনি রেডিও সংকেতকে শনাক্তকরণের জন্য অর্ধপরিবাহী জংশন ব্যবহার করেন। এই আবিষ্কার পেটেন্ট করে বাণিজ্যিক সুবিধা নেওয়ার বদৌলতে তিনি সেটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এসব অবদানের কারণে প্রযুক্তি-পেশাজীবীদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং' তাঁকে রেডিও বিজ্ঞানের জনক হিসেবে অভিহিত করেছে।

জীববিজ্ঞানে অবদান: উদ্ভিদবিদ্যাতেও জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান অনন্য। তিনি উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের উপর বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। উদ্ভিদের সূক্ষ্ম নড়াচড়া শনাক্ত করা এবং বিভিন্ন উদ্দীপকে উদ্ভিদের সাড়া দেওয়া ইত্যাদি ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। আবিষ্কার করেন উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড করার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ নামক যন্ত্র। উদ্দীপকের প্রতি উদ্ভিদের সাড়া দেওয়ার প্রকৃতি যে বৈদ্যুতিক, সেটিও তিনি প্রমাণ করেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য কৃতিত্ব: ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবনের উপার্জিত সমস্ত অর্থ তিনি এই গবেষণাগার নির্মাণ করতে ও এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনতে ব্যয় করেন। বাংলা ভাষার একজন বিখ্যাত লেখক হিসেবেও জগদীশচন্দ্র বসুর খ্যাতি রয়েছে। তাঁর একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম 'অব্যক্ত'।

উপসংহার: ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বসু মৃত্যুবরণ করেন। পরাধীন দেশে বাস করেও আজীবন তিনি যে মৌলিক সাধনা করেছেন, তা এখন সমগ্র বিশ্বের অহংকার। আর্থিকভাবে তিনি যথেষ্ট সচ্ছল ছিলেন না; তা সত্ত্বেও তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার উৎস।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

ভূমিকা: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে বলা হয় বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায়। তিনি এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন বাঙালি মুসলমান সমাজ, বিশেষত নারীসমাজ শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সব দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। তখন পর্দাপ্রথার কঠোর শাসনে নারীসমাজ ছিল অবরোধবাসিনী। রোকেয়া পিছিয়ে পড়া সমাজের এই বৃহত্তর অংশকে শিক্ষা ও কর্মের আলোয় আলোকিত করতে নিজের জীবনকে নিবেদন করেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে নারী আজ শিক্ষাদীক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে, আদালতে সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

রোকেয়ার পরিবার ও সমাজ: রোকেয়ার পারিবারিক নাম রোকেয়া খাতুন। তাঁর পিতা জহির উদ্দিন মুহম্মদ আবু আলী সাবের ছিলেন একজন জমিদার। তাঁর মাতার নাম রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী। রোকেয়ার দুই বোন করিমুন্নেসা ও হুমায়রা; তাঁর বড়ো দুই ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম আবুল আসাদ সাবের ও খলিলুর রহমান সাবের। পারিবারিক প্রথা অনুসারে পাঁচ বছর বয়স থেকে পর্দার কঠোরতার মধ্যে রোকেয়াকে শৈশবকাল অতিবাহিত করতে হয়। শৈশবে আরবি-ফারসি-উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও রোকেয়ার পিতা বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাছাড়া তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় ঘরের বাইরে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ মেয়েদের ছিল না। কিন্তু মেধাবী রোকেয়ার লেখাপড়ার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ।

পাঁচ বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি একজন ইংরেজ মেমের কাছে কিছুদিন লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বোনের এই বিদ্যানুরাগ দেখে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষিত ভাই ইব্রাহিম সাবের ইংরেজি শেখান রোকেয়াকে। পিতার কঠোর নজর এড়িয়ে রোকেয়া বড়ো দুই ভাই-বোনের সহযোগিতায় বাংলা-ইংরেজি শিক্ষায় উৎসাহী ও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বোন করিমুন্নেসার অনুপ্রেরণায় রোকেয়া বাংলা সাহিত্য রচনা ও চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি একইসঙ্গে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করেন। ১৮৯৮ সালে বিহারের ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিবাহ হয়। স্বামীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বা আর. এস. হোসেন নামে পরিচিত হন। স্বামীর ঐকান্তিক উৎসাহ ও সহযোগিতায় রোকেয়া পড়াশোনা ও সাহিত্যচর্চা অব্যহত রাখেন। ১৯০৯ সালে তাঁর স্বামীর জীবনাবসান ঘটে।

নারীশিক্ষা বিস্তার: বাংলার মুসলমান সমাজে রোকেয়া দুই ভাবে অবদান রাখেন। প্রথমত, শিক্ষাবিস্তারে এবং দ্বিতীয়ত, সাহিত্য সৃষ্টিতে। স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে রোকেয়া তাঁর স্বামীর স্মরণে মাত্র পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে তাঁর নারীশিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯১১ সালে কলকাতায় স্কুলটি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রোকেয়া মুসলমান নারীদের সামনে আধুনিক শিক্ষার দরজা খুলে দেন। স্কুলটিতে ধীরে ধীরে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ ইংরেজি স্কুলে পরিণত হয়। রোকেয়া বাঙালি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য কেবল স্কুলই প্রতিষ্ঠা করেননি, ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করেছেন। মেয়েদের স্কুলে নেওয়ার জন্য পৃথক গাড়িরও ব্যবস্থা করেন তিনি। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯২৯ সালে কলকাতায় মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাহিত্যে অবদান: বাংলা সাহিত্যে রোকেয়ার আনুষ্ঠানিক পদার্পণ ঘটে ১৯০২ সালে কলকাতার 'নবপ্রভা' পত্রিকায় 'পিপাসা' নামক রচনা প্রকাশের মাধ্যমে। এরপর 'নবনূর', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী' প্রভৃতি সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতে থাকেন। তাঁর লেখনী তৎকালীন মুসলিম সমাজকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। রক্ষণশীল সমাজ তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। রোকেয়া তাঁর লেখায় যেমন নারীমুক্তির কথা বলেছেন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ত্রুটিগুলোকে নির্দেশ করেছেন, একইভাবে নারীর মানসিক দাসত্বেরও সমালোচনা করেছেন। নারীর অলংকারকে রোকেয়া দাসত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। রোকেয়া তাঁর নারীবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'মতিচূর' প্রথম খণ্ড (১৯০৪) ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯২২)। 'সুলতানাজ ড্রিম' (১৯০৮) তাঁর একটি ইংরেজি রচনা যা পরবর্তী কালে 'সুলতানার স্বপ্ন' নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিকে বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যের একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) ও 'অবরোধবাসিনী' (১৯৩১) তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি রচনা। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। হাস্যরস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সাহয্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসম অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর সকল রচনাই নারীশিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।

নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ছিলেন একজন সমাজসচেতন, সংস্কারমুক্ত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রগতিশীল লেখক ও সমাজকর্মী। রোকেয়া মনে করতেন, পড়তে লিখতে পারাই নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো নারীকে তার অধিকার লাভে সক্ষম করে তোলা। প্রকৃত শিক্ষা একজন নারীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। নারীরা যাতে অন্যের গলগ্রহ হয়ে জীবন যাপনে বাধ্য না হয়, সে-বিষয়ে তিনি নারীদের সচেতন করতে সামাজিক আন্দোলন চালিয়ে যান। শিক্ষাগ্রহণে নারীর সচেনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা 'মুসলিম নারীদের সমিতি' গড়ে তোলেন। মুসলিম নারী সমাজকে সংগঠিত করতে 'নিখিল ভারত মুসলিম মহিলা সমিতি', 'বেগম উইমেন্স এডুকেশনাল কনফারেন্স', 'নারীতীর্থ সংস্থা' প্রভৃতি সংগঠনে যোগ দেন এবং নারীর উন্নয়নে দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনী ধারণ করেন। নারীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য পুরুষের বহুবিবাহ, নারীদের বাল্যবিবাহ এবং পুরুষের একতরফা তালাক প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। রোকেয়ার এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন পাশ হয়।

উপসংহার: সমাজ ও নারী কল্যাণ সাধনে রোকেয়ার অবদান অনস্বীকার্য। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রসরতার পেছনে নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু নারীকে পিছনে রেখে সমাজের সার্বিক অগ্রগতি যে সম্ভব নয়, তা রোকেয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই রোকেয়ার সংগ্রাম ছিল পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা।

লঞ্চ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

ধান, নদী ও খালের জন্য বিখ্যাত বরিশাল। সেই বরিশালে যাওয়ার একটি সুযোগ পেয়ে গেলাম। তাও আবার লঞ্চে! ছোটো খালার শ্বশুরবাড়ি বরিশালে। গত মাসে যখন তাঁরা সপরিবার সেখানে যাচ্ছিলেন, আমাকেও যাওয়ার জন্য প্রস্তাব করলেন। আমি রাজি হয়ে গেলাম। কারণ, বাসে, ট্রেনে, এমনকি নৌকায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে; কিন্তু লঞ্চে ভ্রমণের সুযোগ হয়নি। খালাতো ভাই রাজীবের মুখে লঞ্চ ভ্রমণের মজার মজার অনেক কথা শুনেছি। তাই আমি রাজি হতে মোটেও দেরি করিনি।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আমরা সদরঘাটে পৌঁছলাম। ঘাটের টিকিট কিনে প্রবেশ করলাম জেটিতে। দেখলাম প্রকাণ্ড সব লঞ্চ জেটির সঙ্গে বাঁধা। প্রত্যেক অঞ্চলের লঞ্চ আলাদা আলাদা করে রাখা। কর্মচারীরা নিজ নিজ লঞ্চে ওঠার জন্য যাত্রীদের জোর গলায় ডেকে চলেছে। জেটিতে প্রচুর মানুষ। নানা গন্তব্যের যাত্রীরা নিজেদের লঞ্চটি খুঁজে নিচ্ছে। কেউ একা, কারো সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা। হকাররা তাদের পণ্য সাজিয়ে যাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। হকাররা শুধু জেটিতেই নয়, নৌকায় করেও বিক্রি করছে তাদের জিনিসপত্র। নদীর ওপার থেকে ছোটো ছোটো নৌকায় যাত্রীরা এপারে আসছে।

প্রত্যেকটি লঞ্চই উজ্জ্বল আলোয় সজ্জিত। আমরা বড়ো একটি লঞ্চে উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে নির্ধারিত স্থানে ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস রাখলাম। লঞ্চটি ৪ তলাবিশিষ্ট। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এর

দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০ মিটার। বেশ কৌতূহল নিয়ে লঞ্চটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দোতলা ও তিন তলায় সারবাঁধা বিলাসবহুল কক্ষ। নিচতলার পুরোটাই ডেক। নিচতলার ডেকের মেঝেতে যাত্রীরা চাদর বিছিয়ে নিজের শোয়ার ব্যবস্থা করছে। লঞ্চের পিছন দিকে ইঞ্জিনরুম, রেস্তোরাঁ ও একটি চায়ের দোকান। জানা গেল জরুরি চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টহল দিচ্ছে আনসার সদস্যরা।

রাত ৯টার দিকে লঞ্চ বরিশালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। যদিও লঞ্চ ছাড়ার সময় ছিল সাড়ে আটটা। ধীরে ধীরে জেটির মানুষগুলো ছোটো হতে হতে ঝাপসা হয়ে গেল। আমরা ঘাট থেকে অনেক দূরে চলে এলাম। লঞ্চের সারেং একটু পরপর সাইরেন বাজাচ্ছেন আর সার্চলাইট ফেলে পথটা দেখে নিচ্ছেন। অনেকক্ষণ চলার পর একটি বড়ো নদী দেখতে পেলাম। তীর দেখা যায় না। নদীটির নাম শুনলাম মেঘনা। এটি বাংলাদেশের গভীরতম ও প্রশস্ততম নদী। রেলিং ধরে দাঁড়ালে যতদূর চোখ যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোটো ছোটো আলোকবিন্দু চোখে পড়ে। খালা জানালেন ওগুলো মাছধরা নৌকা। নৌকাগুলো দেখে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কথা মনে পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরপর একটি দুটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা ভটভট আওয়াজ তুলে উল্টো দিকে যাচ্ছে কিংবা আমাদের লঞ্চ সেগুলোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। আকাশের তারকারাজি আর নদীতে ভেসে থাকা আলোকবিন্দুগুলো অপরূপ দৃশ্য তৈরি করেছে। একসময় রাতের খাওয়ার সময় হয়ে গেল। লঞ্চে রান্না করে ইলিশ মাছ ভাজা আর ডাল দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম। খাওয়া শেষে বসলাম কেবিনের সামনে চেয়ারে। সবাই মিলে রাতের নীরব সৌন্দর্য উপভোগ করছি আর গল্প করছি।

ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা। যাত্রীদের কেউ কেউ শুয়ে পড়েছে আবার কেউ কেউ আড্ডা দিচ্ছে। ডেকে হকার তেমন দেখা যাচ্ছিল না। খালামণি বরিশালের বিখ্যাত ব্যক্তিদের গল্প শোনাচ্ছেন। রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী অশ্বিনীকুমার দত্ত, অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর, 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা বিজয় গুপ্ত, কুসুমকুমারী দাশ ও তাঁর পুত্র জীবনানন্দ দাশ, সুফিয়া কামাল, কামিনী রায়, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানের রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী এবং গানটির সুরকার আলতাফ মাহমুদসহ আরো অনেকের কথা জানলাম যাঁরা এই বরিশালেরই মানুষ। প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশের শহরে যাচ্ছি ভেবে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। হঠাৎ নৌপুলিশের একটি স্পিডবোট গতি কমিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও অবৈধ মালামাল পরিবহণ রোধে এই অন্ধকার রাতেও তারা টহল দিচ্ছে। দূরে আরো কয়েকটি লঞ্চ দেখা যাচ্ছে। সারেং মাঝে মাঝে সাইরেন বাজাচ্ছে। একটু পরপরই সার্চলাইট ফেলে পথ দেখে নিচ্ছে। সারেঙের কক্ষে গিয়ে দেখলাম কত রকমের প্রযুক্তি তারা ব্যবহার করছে – রাডার, কম্পাস, জিপিএস ইত্যাদি।

হয়তো প্রথমবার লঞ্চে চড়ছি বলে উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না। তবুও খালামণির কথায় শুয়ে পড়লাম। ভোর পাঁচটার দিকে খালামণি ডেকে তুললেন – 'এই তোরা ওঠ! আমরা বরিশালে পৌঁছে গিয়েছি।' হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম। দেখলাম ঘাটে আরো কয়েকটি লঞ্চ বাঁধা। যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে। ভিড় কমলে আমরাও ব্যাগগুলো নিয়ে নেমে পড়লাম। গত রাতটি আমার জীবনের স্মরণীয় একটি রাত হয়ে থাকবে। অসাধারণ একটি ভ্রমণের ভালো-লাগা নিয়ে আমরা পা ফেললাম জীবনানন্দের শহরে।

একটি ঝড়ের রাত

বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। এসব অভিজ্ঞতার কোনোটি আনন্দদায়ক, কোনোটি রোমাঞ্চকর আবার কোনোটি প্রচণ্ড ভয়ের। যে ঘটনাগুলো মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়, আহত করে বা ভীতিবিহ্বল করে, মানুষ তা সহজে ভোলে না। একটি ঝড়ের রাত তেমনই আমার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আমি যখনই সে-রাতের কথা ভাবি, ভয়ে শিউরে উঠি। অন্ধকার রাত, ঝোড়ো বাতাসের গর্জন, সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি, হুড়মুড় করে চালা ঘরগুলোর ভেঙে পড়ার শব্দ, ভয়ার্ত মানুষের আর্তনাদ – সবকিছু আমার মনে ছবির মতো ভেসে ওঠে।

সকাল থেকেই ঈশান কোণে মেঘ জমছিল। কালো কালো পুঞ্জীভূত মেঘে দুপুরের পরই দিনের আলো হারিয়ে গেল। বাতাসও যেন থমকে দাঁড়িয়েছিল। বেতার ও টেলিভিশনে বারবার বিপদ সংকেত জানানো হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা সবাইকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশনা দিচ্ছে। তা শুনে মানুষও দলে দলে আশ্রয়কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে। আমাদের পাকা দেয়ালে টিনের চালার বাড়ি। তাই বাবা বললেন, এখানে আমরা নিরাপদে থাকবো।

সন্ধ্যা হতে হতে প্রকৃতি এক অপরিচিত রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। রাখালেরা গরুর পাল নিয়ে আগেভাগেই বাড়ি ফেরে। মাঝিরা নিরাপদ স্থানে নৌকা বাঁধে। নদীর ধারে দেখা গেল বেশ কয়েকজন নারী চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে অস্পষ্ট জেলে-নৌকাগুলোর দিকে। প্রিয়জনের জন্য কাতর অপেক্ষা, পাখিদের ব্যস্ত হয়ে নীড়ে ফেরা, হাটুরেদের আতঙ্কিত পদক্ষেপ, থেকে থেকে গবাদি পশুর আর্তনাদ যেন আসন্ন বিপদের আভাস দিচ্ছিল। অল্পক্ষণেই অন্ধকারের চাদরে চারপাশটা ঢেকে গেল। বিদ্যুৎ চমকে আঙিনা থেকে দিগন্ত পর্যন্ত যেটুকু চোখে পড়ে, তার সবটাই আমার কাছে ভূতুড়ে লাগছিল।

সন্ধ্যার পর থেকে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগলো। তা ঝড়ো বৃষ্টিতে রূপ নিতে সময় নিল না। দানবীয় শক্তি নিয়ে ঝড় আছড়ে পড়ল আমাদের লোকালয়ে। আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বাবা-মার গা-ঘেঁষে বসে আছি। হারিকেনের আবছা আলোয় পরিবেশটা আরো থমথমে। এর মধ্যে ঝড়োবৃষ্টির একটানা শব্দে কানে তালা লাগার মতো অবস্থা। বাবা বললেন, শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। টিনের চাল জায়গায় জায়গায় ছিদ্র হয়ে বৃষ্টির পানি পড়তে আরম্ভ হলো। মনে হলো যে-কোনো সময়ে পুরো চালাটি আমাদের মাথার উপরে খসে পড়বে। বাবা আমাদের নিয়ে একটি মজবুত খাটের নিচে অবস্থান নিলেন। কিছুক্ষণ পরেই পায়ের নিচে পানির প্রবাহ টের পেলাম। বুঝলাম দরজার নিচ দিয়ে ঘরে একটু একটু করে পানি ঢুকছে। তখনও পর্যন্ত বাবা খাটের নিচে থাকা নিরাপদ মনে করলেন। পাশের বাড়ি থেকে নারী-পুরুষের আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছিল। বাবা চিৎকার করে তাদেরকে আমাদের ঘরে আসতে বললেন। কিছুক্ষণ পরেই বিকট শব্দে কিছু একটা আছড়ে পড়লো বাড়ির একপাশে। বাতাসের প্রবল তোড়ে উড়ে গেল পিছনের বারান্দার চাল।

অল্পক্ষণ পরে প্রতিবেশীদের কয়েকজন কাকভেজা হয়ে হুড়মুড় করে আমাদের ঘরে ঢুকল। তাদের একজনের মাথায় আঘাত লেগেছে। বাবা দেরি না করে কী একটা ওষুধ মেখে লোকটির মাথা গামছা দিয়ে বেঁধে দিলেন। তাকে ধরে একটি নিরাপদ জায়গায় বসালেন। শুনলাম একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ উপড়ে গিয়ে তাদের ঘরের উপর পড়েছে। তারাই বললো, আমাদের গোয়ালঘরের চাল নাকি উড়ে গিয়েছে। গরুগুলোর কথা ভেবে আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গেল।

এক সময়ে বাতাসের বেগ খানিকটা কমে আসে। তখনও থেকে থেকে ভয়ানক শব্দে বাজ পড়ছে। বাবা-মা আমাকে শুকনো কাপড় বের করে দিলেন। প্রতিবেশীদের জন্যও কাপড়, কিছু শুকনো খাবার ও পানির ব্যবস্থা করে তাদেরকে মোটামুটি স্বাভাবিক করলেন। বাবা আহত লোকটিকে বারবার পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সে আগের চেয়ে ভালো বোধ করছে। আরো কিছুক্ষণ পর ঝড় পুরোপুরি থেমে গেল। তবে সমস্ত রাতই আমরা বসে কাটালাম।

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বাবা দরজা-জানালা খুলে দিলেন। আমি বাইরে বেরিয়ে যা দেখলাম, এক কথায় তা অবিশ্বাস্য। বেশ কয়েকটি বড়ো গাছ উপড়ে পড়েছে। এখানে-সেখানে মৃত ও আহত পাখি পড়ে আছে। আমাদের ঘরের দুটি বারান্দার চাল উড়ে গেছে। অন্য একটি বাড়ির ঘরের চাল উড়ে এসে পড়েছে আমাদের উঠানে। গোয়ালঘরে ছুটে গিয়ে দেখি, এর চালা নেই – একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছড়ে পড়েছে সেখানে। আমাদের চারটি গরুর একটি বড়ো রকমের আঘাত পেয়েছে। কয়েক বাড়ি পরে কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। গিয়ে দেখি, বেশ কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। একজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। রাস্তাঘাটের যে অবস্থা, তাতে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছানোই কঠিন ব্যাপার। বাবা এবং আরো কয়েকজন যুবক মিলে একটি মাচা বানিয়ে লোকটিকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটলেন। আমি মাকে সাহায্য করতে গেলাম। মনে মনে বন্ধুদের কথা ভাবছি আর অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠছি।

সেদিনের রাতে ঝড়ের যে দানবীয় তাণ্ডব দেখলাম, তা মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি। ঝড় যেন তার প্রকাণ্ড গ্রাসে সবকিছু নিঃশেষ করতেই এসেছিল। ঘর, আঙিনা, বনবাদাড়, নদীর বাঁধ, মেঠো ও পাকা পথ – সর্বত্রই ধ্বংসলীলার ক্ষত। ওই রাতের পরে গ্রামবাসীর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। আর মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠতে সময় লেগেছিল আরো বেশি।

কৃষি উদ্যোক্তা

ভূমিকা: অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং জনবল কাজে লাগিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উপার্জনের প্রত্যাশায় যখন কোনো কাজ করার পরিকল্পনা করে, তখন তাকে উদ্যোগ বলে। যারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করে তাদের বলে উদ্যোক্তা। প্রতিটি পেশাকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তা হওয়া সম্ভব। একজন উদ্যোক্তা আত্মনির্ভরশীল হন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। কৃষিকে উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি বাংলাদেশে নতুন। বিপুল জনসংখ্যা, কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, বেকারত্ব – এ সবকিছুর ভিতরে একদল তরুণ কৃষিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করছেন। শিক্ষিত তরুণদের কৃষিক্ষেত্রে পরিকল্পিত উদ্যোগ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা: কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তার মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন কৃষক তাঁর পণ্য বাজারে বিক্রির চেয়ে পরিবারের চাহিদা মেটানোকে বেশি গুরুত্ব দেন অথবা কিছুটা বিক্রির জন্য এবং কিছুটা পরিবারের চাহিদা মেটাতে ব্যয় করেন। অন্যদিকে, একজন কৃষি উদ্যোক্তার মূল লক্ষ্য বাজারজাতকরণ ও মুনাফা তৈরি। তাই একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির হতে হয় এবং তার কাজে প্রচুর ঝুঁকি থাকে।

কৃষি উদ্যোগের ক্ষেত্রসমূহ: শস্য, প্রাণীসম্পদসহ কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়কে কৃষি উদ্যোগের আওতায় আনা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে অবশ্যই মূলধন, জমির পরিমাণ, মাটির গুণাগুণ, অবকাঠামো, বালাই ব্যবস্থাপনা, লোকবল, পরিবহণ ব্যবস্থা, বাজার ও চাহিদা, উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ধান, গম, ডাল, আখ, পাট, ঘাস, শাকসবজি, ফুল, ফল, মসলা, মধু, মাশরুম, রেশম, মাছ প্রভৃতির চাষ ও উৎপাদন; গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি প্রাণীসম্পদের লালন-পালন; গাছের চারা, জৈব সার, বায়োগ্যাস, দুধ ও দুধজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন ইত্যাদি কৃষি উদ্যোগের আওতাভুক্ত।

কৃষি উদ্যোক্তার করণীয়: একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে নিম্নোক্ত করণীয় সম্বন্ধে অবগত থাকা উচিত:

ক. উদ্যোক্তাকে প্রথমেই তার পণ্যের বাজার সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখতে হবে।

খ. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে অপচয় ও ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. একজন কৃষি উদ্যোক্তাকে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হয়। কারণ, তাঁর এই উদ্ভাবনী বুদ্ধি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

ঘ. কৃষিখাতে উদ্যোক্তাকে অনেক রকমের ঝুঁকি নিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে হবে এবং ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সম্ভাব্য প্রস্তুতি রাখতে হবে।

ঙ. উদ্যোক্তা যে ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করবেন, সে বিষয়ে যাবতীয় তথ্যের নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা জরুরি। উপযুক্ত খাবার, সার, কীটনাশক, আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ প্রযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। সম্প্রতি স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার উদ্যোক্তাদের সাফল্যে ভূমিকা রাখছে।

চ. একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কয়েকজন উদ্যোক্তা একসঙ্গে কাজ করতে পারেন। এতে বড়ো ধরনের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় এবং ঝুঁকি হ্রাস পায়। তবে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে অংশীদার নির্বাচন করা উচিত।

ছ. পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, শ্রমিক ও পণ্য পরিবহণ, বাজার পরিস্থিতি ও প্রতিযোগীদের কথা চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি উদ্যোগ: কৃষির উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন:

ক. সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো কৃষির ধরন অনুযায়ী স্বল্প সুদে বিভিন্ন অঙ্কের ঋণ প্রদান করছে।

খ. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তর উদ্যোক্তাদের যে-কোনো প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

গ. বছরব্যাপী চাষ করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে 'ডিজিটাল শস্য ক্যালেন্ডার' ও 'বালাইনাশক নির্দেশিকা' দেওয়া আছে, যা ঠিক সময়ে ঠিক ফসল ফলাতে সাহায্য করে। ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষিসংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে জানাতে 'কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিদ্রব্যাদির বাজারদর, কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রেরণ করে।

উপসংহার: একজন কৃষি উদ্যোক্তা সফল হলে একদিকে যেমন দারিদ্র্য দূরীভূত হয়, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায়। তবে কৃষি উদ্যোক্তাকে অবশ্যই সততার সঙ্গে কাজ করা উচিত। কারণ তাঁর পণ্য চূড়ান্ত বিচারে খাবারের চাহিদা মেটাবে।

ভাষা আন্দোলন

ভূমিকা: ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনই ভাষা আন্দোলন, যা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ বাংলা ভাষাপ্রেমীর আত্মদানের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। অবশ্য এ আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল আরো আগে, অন্যদিকে এর প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রকৃত বিচারে ভাষা আন্দোলন বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে উত্তরণের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে, অন্যদিকে সমগ্র বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। এটি একইসঙ্গে ছিল তৎকালীন পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের বীজমন্ত্র।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়: ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ – পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলা) ও পশ্চিম পাকিস্তান। প্রায় দুই হাজার কিলোমিটারের অধিক দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেকগুলো মৌলিক পার্থক্য ছিল। সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের বৈঠকে ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গড়ে ওঠে তমদ্দুন মজলিস ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১০ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত হয়। ১১ই মার্চ পালিত সেই ধর্মঘটে পিকেটিংয়ের সময়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর কিছু দিন পরে ২১শে মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় এক ভাষণে ঘোষণা করেন: 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই বক্তব্য রাখেন। যখন তিনি উর্দুর ব্যাপারে তাঁর অবস্থানের কথা পুনরুল্লেখ করেন, উপস্থিত ছাত্ররা সমস্বরে 'না, না' বলে চিৎকার করে ওঠে। তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘোষণার প্রতিবাদে তারা বলে, উর্দু নয় বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যেও গভীর ক্ষোভের জন্ম হয়। বাংলা ভাষার সম-মর্যাদার দাবিতে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আবারও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২৯শে জানুয়ারি সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকা শহরে প্রতিবাদী মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সমগ্র পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ও ধর্মঘটের আহ্বান করে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে। ফলে দিনটিতে ঢাকা শহরে সকল প্রকার মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্র ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারিঃ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৯টা থেকে সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চায়। তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ অস্ত্র হাতে সভাস্থলের চারদিক ঘিরে রাখে। বেলা সোয়া এগারোটার দিকে ছাত্ররা একত্র হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময়ে কয়েকজন ছাত্রকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আরো অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে। শহিদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে ওঠে। শোকাবহ এ ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র পূর্ব বাংলায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

২১শে ফেব্রুয়ারি-পরবর্তী আন্দোলনঃ ২১শে ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রা সহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান শফিক। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। শহিদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে ওইদিন বিকেল থেকে রাত অবধি কাজ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্ররা নির্মাণ করে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ মিনার। ২৪শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন বাইশে ফেব্রুয়ারি শহিদ হওয়া শফিউর রহমানের পিতা। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

ভাষা আন্দোলনের অর্জন: ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন ভাষাকেন্দ্রিক হলেও তা পুরো বাঙালি জাতিকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। এর ফল হিসেবে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ব্যবধানে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। একুশের চেতনাকে ধারণ করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার ছিল ২১ দফা সংবলিত। ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলা ভাষা আন্দোলন, মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটির এই আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলন-ভিত্তিক সাহিত্য: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নতুন গতি লাভ করে। রচিত হয় ভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক অনেক কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রকাশিত হয়। একই বছর মুনীর চৌধুরী কারাগারে বসে 'কবর' নাটক রচনা করেন। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী লেখেন গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতা রচনা করেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী; শামসুর রাহমান রচনা করেন 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা'; আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচনা করেন 'মাগো, ওরা বলে' কবিতা। জহির রায়হান একুশকে নিয়ে রচনা করেন উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯)। এছাড়া ওই সময়পর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাংলা সাহিত্য চর্চার অন্যতম অনুপ্রেরণা।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান তাৎপর্য এই যে, বাঙালি জাতি তার জাতীয়তাবোধ ও অধিকার সম্পর্কে প্রথম সচেতন হয়। ভাষার প্রশ্নে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠে একটি সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এরপর যত আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে ভাষা আন্দোলনের উজ্জ্বল স্মৃতি। ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা এবং ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। এখনও সেই লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

উপসংহার: একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতিসত্তার পরিচয় নির্দেশক দিন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বীর ভাষা-শহিদদের অবদান জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তবে তাঁদের আত্মদান তখনই সার্থক হবে, যখন বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকা: মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ও রক্তাক্ত অধ্যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার মানুষ অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ। স্বাধীনতা হলো একটি জাতির আজন্ম লালিত স্বপ্ন। স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার মধ্যে যেমন গৌরব থাকে, তেমনি পরাধীনতায় থাকে গ্লানি। আর তাই পরাধীন হয়ে কেউ বাঁচতে চায় না। দাসত্বের শৃঙ্খলে কেউ বাঁধা পড়তে চায় না। বাঙালি জাতিও চায়নি বছরের পর বছর ধরে শাসনে-শোষণে পাকিস্তানিদের দাস হয়ে থাকতে। তাই তারা শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছিল আন্দোলনে, সোচ্চার হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পেয়েছিল তাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা।

পটভূমি: ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামের দুইটি পৃথক রাষ্ট্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ছিল দুটি অংশ – পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা কখনোই পূর্ব পাকিস্তানকে সমান মর্যাদা দেয়নি। বরং সব সময় চেয়েছে পূর্ব পাকিস্তানকে দমিয়ে রাখতে। পশ্চিম পাকিস্তান সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত করতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানকে। শিল্প কারখানার কাঁচামালের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান নির্ভর করতো পূর্ব পাকিস্তানের ওপর। শ্রমিকদের অল্প বেতন দিয়ে উৎপাদনের কাজ করাতো। রাজস্ব থেকে আয়, রপ্তানি আয় প্রভৃতির সিংহভাগ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় যেখানে ৯৫% ব্যয় হতো, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় ব্যয় হতো মাত্র ৫ শতাংশ। আবার, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে জয়ী হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কোনোভাবেই বাঙালিদের হাতে শাসনভার তুলে দিতে চায়নি। পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অভাব, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, অবকাঠামোগত উন্নয়নে অবহেলা, মৌলিক নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপসহ সকল প্রকার বৈষম্য স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের দাবিকে জোরালো করে তোলে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ: বাঙালি জাতির রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পূর্ব থেকে হলেও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে তা জোরালো হয়। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার ঘোষণা দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ওই দিন ভাষার দাবিতে রাজপথে শহিদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ অনেকে। ভাষা ও সংস্কৃতির উপর শাসকগোষ্ঠীর আঘাত ছিল বাঙালির কাছে তাদের অস্তিত্বের মূলে আঘাতস্বরূপ। একদিকে বাঙালিরা যেমন সংকটের প্রকৃতি ও গভীরতা বুঝতে পারে, অন্যদিকে তা মোকাবেলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। ১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ, ১৯৬২-র গণবিরোধী শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬-র বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি, ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-র নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় – এই প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটে এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে।

স্বাধীনতার ডাক: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। বরং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সরকার তখন ষড়যন্ত্র শুরু করে। এর ফলে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতায় উন্মুখ দশ লক্ষাধিক মানুষের সামনে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন – 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এরপর গড়ে ওঠে তীব্র অসহযোগ আন্দোলন। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার লিখিত ঘোষণাপত্র দিয়ে যান। ২৬শে মার্চ দুপুরে এম এ হান্নান চট্টগ্রামের কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন।

অপারেশন সার্চলাইট: ইতিহাসের ঘৃণিত গণহত্যা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের 'অপারেশন সার্চলাইট'। ওইদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় এবং ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে হত্যা করে অসংখ্য নিরস্ত্র বাঙালিকে।

মুজিবনগর সরকার গঠন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এই দিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও গৃহীত হয়। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত সরকার ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। তখন থেকে এই জায়গার নতুন নাম হয় মুজিবনগর। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী দেশ চলতে থাকে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী সাংবিধানিক পদক্ষেপ ছিল মুজিবনগর সরকার গঠন। এই সরকারের নেতৃত্বে নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। বিশ্বব্যাপী জনসমর্থন আদায়ে এই সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও জনযুদ্ধঃ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র জনগণের উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালালে বাঙালি ছাত্র, জনতা, পুলিশ, ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা সদস্যরা সাহসিকতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বিনা প্রতিরোধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাঙালিরা ছাড় দেয়নি। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে শহিদ হন। মুক্তিযোদ্ধাদের এ ঋণ কোনো দিন শোধ হওয়ার নয়। জাতি চিরকাল মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেষ্ঠসন্তান হিসেবে মনে রাখবে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। তাই এ যুদ্ধকে বলা হয় গণযুদ্ধ বা জনযুদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, ছাত্র, পেশাজীবী, নারী, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এর সর্বাধিনায়ক। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য পুরো দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। ৩রা ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় মিত্রবাহিনী যুক্ত হয়ে যৌথভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করে। যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় হয়।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকাঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারী সক্রিয় ছিল কখনও সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনোবা যুদ্ধক্ষেত্রের আড়ালে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়েছেন, প্রেরণা জুগিয়েছেন এমন নারীর সংখ্যা অসংখ্য। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবও এমনই একজন মহীয়সী নারী, যিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং অদম্য প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। অজানা-অচেনা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা করেছেন বহু নারী। চরম দুঃসময়ে পাকিস্তানি হানাদারের হাত থেকে রক্ষা করতে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। অনেক সময়ে পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের কাছে নারীর মান-মর্যাদা হারাতে হয়েছে এবং প্রাণও দিতে হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের এই সাহসী ও অগ্রণী ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁরা অনেকে রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের অবদানঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে ছুটে গিয়েছেন। তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন। পাকিস্তানকে অস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা: যুদ্ধের সময়ে দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ, মনোবল বৃদ্ধিসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ও অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। পত্রপত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ, দেশাত্মবোধক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, আবৃত্তি, নাটক, কথিকা, জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'চরমপত্র' ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে দাঁড়ায়। ভারত সে সময়ে এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন দেয়। তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের বিরোধিতা করলেও সে দেশের জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গানের দল বিটল্‌স্-এর জর্জ হ্যারিসন এবং ভারতীয় সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত রবিশঙ্কর 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর আয়োজন করেছিলেন। ফরাসি সাহিত্যিক আদ্রেঁ মালরো, জাঁ পল সার্ত্রে-সহ অনেকেই তখন বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা: মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্ন ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অশিক্ষা-কুসংস্কার থেকে মুক্ত অসাম্প্রদায়িক একটি দেশের – বঙ্গবন্ধু যার নাম দিয়েছিলেন 'সোনার বাংলা'। এই সোনার বাংলা গঠনের চেতনাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। নতুন প্রজন্মের কাছে এই চেতনাকে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। কেননা উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এই চেতনার কোনো বিকল্প নেই।

উপসংহার: মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির অহংকার। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এনে দেয়। এই স্বাধীনতা ত্রিশ লক্ষ বীর শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত, লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাওয়া। তাই এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের নিবেদিতপ্রাণ হওয়া উচিত। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো যেমন জরুরি, তেমনি নাগরিকদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন হওয়া উচিত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্তব্যবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের মাধ্যমে বাংলাদেশের যথার্থ অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব।

সময়ানুবর্তিতা

ভূমিকা: ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করাই সময়ানুবর্তিতা। জীবনে সফলতা বয়ে আনার জন্য যেসব গুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে সময়ানুবর্তিতা একটি। মানবজীবনের সকল অনুষঙ্গ সময় দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। অনন্তের দিকে প্রবহমান সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোকেই সময়ানুবর্তিতা বলে। একবার সময়ের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে, পুনরায় আর তা ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই সময়কে গুরুত্ব দিয়ে নিজ নিজ জীবন গঠনে সকলকে ঐকান্তিক হতে হয়। সময়ের কাজ সময়ে করলে জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়।

সময়ের বৈশিষ্ট্য: প্রবহমানতা সময়ের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। সময় নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান তথা গতিময়। একই জলপ্রবাহে যেমন দুইবার ডুব দেওয়া যায় না, তেমনি একই সময়কে দুইবার পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কোনো শক্তিই সময়ের গতিশীলতাকে রোধ করতে পারে না। নদীর জলপ্রবাহ ভাটির টানে চলে গেলেও আবার জোয়ারে ফিরে আসে। কিন্তু অতিবাহিত সময় আর ফিরে আসে না।

সঠিক সময়ে উপযুক্ত কাজটি না করতে পারলে, অসময়ে শতচেষ্টায়ও তা সার্থকভাবে করা যায় না। কথায় আছে, 'সময়ের এক ফোঁড় আর অসময়ের দশ ফোঁড়'।

মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব: মহাকালের হিসেবে মানবজীবন অতি ক্ষুদ্র। এই স্বল্পায়ু জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। কেননা মহাকালের বিচারে মানুষ যে সময় পায়, তা অতি নগণ্য। তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সর্বোত্তম ব্যবহারে কাজ করা উচিত। যে ব্যক্তি সময়কে গুরুত্ব দিয়ে সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করে, সে কোনো ধরনের বিড়ম্বনায় পড়ে না। এক জীবনে মানুষ যে পরিমাণ কাজ করতে পারে, তার একটি সীমা আছে। তাই কোনো কাজ ফেলে না রেখে যথাসময়ে তা সম্পন্ন করা উচিত।

সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি: একজন সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন। সময়ানুবর্তিতা মানুষকে কাজের গুরুত্ব শেখায়। বিবেচক ব্যক্তি সময়ের গুরুত্ব বোঝেন; তাই তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারেন। যে সকল দার্শনিক, বিজ্ঞানী, লেখক ও শিল্পী পৃথিবীতে খ্যাত হয়েছেন, ধারণা করা যায়, তাঁদের আরো অনেক গুণের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা একটি।

ছাত্রজীবনে সময়ানুবর্তিতা: একজন ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হবে, তার অনেকখানি নির্ভর করে ছাত্রজীবনের উপর। ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ ফসলের বীজ বপনের কাল। এ সময়ে সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। পড়াশোনা, খেলাধুলাসহ যাবতীয় কাজ গুরুত্ব অনুযায়ী সময় মতো করার অভ্যাস ছাত্রজীবনেই গড়ে তুলতে হয়। সময়ের সদ্ব্যবহার যে করতে জানে না, সে কোনো কিছুতে কৃতকার্য হয় না। ব্যর্থতা তার পিছু ছাড়ে না।

জাতীয় জীবনে সময়ের মূল্য: জাতীয় জীবনে সময়ের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকারকে প্রতি বছর জুন মাসে পরবর্তী বছরের করণীয় ঠিক করে বাজেট ঘোষণা করতে হয়। এই বাজেটে উল্লিখিত কর্মসূচি ও প্রকল্প যথাসময়ে শেষ করতে না পারলে সরকারকে চাপের মধ্যে পড়তে হয়। আবার যাবতীয় অঙ্গীকার যথাসময়ে শেষ করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারের সুনাম হয়। আসলে একটি দেশের মানুষ সময় সম্পর্কে কতটা সচেতন, এর উপর নির্ভর করে সে দেশের অগ্রগতি। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি সময়নিষ্ঠ, সে জাতি তত বেশি উন্নত। আবার পরিশ্রমী হতে হলেও সময়নিষ্ঠ হওয়া দরকার।

সময়কে কাজে লাগানোর উপায়: কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখলে সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। প্রথমত, লক্ষ্য স্থির করা। লক্ষ্যহীন মানুষ সময়ের অপচয় করে। দ্বিতীয়ত, করণীয়গুলোকে প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুযায়ী তালিকাবদ্ধ করা এবং ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করা। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে কাজটি সবচেয়ে জরুরি, সেই কাজটিই করা উচিত। তৃতীয়ত, প্রতিটি কাজ শেষ করার সময়সীমা নির্ধারণ করা। এতে সময়ের অপচয় করার প্রবণতা কমে যায়। চতুর্থত, কী পরিমাণ সময় হাতে আছে, তা বুঝে কাজ করা। পঞ্চমত, আলস্য ও উদাসীনতা পরিহার করা।

সময়ানুবর্তিতা ও সাফল্য: যে ব্যক্তি সময়কে মূল্যায়ন করতে জানে না, সে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারে না। জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইলে সময়কে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে হবে। পৃথিবীর সকল সফল মানুষের সাফল্যের রহস্য সময়ানুবর্তিতা। কোনো মানুষই গুণের আধার হয়ে জন্ম নেয় না। ক্রমাগত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে বিভিন্ন গুণ অর্জন করে। শৈশব থেকেই সময়ানুবর্তিতার চর্চা করা উচিত। সময়ের মূল্য বোঝাতে গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখেছেন –

আজ করব না করব কালি
এই ভাবে দিন গেল খালি।
কেমন করে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায়
দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়।

উপসংহার: জীবন ছোটো, কিন্তু কাজের পরিধি ব্যাপক। তাই কম সময়ের মধ্যে মানুষকে নিজের চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করতে হলে সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। যে কৃষক যথাসময়ে বীজ বপন করে না, সে কেমন করে পাকা ফসল ঘরে তুলবে? যে ছাত্র নিয়মিত পড়াশোনা করে না, সে কী করে কৃতকার্য হবে? কাজেই একথা মানতেই হবে যে, সময়কে অবহেলা করা ঠিক নয়। বরং উপযুক্ত পরিশ্রম ও সময়ানুবর্তিতা মেনে চললে জীবনের চলার পথ সুগম হবে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ক্রিকেটে বাংলাদেশ

ভূমিকা: ইংল্যান্ডের সীমা পেরিয়ে ক্রিকেট বহু আগেই বিশ্বের একটি জনপ্রিয় খেলায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেও ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনার শেষ নেই। দেশের সর্বত্রই ক্রিকেট এখন জনপ্রিয় খেলা। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি মর্যাদাপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে।

বাংলাদেশে ক্রিকেট: উপমহাদেশে ক্রিকেটের আগমন হয় ইংরেজদের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক কালে। তখন ক্রিকেট ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। ১৯৪৭-এর পর থেকে ঢাকা অঞ্চলেও ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুনভাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড' (বিসিসিবি), বর্তমানে যা 'বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড' (বিসিবি) নামে পরিচিত।

বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশ: বাংলাদেশ ১৯৭৭ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থার সহযোগী সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আইসিসি ট্রফিতে অংশ নেয় বাংলাদেশ। ১৯৮৬ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ দল প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে। এরপর ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে অংশ নেয় এবং ফাইনালে কেনিয়াকে হারিয়ে জয়লাভ করে। জয়ের আনন্দ সমস্ত বাংলাদেশকে ছুঁয়ে যায়। কারণ, এই জয় বাংলাদেশের জন্য আরেকটি প্রাপ্তি এনে দেয় – বাংলাদেশের জাতীয় দল বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

বাংলাদেশ দল ১৯৯৮ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে কেনিয়াকে হারিয়ে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে জয়লাভ করে। ধীরে ধীরে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণ দক্ষতা অর্জন করতে থাকে। ২০05 সালে ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়েকে ৩–২ ম্যাচে হারিয়ে সিরিজ জয়লাভ করে। ২০১০ সালে নিউজিল্যান্ডকে ৪–০ ম্যাচে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ করে। ২০১৫ সালে ভারতের বিপক্ষে ২–১ ব্যবধানে, পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩–০ ব্যবধানে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২–১ ব্যবধানে সিরিজ জয় করে। এই অভূতপূর্ব বিজয়ে বিশ্ব একটি নতুন ক্রিকেট পরাশক্তির আবির্ভাব লক্ষ করে। বাংলাদেশ একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় বিশ্বের প্রতিটি ক্রিকেট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে জয়লাভ করেছে।

আইসিসি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ: ১৯৯৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ৬টি আসরে অংশ নেয়। আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালে প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশ নেয় দলটি। প্রথম বিশ্বকাপেই স্কটল্যান্ড ও পাকিস্তানকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করে বাংলাদেশ দল। ২০07 সালের বিশ্বকাপে সেরা আট-এ এবং ২০১৫ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে আশানুরূপ ফল না পেলেও এই খেলায় বড়ো বড়ো দলকে হারিয়ে দিয়ে বাংলাদেশ দল নিজেদের সামর্থ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়।

টেস্ট খেলার মর্যাদা অর্জন: বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টেস্ট খেলুড়ে দলের মর্যাদা লাভ করে ২০০০ সালে। ওই বছর ১৩ই নভেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় বাংলাদেশ দলের। অভিষেক টেস্টেই আমিনুল ইসলাম বুলবুল ১৪৫ রান করেন, আর নাইমুর রহমান দুর্জয় পান ৬ উইকেট। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে হেরে যায় বাংলাদেশ। পরের বছর অর্থাৎ ২০০১ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অভিষেক টেস্টে মাত্র ১৭ বছর বয়সে সেঞ্চুরি করেন মোহাম্মদ আশরাফুল। ২০০৫ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট জয় পায় বাংলাদেশ।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাংলাদেশ: ২০০৫ সালে ৫০ ওভারের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও পাঁচ দিনের টেস্ট-এর সঙ্গে যুক্ত হয় ২০ ওভারের খেলা টি-টোয়েন্টি। এতে একটি দল সর্বোচ্চ ২০ ওভার ব্যাট করতে পারে। বাংলাদেশ ২০০৬ সাল থেকে টি-টোয়েন্টি খেলে আসছে।

বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেট: ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই ঢাকা ও চট্টগ্রামে ক্রিকেট লিগ শুরু হয়। ১৯৭৪–৭৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চালু হয়। এ সময় থেকে জেলা পর্যায়েও ক্রিকেট লিগ চলতে থাকে। ১৯৯৯ সালে দেশে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলা চালু হয়। তবে ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) যাত্রা করে, যা বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে একটি চমৎকার সংযোজন। ঘরোয়া ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা নতুন খেলোয়াড় তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আয়োজক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ: একাধিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে সুনাম অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ টেস্ট খেলার যোগ্যতা অর্জনের আগেই আইসিসি নকআউট বিশ্বকাপ ১৯৯৮ আয়োজনের দায়িত্ব পায়। ২০১১ সালে বিশ্বকাপের দশম আসরের অন্যতম আয়োজকের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের ভার পড়ে বাংলাদেশের উপর। বাংলাদেশের সরকার, জনগণ ও সংশ্লিষ্টদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ক্রিকেট-বিশ্বে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকার শের-এ-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়াম ও জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, বগুড়ার শহিদ চান্দু স্টেডিয়াম, খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম, সিলেটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ঘরোয়া ক্রিকেট অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আরো কিছু স্টেডিয়াম রয়েছে।

বাংলাদেশে ক্রিকেটের প্রভাব: পুরো বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ক্রিকেট নিয়ে ব্যাপক উদ্দীপনা বিরাজ করে। ক্রিকেট মানুষের দেশপ্রেমকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই যখনই বাংলাদেশ দল অন্য কোনো দলের বিপক্ষে খেলতে নামে, সমস্ত বাংলাদেশ উন্মুখ হয়ে থাকে। ক্রিকেটের কারণে বাংলাদেশের নাম পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার বাংলাদেশের মানুষও পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে পারছে। ক্রিকেট একইসঙ্গে বিজ্ঞাপন-বাণিজ্য ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের জন্য ক্রিকেট আরেকটি সুফল বয়ে এনেছে, তা হলো – পর্যটনের বিকাশ। বিশ্বের নানা দেশ থেকে আগত খেলোয়াড়, ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সদস্যবৃন্দ এবং ভক্তকুল বাংলাদেশে অবস্থান করছে এবং পর্যটন এলাকাসমূহে ভ্রমণ করছে। এতে একদিকে বিশ্বময় বাংলাদেশের পর্যটন-স্থানের নাম ছড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি।

বাংলাদেশের মানুষের জাতীয়তাবোধের বিকাশেও ক্রিকেট খেলা ভূমিকা রাখে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খেলা শুরুর আগে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাজতে শুনলে এ দেশীয়দের মনে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হয়। তখন নিজের দেশের প্রতি এক ধরনের ভালোবাসা জাগে। বিশেষভাবে বাংলাদেশের খেলোয়াড়গণ যখন বিশ্বখ্যাত কোনো দলকে পরাজিত করে, তখন যে আনন্দ হয়, তা দেশপ্রেমেরই আনন্দ।

উপসংহার: বাংলাদেশের মানুষ ক্রিকেট খেলা পছন্দ করে। ক্রিকেটের সঙ্গে এ দেশের কোটি কোটি মানুষের আবেগ জড়িত। তাই বাংলাদেশের বিজয়ে গোটা দেশ যেমন বাঁধভাঙা উল্লাসে ফেটে পড়ে, আবার পরাজয়ে মুষড়ে পড়ে। তবে কোনো পরাজয়েই দেশবাসী খেলোয়াড়দের প্রতি আস্থা হারায় না। তাদের সমর্থন ও উৎসাহ দিয়ে যায়, যাতে পরবর্তী খেলায় খেলোয়াড়রা সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে। ক্রিকেটের উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের উচিত নতুন খেলোয়াড় তৈরিতে ভূমিকা রাখা, উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রতি আরো যত্নবান হওয়া এবং ক্রিকেটবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের ফুটবল

ভূমিকা: ফুটবল বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় খেলা। কয়েক দশক আগেও বাংলাদেশের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে সর্বত্র ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এর প্রতি মানুষের আগ্রহের মাত্রা বোঝা যায় বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হলে। তখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত দেশগুলোর পতাকা উড়তে দেখা যায়। অনেকের গায়ে দেখা যায় পছন্দের দলের জার্সি। ফুটবলের প্রতি এ দেশের মানুষের ভালোবাসা ক্রমে এই খেলার প্রতি তাদের আগ্রহ আরো বাড়িয়ে তুলছে।

আধুনিক ফুটবলের ইতিহাস: প্রতি দলে এগারো জন করে দুটি দলে ভাগ হয়ে ফুটবল খেলতে হয়। একটি বায়ুপূর্ণ চামড়ার বলকে হাত ও বাহু ছাড়া শরীরের যে-কোনো অংশ দিয়ে প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের মধ্যে প্রবেশ করাতে হয়। পৃথিবীতে ফুটবল ধরনের বেশ কয়েকটি খেলা প্রচলিত আছে। যেমন, রাগবি অনেকটা ফুটবল খেলার মতো। তবে এখন ফুটবলের যে রূপটি দেখা যায়, তা ১৮৬৩ সালে প্রবর্তিত। মূলত এ সময়ে ইংল্যান্ডে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং তারা ফুটবল খেলার কতগুলো নিয়ম জারি করে। এই নতুন নিয়মের ফুটবল খেলা দ্রুত অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য ইংল্যান্ডকে আধুনিক ফুটবলের জনক বলা হয়। ইংল্যান্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রবর্তিত হওয়ায় ফুটবলের আরেক নাম 'এসোসিয়েশন ফুটবল'। আমেরিকায় একে বলা হয় 'সসার' বা 'সকার'। এটিকে এসোসিয়েশন শব্দের বিকৃত রূপ বলে মনে করা হয়। রাগবি ফুটবল কেবল রাগবি নামে অধিক পরিচত হওয়ায় এসোসিয়েশন ফুটবল শুধু 'ফুটবল' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলাদেশে ফুটবল বলতে এসোসিয়েশন ফুটবলকেই বোঝায়।

ফুটবল বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মে প্যারিসে গঠিত হয় ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ফিফা)। সংস্থাটি প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন করে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম বিশ্বকাপ আসরে শিরোপা অর্জন করে উরুগুয়ে। বর্তমানে ফিফার সদস্য সংখ্যা ২১১।

বাংলাদেশে ফুটবলের যাত্রা: ভারতীয় উপমহাদেশে ফুটবলের আগমন হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। ইংরেজ বণিক, খেলোয়াড় ও সৈনিকরা ফুটবল খেলত। মূলত তাদের মাধ্যমেই উপমহাদেশে ফুটবল খেলা জনপ্রিয়তা পায়। বাংলাদেশে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ফুটবল জনপ্রিয় হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ১৯৪৮ সাল থেকে সমগ্র পাকিস্তানে ফুটবলের মূল আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় 'ঢাকা লিগ'। ১৯৭১ সালের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ওয়ারি ক্লাব, আবাহনী ক্রীড়াচক্র, শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র প্রভৃতি ক্লাব বাংলাদেশে লিগ খেলাকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে যায়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশে ফুটবল একটি নতুন মাত্রায় আবির্ভূত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে বিশ্বকে অবগত করতে তখন গঠিত হয়েছিল 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল'। তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ১৬টি ম্যাচ খেলেছিল।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই ১৯৭২ সালে ঢাকায় ফুটবল লিগ শুরু করে। ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু হয় জাতীয় ফুটবল। এক বছর পর থেকেই অর্থাৎ ১৯৭৪ সাল থেকে যুব ফুটবল যাত্রা শুরু করে। ফেডারেশন কাপ শুরু হয় ১৯৮০ সাল থেকে। বর্তমানে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলো চালু রয়েছে:

১. বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ: এটি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) কর্তৃক আয়োজিত একটি টুর্নামেন্ট। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ শুরু হয় ২০০৭ সালে।
২. বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন্স লীগ: এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় শ্রেণির ফুটবল লিগ। ২০১২ সালে এটি যাত্রা করে।
৩. ফেডারেশন কাপ: এটি বাংলাদেশের প্রিমিয়ার নকআউট প্রতিযোগিতা। ১৯৮০ সাল থেকে এটি আয়োজিত হয়।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন: বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজন, খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যা, জাতীয় দল গঠন ও নিয়ন্ত্রণ তথা ফুটবলের যাবতীয় উন্নয়নে কাজ করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। বাফুফে বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দল ও বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দলকে তত্ত্বাবধান করে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ ফুটবল: বাফুফে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে এএফসি (এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন), ১৯৭৬ সালে ফিফা (ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনালে ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) ও ১৯৯৭ সালে সাফ (সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন) বাংলাদেশকে সদস্য করে। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল ১৯৭৩ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে। ১৯৮০ সালে 'এএফসি এশিয়া কাপ' টুর্নামেন্টে এবং ১৯৮৬ সালে ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অংশ নেয়। ফুটবলে বাংলাদেশের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয় ২০০৩ সালে। ওই বছরই বাংলাদেশ প্রথম সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়। এছাড়া ২০১৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন গোল্ডকাপ-এ চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল: বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল কমিটি। বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সদস্য। ২০১০ সালের ২৯শে জানুয়ারি দলটি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন গেমস-এ নেপালের বিপক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে। বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দল ২০১০ সালের সাফ উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে কক্সবাজারে ভুটানের বিপক্ষে ৯–০ ব্যবধানে এবং শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২–০ ব্যবধানে জয়লাভ করে। সম্প্রতি বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক নারী ফুটবল দল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার কলসিন্দুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের মেয়েরা বড়ো ভূমিকা রাখছে। তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে বাংলাদেশের সব অঞ্চলের মেয়েরা।

ফুটবল খেলার মাঠঃ স্থানীয় মাঠ ছাড়াও বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি উন্নত মানের ফুটবল মাঠ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ও বীর শ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়াম, সিলেট জেলা স্টেডিয়াম, যশোরের শামসুল হুদা স্টেডিয়াম, রাজশাহী জেলা স্টেডিয়াম, শহিদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়াম, গোপালগঞ্জের শেখ ফজলুল হক মনি স্টেডিয়াম, ফেনীর শহিদ সালাম স্টেডিয়াম, ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ স্টেডিয়াম উল্লেখযোগ্য।

উপসংহারঃ ফুটবল বিশ্বের জনপ্রিয়তম খেলা। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনেও ফুটবলের জনপ্রিয়তা কম নয়। তবে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য জাতীয় ফুটবল দল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিয়ে আসতে পারেনি। এক সময়ে ঘরোয়া ফুটবল সারা বাংলাদেশে যে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করতে পারতো, তাও এখন আবেদন হারিয়েছে। বয়সভিত্তিক ফুটবল দলগুলো মাঝে মাঝে যে সাফল্য দেখাচ্ছে, তা আবার হারিয়ে যাচ্ছে। ফুটবলে গৌরব ফিরিয়ে আনতে দরকার কার্যকর নীতিমালা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায়ও সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়ের সন্ধান অব্যাহত রাখা উচিত।

কৃষিকাজে বিজ্ঞান

ভূমিকাঃ বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবন মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকের নাম প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে আরামদায়ক। কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা লক্ষণীয়। অসংখ্য কৃষি প্রযুক্তি কৃষিকাজকে করে তুলেছে সহজসাধ্য। অজস্র উচ্চফলনশীল জাতের ফসল আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কৃষিপণ্যও হয়েছে সহজলভ্য।

কৃষির অতীত-কথাঃ কৃষি হলো মানব সভ্যতার আদিম পেশা। জীবন ধারণের তাগিদে আদিম মানুষ প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ফলমূল গুহায় নিয়ে আসতো এবং বনজঙ্গলের পশু-পাখি শিকার করতো। প্রকৃতির উপরে পূর্ণ নির্ভরশীলতার কারণে প্রায়ই তাদের খাদ্য-সংকটে পড়তে হতো। বছরের কিছু সময়ে তাদের কোনো খাবার জুটত না। ফলে খাদ্যের সন্ধানে তাদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে হতো। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আদিম মানুষ এক পর্যায়ে পশুপালন ও বীজ বপন করতে শেখে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সুলভ হয় এবং জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিশ্চিন্ত। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আগে পর্যন্ত কৃষিকাজ ছিল অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

কৃষি ও বিজ্ঞান: বিজ্ঞানের অবদানে ধীরে ধীরে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে। কৃষিকাজকে সহজ ও কম শ্রমসাধ্য করতে কৃষি-বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা করছেন। ফলে একদিকে যেমন চাষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসছে, ফসল নির্বাচন ও নতুন নতুন ফসল তৈরির কাজেও অগ্রগতি হচ্ছে। কৃষি-বিজ্ঞানের এসব গবেষণা পৃথিবীকে আজ শস্যে ও ফসলে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। পৃথিবীর মানুষের জন্য এখন যতটা ফসল দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি ফসল পৃথিবীতে ফলছে। জমিকে উর্বর করতে আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সার। পুরানো প্রযুক্তির লাঙল-মই প্রভৃতির পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে ট্রাক্টর। উদ্ভাবিত হয়েছে উন্নত জাতের বীজ ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত। এতে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ফসল ও বীজ উৎপাদন এবং তা সংরক্ষণেও বিজ্ঞান সহযোগিতা করছে। সেচ ব্যবস্থায় এসেছে পরিবর্তন। পশু-পাখি ও মাছের রোগজনিত মৃত্যুর হারও হ্রাস পেয়েছে কৃষি-চিকিৎসার অগ্রগতির কারণে। এভাবে কৃষি-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৃষিকাজের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে।

উন্নত বিশ্বে কৃষি: উন্নত দেশগুলোর কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন মোয়ার (শস্য ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেশিং মেশিন (মাড়াই যন্ত্র), ফিড গ্রাইন্ডার (পেষক যন্ত্র), ম্যানিউর স্পেডার (সার বিস্তারণ যন্ত্র), মিল্কার (বৈদ্যুতিক দোহন যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে ট্রাক্টরের মাধ্যমে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ করা সম্ভব হয়। একই ট্রাক্টর আবার একসঙ্গে ফসল কাটার যন্ত্র হিসেবেও কাজ করে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীন, জাপান, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশও কৃষি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলেছে।

কৃষি ও বাংলাদেশ: কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৮ শতাংশ আসে কৃষি থেকে এবং রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ১৪ শতাংশ আসে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি থেকে। এছাড়া কর্মসংস্থান ও শিল্পের ভিত্তি হিসেবেও বাংলাদেশে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু কৃষিকাজের জন্য খুবই অনুকূল। এদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক জল-ভাণ্ডার। আধুনিক প্রযুক্তি উন্নত দেশগুলোর মাটির অনুর্বরতাকে এবং পানির দুর্লভতাকে যেভাবে দূর করেছে, তাতে আধুনিক প্রযুক্তি বাংলাদেশের জন্য আরো বেশি সুবিধা নিয়ে আসবে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল। ফলে বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখানে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়, আবার অনেক সময়ে প্রত্যাশার তুলনায় কম ফসল ফলে। কৃষকের কাছে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কৃষি-বিজ্ঞানের জ্ঞান সঠিকভাবে পৌঁছে না দিতে পারাই এর প্রধান কারণ। কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এসব বাধা দূর করা যায় এবং উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশকেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা যায়।

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণাঃ কৃষির উন্নতির উপরেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। এটা অত্যন্ত আশার কথা যে, বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইতিমধ্যে বহু নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল ফসল উদ্ভাবন করেছে, বহু কৃষিবান্ধব প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে এবং বহু ধরনের কৃষিপণ্যকে বাজারজাত করণের ব্যাপারে নতুন নতুন কৌশল বের করেছে। অর্থাৎ কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশ কোনোক্রমে পিছিয়ে নেই। তবে এখন প্রয়োজন এসব উদ্ভাবনকে দেশের সর্বত্র সহজলভ্য করে তোলা এবং কৃষককে এসব উদ্ভাবনের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা। শিক্ষিত জনবলকে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারলে এবং কৃষিকাজের সঙ্গে তাদের যুক্ত করতে পারলে এই কাজ অনেকটা সহজ হয়। তাতে আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এর যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। বর্তমানে সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তর তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কৃষকদেরকে নিয়মিতভাবে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

উপসংহারঃ কৃষিকাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি দিন দিন মজবুত হচ্ছে। বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এই অগ্রগতিকে টেকসই করতে প্রয়োজন কৃষি সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে সহজলভ্য করা। এছাড়া বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতে ফসলহানির আশঙ্কা তৈরি না হয় অথবা উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্যান্য শাখাকেও কৃষির স্বার্থে এগিয়ে আসা দরকার। তবে সবার আগে দরকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কৃষিপেশায় আকৃষ্ট করা এবং শিক্ষিত জনশক্তিকে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত করা। কেননা শিক্ষিত জনশক্তি কৃষিকাজে এগিয়ে এলে কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হবে। এজন্য সরকারের উচিত কৃষিপেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের, বিশেষভাবে কৃষিকাজে সফল হওয়া ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করা ও সম্মানিত করা। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়বে এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষিত লোক কৃষিপেশায় আকৃষ্ট হবে। কৃষিকাজের সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সম্পর্ক মজবুত করতে এমন পরিবেশই জরুরি।

মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার

ভূমিকাঃ বর্তমান সময়ে মাদকাসক্তি এক ভয়বাহ বৈশ্বিক সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। অপার সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের জন্য মাদকাসক্তি এখন এক মরণফাঁদ। এই ঘাতক ব্যাধিতে আসক্ত হবার ফলে সমাজ হচ্ছে কলুষিত এবং দেশ, জাতি ও পৃথিবীর জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক পরিণতি। তাই একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য, আলোকিত আগামীর জন্য মাদকাসক্তির মতো মরণথাবা থেকে তরুণ ও যুব সমাজকে রক্ষা করা একটি অবশ্যকর্তব্য বিষয়।

মাদক ও মাদকাসক্তি: মাদকদ্রব্য হলো প্রাকৃতিকভাবে অথবা রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন পদার্থ যা নেশা তৈরি করে। এসব পদার্থ যারা সেবন করে তাদেরকে মাদকাসক্ত বলা হয়। মাদক সেবনের উগ্র আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি এমন এক নেশা যাতে একবার জড়িয়ে পড়লে, তা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না। এর পরিণতি অকালমৃত্যু। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য রয়েছে। কিছু কিছু মাদকদ্রব্য ব্যথানাশক ও চেতনানাশক হিসেবে চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ মাদকই নেশাকারী পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সিগারেট, মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, মরফিন, কোকেন, চরস, পপি, মারিজুয়ানা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য মাদক। এগুলোর বেচা-কেনা বাংলাদেশে অবৈধ। তা সত্ত্বেও গোপনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলোর কেনা-বেচা চলে। তরুণ সমাজের বড়ো একটি অংশ এসব মাদক গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেদের ধ্বংস করার খেলায় মেতে ওঠে।

মাদকের উৎস: মাদকের উৎস বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাদক উৎপাদিত হয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি অসাধু মুনাফালোভী বিশাল চক্র। মাদকের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, চোরাচালানও হয় অনেক দেশে। থাইল্যান্ড-মায়ানমার-লাওস (গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল), আফগানিস্তান-ইরান-পাকিস্তান (গোল্ডেন ক্রিসেন্ট) মাদক চোরাচালানের প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। মাদকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো আফিম। পপি নামক উদ্ভিদ থেকে আফিম তৈরি হয়। আফিম থেকে তৈরি হয় 'মরফিন বেস'। মরফিন বেস থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় হেরোইন। ব্রাজিল, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডোর প্রভৃতি দেশে মাদক উৎপাদন ও চোরাচালানের বড়ো একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

মাদকাসক্তির কারণ: জীবনের হতাশা ও দুঃখবোধ থেকে সাময়িক স্বস্তি লাভের আশায় মানুষ প্রথমবার মাদক গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। অনেকে অন্যের প্ররোচনায় মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। অনেকে কৌতূহলবশতও প্রথমবার মাদক গ্রহণ করে থাকে। তবে যেভাবেই হোক, কেউ একবার মাদক গ্রহণ করলে সেই আসক্তি থেকে বের হওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়। সেই সুযোগে বিপথগামী কিছু মানুষ এবং বহুজাতিক মাদক সংস্থাগুলো অবৈধ অর্থের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

পাশ্চাত্যের মাদক উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে ব্যবসা করতে বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। করিডোর হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য অনেকটা সহজলভ্য। এই সুযোগে কিছু অসাধু লোক এখানেও একটি মাদকের বাজার সৃষ্টি করেছে। এইসব খারাপ লোকের চেষ্টায় বর্তমান বাংলাদেশে মাদকাসক্ত লোকের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। দিন দিন এই সংখ্যা বাড়ছে।

মাদকাসক্তির কুফল: মাদকে আসক্ত ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি কমে যায়, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়, দেহের ওজন কমতে থাকে, হাসি-কান্নার বোধ ও বিচারবুদ্ধি থাকে না; এক পর্যায়ে সে জীবন্মৃত অবস্থায় পৌঁছে যায়। মাদকের মূল্য বেশি হওয়ায় খুব অল্প দিনেই মাদকাসক্তের সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়ে যায়। তখন তারা অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। ক্রমে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা এভাবে নিজেদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের সুস্থতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এদের নৈতিক অধঃপতন সমাজের অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। ফলে গোটা সমাজেই পচন ধরতে শুরু করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি পারিবারিক ও দাম্পত্য কলহের কারণ হয়। অশান্তির জের ধরে বহু মাদকাসক্ত এক পর্যায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পরিবার ও সমাজের জন্য সেই ক্ষতি অপূরণীয়। এছাড়া সবচেয়ে ভয়াবহ তথ্য হলো, মাদকাসক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী লোক বেশি। অথচ দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এই বয়সী লোক সবচেয়ে উপযুক্ত। আবার এই বয়সের নারীরাই সবচেয়ে বেশি প্রজননক্ষম। তাই এই বয়সের নারী-পুরুষ মাদকাসক্ত হওয়ার অর্থ হলো, একদিকে দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা, অন্যদিকে সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা।

মাদকাসক্তির প্রতিকার: মাদকাসক্তির সর্বনাশা প্রভাব থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। সকলেই ভাবছেন, কেমন করে এর করাল গ্রাস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা যায়। ইতিমধ্যেই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করছে। বাংলাদেশেও মাদকবিরোধী একাধিক সংগঠন কাজ করছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোতে মাদক গ্রহণ ও বিস্তার প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচারণা লক্ষ করা যায়। সরকারের সমাজসেবা কর্মসূচিতে মাদক প্রতিরোধ ও মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু আছে এবং এদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাদকের হাত থেকে দেশের যুবসমাজকে বাঁচাতে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হলো প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং সেখানে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা। অন্তত বেকারত্বের হতাশা থেকে যেসব মাদকাসক্তির ঘটনা ঘটে, এর ফলে তা দূর হবে। তবে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হলো মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানকে নির্মূল করা। এজন্য দরকার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রেখে কঠোর আইন প্রণয়ন করা এবং তা প্রয়োগ করে দেখানো।

উপসংহার: মাদকাসক্তির কারণে সমাজের কোনো এক জায়গায় অশান্তি সৃষ্টি হলে, সেই অশান্তি গোটা সমাজকে গ্রাস করতে পারে। তাই মাদকাসক্তিকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় মনে করলে চলবে না। যে তরুণ সমাজ দেশের ভবিষ্যৎ, তারা যদি সুস্থতার মধ্য দিয়ে বড়ো হয়, তাহলেই তারা সুস্থ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবে, অন্যথায় নয়। তাই মাদকের করালগ্রাস থেকে দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে হবে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ভূমিকা: প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে এমন কিছু দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়কে বোঝায়, যা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে এবং যার পিছনে মানুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রতি বছর এখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়, যার মধ্যে আছে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, ভূমিধস, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে একে একে আলোচনা করা হচ্ছে।

বন্যা: বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলোতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় এবং ফসলের ক্ষতি হয়। বন্যার ফলে জনপদের ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট নষ্ট হয়। বহু গৃহপালিত পশু প্রাণ হারায়। ১৯৫৫ ও ১৯৬৪ সালের বন্যায় বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৭০ ও ১৯৭৪ সালের বন্যার বিভীষিকাও মানুষের মনে দাগ কেটে আছে। ১৯৮৮ সালের বন্যা রাজধানী ঢাকাসহ পুরো দেশের মানুষকে বন্দী করে দেয়। ১৯৯৮ সালের বন্যাও দীর্ঘস্থায়ী ছিল। এ সময়ে অপরিবর্তিত অবস্থায় পাঁচ মাস পানিবন্দী জীবন যাপন করেছে লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষ। ২০০১, ২০০২ ও ২০০৭ সালের বন্যাতেও মানুষ, গবাদিপশু ও ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস: বছরের এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসের দিকে বাংলাদেশে ছোটো-বড়ো নানা ধরনের ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের তীব্রতা থাকে খুব বেশি। এর ফলে কখনো কখনো সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। এ-ধরনের দুর্যোগ প্রায় প্রতিবছরই চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি উপকূলবর্তী এলাকায় ও দ্বীপসমূহে আঘাত হানে। এর নিষ্ঠুর আঘাতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আশ্রয়হীন হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। বিপন্ন হয় মানুষ, নিসর্গ, ও জীববৈচিত্র্য; বিপর্যস্ত হয় লোকালয়। মানুষ পতিত হয় অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায়। লবণাক্ততার জন্য প্লাবিত এলাকার ভূমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফসলের ক্ষয়ক্ষতির কারণে কৃষি-উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৭০ সালে মেঘনা নদীর মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ২০০৭ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুন্দরবন এই দুই ঘূর্ণিঝড়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দেশের অভ্যন্তরেও অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়।

খরা: দেশের উত্তরাঞ্চলে খরা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অনাবৃষ্টি এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে ফসলের ক্ষেত, এমনকি গাছপালাও পানির অভাবে শুকিয়ে যায়। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পরে রাজশাহী বিভাগ ও রংপুর বিভাগের কিছু অঞ্চলে খরাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে এখনো উত্তরাঞ্চলের বহু জেলায় খরা পরিস্থিতি মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। অত্যধিক তাপদাহে নানা রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে মানুষের ও পশুপাখির কষ্ট হয়।

নদী-ভাঙন: নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুকে ছোটো-বড়ো বহু নদী প্রবহমান। নদীর ধর্মই হলো এক কূল ভাঙা আর অন্য কূল গড়া। নদীর এই ভাঙা-গড়ার খেলায় এ দেশের কত মানুষকে যে বাস্তুচ্যুত হতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। নদীর তীরে বাস-করা মানুষের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্বল নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এই দুর্যোগের কবলে পড়ে মানুষ উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করে এবং কিছু কালের জন্য হলেও হয়ে পড়ে ঠিকানাবিহীন।

ভূমিধস ও ভূমিক্ষয়: ভূমিধস বাংলাদেশের একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, সিলেট প্রভৃতি পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছর ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। পাহাড়ের গায়ে অপরিকল্পিতভাবে গৃহ নির্মাণের কারণে ভূমিধসে অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। প্রবল বায়ুপ্রবাহ, অধিক বৃষ্টিপাত, নির্বিচারে পাহাড় কাটা ভূমিধসের মূল কারণ। এই ধরনের আর একটি দুর্যোগের নাম ভূমিক্ষয়। ভূমিক্ষয়ের কারণে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের ক্ষতি হয় না বটে, তবে তা দীর্ঘ মেয়াদে মানুষের ক্ষতির কারণ হয়। ভূমিক্ষয়ের মূল কারণ অপরিকল্পিতভাবে বনের গাছ কেটে ফেলা। মাটিকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচায় গাছ; এই গাছ কেটে ফেলার ফলে প্রবল বর্ষণে মাটির উপরের স্তর ক্ষয়ে যায়। এতে ভূমির উচ্চতাই শুধু কমে, তাই নয়, জমির উর্বরতাও নষ্ট হয়।

ভূমিকম্প: অন্যান্য দুর্যোগের মতো ভূমিকম্পও বাংলাদেশে মাঝে মাঝে আঘাত হানে। ভূমিকম্পের মাত্রা বেড়ে গেলে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ভেঙে পড়ে। তাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। গত একশো বছরে বাংলাদেশে মারাত্মক কোনো ভূমিকম্প হয়নি। তবে অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে যে কোনো সাধারণ ভূমিকম্পেও ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বড়ো বড়ো শহর মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে।

দুর্যোগ মোকাবেলা ও প্রতিকার: দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার সব সময়েই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নামে সরকারের একটি সংস্থা রয়েছে। প্রচার মাধ্যমগুলোও দুর্যোগকালের পূর্বপ্রস্তুতি ও সম্ভাব্য মোকাবিলার বিষয়টি দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত প্রচারের ব্যবস্থা করে। দুর্যোগের আগে ও পরে সরকারের সবগুলো সংস্থা সতর্ক থাকে, যাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথাসাধ্য কমিয়ে রাখা যায়।

উপসংহার: এক সময়ে মানুষ প্রকৃতির খেয়ালখুশির উপর নিজেদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো। কিন্তু মানুষ এখন ক্রমান্বয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। ভূমিকম্পের আগামবার্তা এখনো আবিষ্কার করা সম্ভব না হলেও ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে মানুষ এখন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো দুর্যোগের আগাম খবর পায়। অচিরে হয়তো ভূমিকম্পের আগাম বার্তাও পেয়ে যাবে। হয়তো সেদিন আর দূরে নয়, যখন প্রকৃতির যাবতীয় দুর্যোগকে মানুষ তার প্রযুক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

বিশ্বকোষ

ভূমিকা: বিশ্বকোষ হলো কোনো গ্রন্থ বা গ্রন্থমালা, যেখানে জ্ঞানের সকল শাখার নানাবিধ বিষয়ে লেখা সংকলিত থাকে। লেখাগুলো নিবন্ধ আকারে সংশ্লিষ্ট ভাষার বর্ণানুক্রমে কিংবা বিষয় অনুযায়ী সজ্জিত থাকে। পৃথিবীর সকল জ্ঞানশাখা বা শৃঙ্খলার বিষয়াবলি এতে স্থান পায়। তবে এমন বিশ্বকোষও রয়েছে যাতে একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানশাখার বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত নিবন্ধ সজ্জিত থাকে। যেমন – আইনকোষ, অর্থনীতিকোষ ইত্যাদি। বাংলায় বিশ্বকোষ শব্দটি ইংরেজি 'এনসাইক্লোপিডিয়া' শব্দের প্রতিশব্দ। একটি বিশ্বকোষ সংকলনে যুক্ত থাকেন নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ। তাঁদের রচিত নিবন্ধগুলো তাই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। বিশ্বকোষে সংকলিত নিবন্ধগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও সেগুলো একেকটি বিষয়ের উপর গভীর ধারণা দেয়। বর্তমানে বিশ্বকোষের মুদ্রিত রূপ ছাড়াও কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য রূপও পাওয়া যায়।

বিশ্বকোষের বৈশিষ্ট্য: প্রতিটি বিশ্বকোষের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, বিশ্বকোষের ভুক্তিগুলো সুবিন্যস্ত হতে হয়, যাতে পাঠক দ্রুত এবং অল্প আয়াসে কোনো বিষয়ের তথ্য খুঁজে পায়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশের কারণে এটি আয়তনে বৃহৎ হয়ে থাকে। কখনো অনেকগুলো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তৃতীয়ত, বিশ্বকোষের তথ্যাদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কারণ, নির্ভরযোগ্যতা বিশ্বকোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। চতুর্থত, পরিবর্তিত তথ্যের আলোকে বিশ্বকোষকে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হয়। তাই বিশ্বকোষের কাজকে কখনো সমাপ্ত বলে ভাবা যায় না।

বিশ্বকোষের প্রকারভেদ: বেশ কয়েক রকমের বিশ্বকোষ দেখা যায়। বিষয়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে বিশ্বকোষ দুই ধরনের: ১. সাধারণ বিশ্বকোষ। ২. বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ। প্রকাশের মাধ্যম বিবেচনায় বিশ্বকোষ দুই ধরনের: ১. মুদ্রিত ও ২. ডিজিটাল। প্রতিষ্ঠানের অধীনে নির্ধারিত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ছাড়াও এক ধরনের বিশ্বকোষ রয়েছে যা স্বেচ্ছাসেবী লেখকরা সংকলন করেন। নিচে কয়েক ধরনের বিশ্বকোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক. সাধারণ বিশ্বকোষ: এ ধরনের বিশ্বকোষে বিষয়ের ব্যাপকতা দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এই বিশ্বকোষের ভুক্তিতে কাজ করেন। তাঁদের লেখা নাতিদীর্ঘ নিবন্ধের মাধ্যমে একেকটি বিষয়ের আলোচনা বা তথ্য তুলে ধরা হয়। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' এ ধরনের বিশ্বকোষ।

খ. বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ: কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সাধারণ বিশ্বকোষে প্রদত্ত বর্ণনা ছাড়াও আরো গভীর ধারণা পেতে বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষ ব্যবহার করতে হয়। বিষয়ভিত্তিক বিশ্বকোষগুলো কেবল ওই বিষয়সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। 'আইনকোষ', 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিকস' এ ধরনের বিশ্বকোষ।

গ. বৈদ্যুতিন বিশ্বকোষ বা ডিজিটাল বিশ্বকোষ: প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে অনেকেই মুদ্রিত বিশ্বকোষের পরিবর্তে কম্পিউটার বা মুঠোফোনে বিশ্বকোষ ব্যবহার করছে। এগুলোকে বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল বিশ্বকোষ বলা হয়। এ ধরনের বিশ্বকোষ হালনাগাদ রাখা সহজ।

ঘ. স্বেচ্ছাসেবী লেখকদের বিশ্বকোষ: ইনটারনেটে কিছু বিশ্বকোষ রয়েছে যা স্বেচ্ছাশ্রমে সংকলিত হয়। পৃথিবীর নানা প্রান্ত হতে স্বেচ্ছাসেবী লেখকগণ অনলাইনে বিশ্বকোষকে সমৃদ্ধ করেন। 'উইকিপিডিয়া' এ ধরনের বিশ্বকোষ।

বিশ্বকোষের ভুক্তি: বিশ্বকোষে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলোকে বলা হয় ভুক্তি। অভিধানের চেয়ে বিশ্বকোষের ভুক্তি আলাদা হয়ে থাকে। সাধারণ অভিধানে একটি শব্দের ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণ, সংজ্ঞা, বাক্যে প্রয়োগ ইত্যাদি থাকে। কিন্তু বিশ্বকোষের ভুক্তিগুলো হয় দীর্ঘ। বর্ণনা এবং ভাবগত বিবেচনায় এর ব্যাপ্তি অভিধানের চেয়ে বেশি। বিষয়ের শিরোনাম সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে রচিত নিবন্ধই বিশ্বকোষের ভুক্তি। ভুক্তির মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী মানচিত্র, সারণি, ছবি, পরিসংখ্যান কিংবা গ্রন্থপঞ্জিও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অধিকাংশ বিশ্বকোষে ভুক্তি রচয়িতার নাম ভুক্তির নিচে সংযুক্ত থাকে।

ভুক্তির মধ্যে কিছু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়। এর অর্থ, এই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দিয়ে আলাদা ভুক্তি রয়েছে। পাঠক প্রয়োজনে সেসব ভুক্তি পাঠ করে নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নিতে পারেন। অনলাইন বিশ্বকোষে এগুলো আলাদা রঙের হয় এবং তাতে ক্লিক করলে সেই বিষয়ের আলোচনা সামনে চলে আসে।

পৃথিবীর বিখ্যাত কিছু বিশ্বকোষ: প্রায় দুই হাজার বছর ধরে বিশ্বকোষের চর্চা হচ্ছে। তবে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কয়েকজন ফরাসি পণ্ডিত Encyclopedia নামে গ্রন্থমালা প্রকাশ করেন। পৃথিবীময় যে জ্ঞান রয়েছে তা সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করে সমকালীন পাঠক ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এর পর ১৭৬৮–১৭৭১ সালে ইংরেজি বিশ্বকোষ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' প্রকাশিত হয়। এটি এখন ৩২ খণ্ডের মুদ্রিত বইয়ে এবং অনলাইনে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া 'এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা', 'কলিয়ার্স এনসাইক্লোপিডিয়া', 'চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া', 'এভরিম্যানস এনসাইক্লোপিডিয়া' ইত্যাদি বিশ্বকোষ অনুসন্ধানী পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে।

বাংলা ভাষায় রচিত বিশ্বকোষ: বাংলা ভাষায় জ্ঞানকোষ রচনার প্রথম পদক্ষেপ নেন উইলিয়াম কেরির পুত্র ফেলিক্স কেরি। তিনি 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' অবলম্বনে 'বিদ্যাহারাবলী' নামক জ্ঞানকোষ রচনার কাজ শুরু করেন। তবে বাংলা ভাষায় যথার্থ বিশ্বকোষ হলো নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত 'বিশ্বকোষ'। এর প্রথম খণ্ড সংকলন করেন রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় খণ্ড থেকে ২২তম খণ্ড পর্যন্ত সংকলন করেন নগেন্দ্রনাথ বসু। এই বিশ্বকোষের কাজ শুরু হয় ১৮৮৬ সালে এবং শেষ হয় ১৯১১ সালে। এছাড়া 'ভারতকোষ' বাংলা ভাষায় সংকলিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিশ্বকোষ। এটি ১৮৮১ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব কর্তৃক সংকলিত হয়।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। আয়তন, ভুক্তিসমূহের বিন্যাস ও ব্যবহার-যোগ্যতার বিবেচনায় এটি একটি সফল প্রয়াস বলা যায়। নওরোজ কিতাবিস্তান ও মুক্তধারা প্রকাশিত চার খণ্ডে সংকলিত 'বাংলা বিশ্বকোষ' (১৯৭২ থেকে ১৯৭৪) একটি সুপরিকল্পিত বিশ্বকোষ, যদিও এটি 'কলাম্বিয়া ভাইকিং ডেস্ক এনসাইক্লোপিডিয়া' অবলম্বনে রচিত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আরো কিছু বাংলা কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'বাংলাপিডিয়া' বাংলাদেশে বিশ্বকোষ চর্চায় এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ। 'বাংলাপিডিয়া' বর্তমানে ১৪ খণ্ডে পাওয়া যায়। এর কম্পিউটারে ব্যবহারের সংস্করণ এবং অনলাইন সংস্করণও রয়েছে।

উপসংহার: বিশ্বের সব শৃঙ্খলার ধারণাসমূহ কোনো ব্যক্তির একার পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়। এমনকি একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানশাখার সব বিষয়ও কারো একার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে এক জায়গায় বিন্যস্ত করে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া বিশ্বকোষের প্রধান লক্ষ্য। কোষগ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশ্বকোষ শুধু আয়তনেই বড়ো নয়, জ্ঞানচর্চার এক বিপুল ভাণ্ডারও বটে। তাই প্রতিটি ভাষায় বিশ্বকোষ থাকা জরুরি।

অদম্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

ভূমিকা: বাংলাদেশের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। যোগ্য নেতৃত্ব, যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শক্তিশালী বাজার পরিকল্পনা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশ যেভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা নজিরবিহীন।

অর্থনৈতিক সূচকে বাংলাদেশ: ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় উৎপাদন প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার ছিল ৫.৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার (প্রায় ৪৫,০০০ টাকা)। অথচ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এই হার ৮.১৩ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলার (প্রায় ১,৬১,০০০ হাজার টাকা)। শুধু মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তা-ই নয়, বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু। বাজেটের আকার রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজেট বাস্তবায়নে কমছে পরনির্ভরতা। সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যের হার নিম্নমুখী। বর্তমান সময়ে দারিদ্র্যের হার ১৪ শতাংশেরও কম। জিডিপির হিসেবে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ; ক্রয়ক্ষমতার বিবেচনায় ৩৩তম; আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় অবস্থানে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের যে-কোনো সূচকের বিচারে বাংলাদেশের অগ্রগতি অভূতপূর্ব।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন: একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার দৃশ্যমান দিক হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এর মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও জীবনমানের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। গত এক দশকে বাংলাদেশের এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। বড়ো বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই চালু হবে বাংলাদেশের জনমানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত পদ্মাসেতু। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণের সফলতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে একটি মাইলফলক। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশে ছোটো-বড়ো অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব অবকাঠামো যথাসময়ে সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরো এগিয়ে যাবে। এছাড়া সড়ক নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন ভবন নির্মাণও বর্তমানে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানিকে সামনে রেখে পৃথক পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল হবে, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বাড়বে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন: প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরো গতিশীল করে তুলছে। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে 'ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলাকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটির অধিক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। থ্রি-জি ও ফোর-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটালাইট-১ উৎক্ষেপণ বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতে যুগান্তকারী ঘটনা। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব সম্প্রচার উপগ্রহ। ২০১৮ সালের ১১ই মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি ও তথ্যের মাধ্যমে দেশের সম্প্রচার কার্যক্রম সমৃদ্ধ হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন: বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে। সর্বস্তরে শিক্ষাকার্যক্রম নিশ্চিত করার ফলে একটি কর্মক্ষম দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। দেশে ও দেশের বাইরে উভয় ক্ষেত্রে তাদের কর্মসংস্থানের অনেক ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে। কৃষি শিল্প, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্পসহ প্রতিটি শিল্পখাতের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বেড়েছে। চাকরি নির্ভরতা কমেছে; উদ্যোক্তার সংখ্যা বেড়েছে। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিতে শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত এক দশকে শুধু তথ্য-প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০ লাখ মানুষের। বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লাখের অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। তারা নিয়মিত তাদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় মানবসম্পদ এভাবে সবচেয়ে বড়ো প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য: বাংলাদশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির আকার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমন বিস্তৃত হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক পণ্য রপ্তানি আয়ে অর্জিত হয়েছে মাইলফলক। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হয়েছে চার হাজার কোটি মার্কিন ডলার, যা এখন পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ পণ্য-রপ্তানি আয়।

প্রতিবন্ধকতা: ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে প্রথমবারের মতো আটকে দেওয়ার চক্রান্ত হয়। এরপর বহু বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি ছিল ধীরগতির। গত এক দশকে তা অস্বাভাবিক গতি অর্জন করেছে। তবে দেশে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এই অগ্রযাত্রাকে খানিকটা ব্যাহত করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় দুর্নীতিও একটা বাধা। এসব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আরো অপ্রতিহত হবে, অগ্রগতি টেকসই হবে এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

উপসংহার: বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা এখন পুরো বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত। এর নাম দেওয়া যেতে পারেঃ অদম্য বাংলাদেশ। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশকে। বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন সোনার বাংলার স্বপ্ন, চেয়েছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি, গড়তে চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ। বর্তমান সরকার সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতির এই ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অর্জন করতে পারে উন্নত দেশের মর্যাদা।

সমাপ্ত

২০২৬

পদ্মা বহুমুখী সেতু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ২৫ জুন ২০২২ তারিখে গৌরব ও সক্ষমতার প্রতীক দেশের বৃহত্তম সেতু পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন। কোনোরূপ বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত সর্ববৃহৎ প্রকল্প এই স্বপ্নের পদ্মা সেতু। মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কি.মি। মুন্সিগঞ্জ জেলার মাওয়া থেকে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা পর্যন্ত সংযুক্ত এই সেতুটি দুই স্তর বিশিষ্ট। এর উপরের স্তরে রয়েছে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরে একটি রেলপথ। ৩০ হাজার কোটি টাকারও অধিক ব্যয়ে তৈরি এই সেতুটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার পাশাপাশি এর উপকারভোগী হবে সারাদেশের মানুষ।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল (ভোকেশনাল)

৯ম-১০ম ব্যাকরণ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কারও মনে কষ্ট দিও না

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য